লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বাছাই গল্প

সম্পাদনা

তন্ময় রুদ্র

সৃষ্টি প্রকাশন

বি. বি. ১০২ ভি. আই. পি. পার্ক, কোলকাতা-৭০০ ০৫৯

সূচীপত্র

বাজারবন্দী

শৈবাল মিত্র

কাঁচের দরজা ঠেলে ধুচুনি পিসির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়িটায় ঢুকে স্মৃতিকণার গায়ে কাঁটা দিল। বাইরে ঠা ঠা রোদ। গরমে গায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়ার দশা। ময়দানে সভার জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে এই বাড়ি পর্যন্ত আসতে স্মৃতিকণা হাঁপিয়ে গেছে। এত গাড়ি, এত মানুষ, আকাশছোঁয়া সব পেল্লাই বাড়ি আগে সে দেখেনি। কানে তালা ধরানো এমন বাজখাই হৈ চৈ-এর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। ঠাণ্ডা বাড়িটার ভেতরে ঢুকে সে দাঁড়িয়ে গেল। কেমন যেন ভয় হলো তার। পেছনে তাকিয়ে দেখলো, কালো কাচ লাগানো দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক পাড়াগাঁয়ে সে থাকে। নদীর ধারে গ্রাম। নদী পেরোলে সাগর। গ্রাম থেকে বাস রাস্তা চার মাইল। বছরে একবার, পৌষ সংক্রান্তির সময়ে সেই রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষ যাতায়াত করে। দূর দূরান্ত থেকে গঙ্গাসাগরে আসে তীর্থ করতে। তীর্থযাত্রীদের পায়ের আওয়াজ স্মৃতিকণার শ্বশুর ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় না। পাড়াপড়শি বৌ, ঝি, যাদের সঙ্গে যাতায়াত আছে, তাদের মুখে শোনে বাস-রাস্তায় ভিড়ের বিবরণ। রাস্তায় নাকি ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ, পা রাখার জায়গা নেই। তাদের মধ্যে সাধু আছে, সংসারী আছে, ভবঘুরে, ভিখিরি আছে। চোর-ছ্যাঁচোররাও ভিড়ে মিশে সাগরের মেলায় পৌঁছে যায়। বাইরে থেকে কার কি পরিচয় বোঝা যায় না। তাদের সাজ-পোশাক, চেহারা, চালচলনের কাহিনী শুনে স্মৃতিকণা ঘোমটায় মুখ ঢেকে হেসে কুটিপাটি খায়। স্বামী কার্তিকের সঙ্গে মেলার ভিড় দেখতে গিয়েছিল আগের বছর। সোনার ঘড়ি পরা ন্যাংটা এক সাধুকে দেখে লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিল স্মৃতিকণা। তার লজ্জিত মুখের আধখানা দেখে আলতো করে চিমটি কেটেছিল কার্তিক। চিমটিতে সোহাগ থাকলেও স্বামীর দিকে স্মৃতিকণা তাকাতে পারেনি।

সংক্রান্তির মেলা বাদ দিয়ে আরো কয়েকবার কার্তিকের সঙ্গে স্মৃতিকণা গঞ্জে গেছে। বিয়ের আগেও বাড়ির লোকজন, মা, ভাইবোনের সঙ্গে পুজোর সময় গঞ্জে গেছে। বাসরাস্তা টপকে স্কুলের খেলার মাঠে প্রায় ফি বছর চড়কের মেলা দেখতে যেত। বিয়ে হয়েছে চার বছর। বিয়ের পর থেকে গঞ্জে যাওয়ার পাট কমেছে। স্মৃতিকণা যেতে চাইলেও কার্তিক বেঁকে বসে। ঘরে বাচ্চা দেখবে কে? স্মৃতিকণার না আছে শাশুড়ি, না ননদ। সংসারে যারা আছে, সবাই পুরুষ। শ্বশুর আর তিন দেওর। দু'বছরের বাচ্চা সামলানোর মুরোদ তাদের কারো নেই। ননদ একজন আছে, সে সকলের বড়ো। তার বিয়ে হয়েছে দশ বছর আগে। হালিশহরে শ্বশুর বাড়ি। তিন ছেলেমেয়ে। সবচেয়ে বড়োর বয়স আট, কোলেরটার এখনও তিন হয়নি। বাপের ঘরে চট করে তার আসা হয় না। মা মারা যাওয়ার পরে, সংসারে একজন গিন্নি আনার জন্যে কমলা-ই তোড়জোড় করে কার্তিকের বিয়ে দিয়েছিল। কুড়ি বছরের ভাই-এর জন্যে পাশের গাঁয়ের সুশীল মণ্ডলের ষোল বছরের মেয়ে স্মৃতিকণাকে কমলা খুঁজে বের করেছিল। আগে থেকে স্মৃতিকণাকে কমলা চিনতো। চিনতো দু কারণে। প্রথম কারণ শ্যামলা

রঙের ওপর এমন চাঁদপানা মুখ, আশপাশের গাঁয়ের আর কোনো মেয়ের ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, স্মৃতিকণা নামটার জন্যে। গাঁয়ের হাটে, মেলায় কয়েকবার দেখেছিল স্মৃতিকণাকে। নামটা জেনেছিল। কমলা, বিমলা, পুঁটি, খেঁদি, সুন্দরীর মধ্যে স্মৃতিকণা নামটা কিভাবে এল, নামের মানে কি এসব না জেনেও নামটা মনে গেঁথে গিয়েছিল। সুযোগ আসতে কার্তিকের বধূ হিসেবে স্মৃতিকণাকে প্রায় ছোঁ মেরে বাপের সংসারে কমলা নিয়ে এসেছিল। স্কুল, পাঠশালায় না পড়লেও ভাই-এর বৌ খুঁজে নিতে কমলা যে ভুল করেনি, তার প্রমাণ আঠারোতে পা দেওয়ার আগে স্মৃতিকণা মা হয়ে গেল। সাড়ে একুশে কার্তিক বাবা। সংসারে মন বসলো তার। দলের ঝাণ্ডা নিয়ে টো টো করে এ গাঁ, ও গাঁ ঘুরে বেড়ানো কমিয়ে রোজগারের ধান্দা করতে শুরু করল। ঘরে থিতু হলো স্মৃতিকণা। বাচ্চা হতে কার্তিকের যেমন বৌ-এর ওপর টান বাড়লো, তেমনি সদ্য মা হয়ে স্মৃতিকণার কুমারী জীবনের সাধগুলো বেশি করে মাথাচাড়া দিল। সাজপোশাকের দিকে নজর গেল। কোনো ছুতোতে ছেলে কোলে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গঞ্জে একপাক ঘুরে আসতে চাইতো। গেছেও কয়েকবার গঞ্জের 'ভিডিও হলে', একবার বায়োস্কোপও দেখেছিল। কি অসভ্য বায়োস্কোপ। তবু স্বামীর পাশে বসে দেখতে ভালো লেগেছিল। গুমোট ঘরে দু বছরের ছেলেটা হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে উটতে অন্ধকার থেকে অনেকে চেঁচিয়ে উঠলো, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। কেন যে চ্যাংব্যাঙ সঙ্গে করে আনে!

ছেলে কোলে বেরিয়ে না এসে স্মৃতিকণার উপায় ছিল না। শুকনো মুখে কার্তিকও উঠে এসেছিল। বায়োস্কাপটা শেষ পর্যন্ত না দেখতে পেরে বেজায় আফশোস করেছিল। ঘরে ফেরার পথে কার্তিক বলেছিল তোমায় নিয়ে গঞ্জে, বাজারে ঘোরায় মুশকিল আছে। সবাই এমন ড্যাবড্যাব করে দেখে, মনে হয় আস্ত খাবে। ঠোঁট টিপে হেসে স্মৃতিকণা বলেছিল, ট্যাঁকে গুঁজে রাখো।

তাই রাখবো।

ট্যাঁকে যে বৌকে কার্তিক পুরে রাখতে চেয়েছিল, দু'মাস বাদে তাকে কলকাতা দেখাতে আনবে, তখন ভাবেনি। সুযোগটা হঠাৎ হাতের মুঠোয় এসে গেল। কলকাতার জনসভায় এবার সাতটা লরির সঙ্গে দুটো বাস নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। লরিতে চেপে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মেয়েদের যাতে সভায় যেতে না হয়, তার জন্যে দুটো বাস করেছিল পাথরপ্রতিমা গ্রামের বিলাস হাজরা। বিলাসের সতেরো রকম ব্যবসার একটা হলো নামখানা, ডায়মণ্ডহারবার রুটে বাস চালানো, আর গম পেশাই কল চালানো। বিলাসের গম কলে দেড় বছর আগে কার্তিক চাকরি পেয়েছে। গম, আর পেশাই আটার হিসেব রাখে সে। বাসে করে বৌ নিয়ে কলকাতা ঘুরিয়ে আনার বুদ্ধিটা তার মাথায় বিলাসই ঢুকিয়েছিল। মন্দ ফন্দি নয়। ফন্দিটা কার্তিকের মনে ধরলো এবং বাড়ি ফিরে রাথে বিছানায় শুয়ে স্মৃতিকণাকে কথাটা বললো। তারপর কার্তিকের কিছু করার থাকলো না। স্মৃতিকণার আবদার, জেদ, রাগ, চোখের জল আর মান অভিমানে সে ভেসে গেল। সব দ্বিধা ঝেড়ে যে দিবসের সভায় স্মৃতিকণাকে নিয়ে যেতে কার্তিক রাজি হলো। রাজি হওয়ার আরে একটা কারণ ছিল। তিনদিন আগে বাপের বাড়িতে এসেছে কমলা। আড়াই বছরের গোরাকে পিসির কাছে রেখে যেতে অসুবিধে হবে না। কার্তিকের ছেলের গোরা নামটা কমলার দেওয়া। গোরাকে কমলা ভীষণ ভালোবাসে। গোরাও পিসির খুব ন্যাওটা।

কলকাতা যাওয়ার কথাটা পাকা হয়ে যাওয়ার পরেও অন্ধকার ঘরে কার্তিকের বুকে মুখ গুঁজে চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে স্মৃতিকণা গুণগুণ করেছিল। অচেনা সেই শহরে গিয়ে কোথায় কোথায় যাবে, কতো কি কিনবে, কি কি খাবে বলে যাচ্ছিল। কথার মধ্যে কয়েকবার বলেছিল, দ্যাখো, কলকাতায় যাওয়ার নামে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

রোঁয়া ওঠা তার আদুল পিঠে আধো ঘুমে হাত রেখে কার্তিক পুরো ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্মৃতিকণা বুঝতে পারেনি। সে বলছিল, আমি কিন্তু একটা ঠোঁটপালিশ কিনবো, বিন্দি একপাতা, সোনালী ফিতে, নখ রাঙানোর শিশি, গাঁয়ে কে কি বলল, আমি গ্রাহ্য করি না। বলার মতো আছেই বা কে? দেওররা ভালো মানুষ। আমাকে সাজতে দেখলে তারা খুশি হয়। শ্বশুর এসব দেখে না। কথার মধ্যে স্মৃতিকণা টের পেল কার্তিক ঘুমিয়ে পড়েছে। পুরুষদের এই দোষ, আদর শেষ তো আওয়াজ শেষ, তারপর কাঁদার তাল।

স্মৃতিকণাকে নিয়ে বাতানুকুল বহুতল বাজারে ঢুকে ধুচুনি পিসি পেছনে তাকায়নি। খুশিতে হাওয়ায় উড়ছিল। সে যা চেয়েছিল, তাই ঘটেছে। সুন্দরী গেঁয়ো মেয়েটাকে আলো ঝলমল রাজবাড়ির মতো এই বাজারে ঢোকাতে পেরেছে। বাজার দেখে স্মৃতিকণার তাক লেগে যাবে। শামুকপোতায় কার্তিকের সংসারে আর ফিরতে চাইবে না। লম্বা করিডোর ধরে জামাকাপড়ের বাজারে পা রাখার মুহূর্তে বাঁ পাশে তাকিয়ে স্মৃতিকণাকে ধুচুনি পিসি দেখতে পেল না। পেছনে তাকালো। রঙচঙে বাহারি পোশাক পরা পরীদের মতো সুন্দরী এক ঝাঁক মেয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল মা মেয়েকে সমবয়সী মনে হয়। দু'একজনের পাশে পুরুষ সঙ্গী আছে। ডাগর মেয়েগুলোর সঙ্গে যে ছোঁড়ারা লেপ্টে রয়েছে, তারা রসের নাগর। বেশির ভাগ মেয়ে পাকা খেলুড়ে। বিয়েওলা মেয়েদের গা ছুঁয়ে তাদের পাশাপাশি ভরদুপুরে ফুলবাবু সেজে যে লোকগুলো বাজারে এসেছে, তাদের আশিভাগ সঙ্গিনীর স্বামী নয়, তারা পরপুরুষ। মেয়ে চেটে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে ঘুরতে হাফ গেরস্থ মেয়েও বাজারে কম নেই। রঙ চঙ চাউনি দেখে তাদের চেনা যায়। ধুচুনি চিনতে পারে। মেয়ে-মরদের মুখ দেখে তাদের পেটে কী আছে, বুঝে যায়। তিন কুড়ির ওপর বয়স হলো তার। বিধবা হয়েছে উনিশ বছরে। শ্বশুর বাড়িতে জায়গা হয়নি। ফিরে এসেছিল বাপের ঘরে। ছ-সাত মাস সেখানে কাটিয়ে নামখানার এক ভাতের হোটেলে বাসনমাজার কাজ পেয়েছিল। কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল মাঝ বয়সী সেই বিধবা মাসি, মায়ের কেমন বোন, ধুচুনি জানতো না। জানার কথা মনে আসেনি। খুদিমাসির সঙ্গে নামখানায় ঝি গিরি করতে যেতে ধুচুনিকে তার বাবা বারণ করেনি। বরং বাস রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল। আড়ালে চোখের চল ফেলেছিল মা। নামখানায় বছরখানেক কাজ করে খুদি মাসির কথাতে ধুচুনি কলাকাতায় এসেছিল। নামখানায় থাকতে সে টাকা চিনেছিল। মাস মাইনে চল্লিশ টাকার প্রায় পুরোটা তিন মাস অন্তর বাবা এসে হোটেল মালিকের কাছ থেকে নিয়ে যেত। তার থেকে খুদি মাসি পেত পাঁচ টাকা। ইচ্ছে মতো একটা শাড়ি কিনতে পারতো না। পছন্দের একটা শায়া, জামা চোখে পড়লে তাকিয়ে থাকতো। অন্ধকার থাকতে কাজ-শুরু করে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও সাধ-আহ্লাদ মেটানো মতো পাঁচ, দশ টাকা হাতে থাকতো না। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে খুদিমাসি তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কলকাতার জল

পেটে পড়তে তার চোখ খুলে গিয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে সে মানুষ চিনতে শিখলো, সাজতে শিখলো দাঁতে মিশি দিতে শুরু করলো। বেওয়ারিশ মালের মতো তাকে পৃথিবীতে ভাসিয়ে দিয়ে ভাসন্ত অবস্থায় শেকড় গাড়ার শিক্ষা দিল খুদিমাসি। চোখে এক আধটা ইসারায় এক ডজন কথা বলতে শিখলো। গাঁয়ের মেয়েদের ভিড় থেকে একটু আগে চোখেব ইশারায় স্মৃতিকণাকে তুলে এনেছে। আশপাশের কেউ টের পায়নি স্মৃতিকণা কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা অবশ্য কেউ করেনি। বিশাল মাঠ জুড়ে থৈ থৈ করছিল মানুষ। মাইকের আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড়। কাঠফাটা রোদে সবাই হাঁসফাঁস করছিল। জনসভায় ভিড় বাড়াতে যারা গাঁ গঞ্জ থেকে লোক জোগাড় করে বছরে পাঁচ সাতবার কলকাতায় আসে, তারাই শুধু দৌড়ঝাঁপ করছিল। তারা পঞ্চায়েত সদস্য। তাদের কেউ কেউ সভা শুরুর আগে গাঁ থেকে আসা মানুষদের কয়েকটা দলে ভাগ করে কালিঘাট, চিড়িয়াখানা, পাতাল রেল দেখাতে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করছিল। পাথরপ্রতিমা থেকে লরি, বাস ছাড়ার আগে, যারা কলকাতায় পৌঁছে দর্শনীয় জায়গায় দেখতে যেতে চান, তাদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয়েছিল। কলকাতায় সভা থাকলেই এ আয়োজন করা হয়। জনসভার লোক জোগানদাররা কুড়ি, পঁচিশ বছরে এসবের নানা ধান্দা জেনে গেছে।

ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে স্মৃতিকণাকে না দেখে ধুচুনি ভয় পেল। মেয়েটা গেল কোথায়? স্মৃতিকণাকে নিয়ে যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল। যা ভেবেছিল তাই। বন্ধ কাচের দরজা থেকে কয়েক পা এসে থ মেরে স্মৃতিকণা দাঁড়িয়ে আছে। বিরক্ত হলেও মুখে রাগ না দেখিয়ে ধুচুনিপিসি বললো, কি লো, দাঁড়িয়ে গেলি কেন? তোকে না দেখে আমি ভয়ে মরি। ভাবি, আমাদের কার্তিকের সুন্দরী বৌটা গেল কোথায়?

কাঁচের দরজা ঠেলে বাতানুকুল বাজারে ঢুকে স্মৃতিকণার শরীরে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে যে কাঁপুনি ধরেছিল তা কমে এসেছে। ধুচুনিপিসির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে হাসতে চেষ্টা করলো। স্মৃতিকণাকে ধুচুনিপিসি বললো, আয় আগে তোকে কলঘর থেকে ঘুরিয়ে আনি।

জনসভায় চটের ছাউনি দেওয়া মেয়েদের অস্থায়ী কলঘরের ভিড়ের সামনে স্মৃতিকণাকে ছানটান করতে দেখে মুহূর্তে ধুচুনিপিসি ব্যাপারটা বুঝে নেয়। চোখের ইশারায় ভিড় থেকে বাইরে ডেকে আনে। সুতরাং বাতানুকুল চারতলা বাজারে ঢুকে কলঘরের কাজ আগে চুকিয়ে নেওয়া ভালো। পোশাকের বাজার ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে দরজা ঠেলে একটা ঘরে ঢুকলো ধুচুনিপিসি। পাশে স্মৃতিকণা। বাজারের চেহারা কয়েক সেকেণ্ড দেখে স্মৃতিকণার তাক লেগে গেছে। পাথরে বাঁধানো মেয়েদের কলঘরে ঢুকে সে তাজ্জব হয়ে গেল। বেসিন লাগানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সালোয়ার কামিজ পরা সমবয়সী এক সুন্দরী মেয়েকে চুল আঁচড়াতে দেখলো স্মৃতিকণা। আয়না দিয়ে স্মৃতিকণা আর ধুচুনিপিসিকে দেখে অবজ্ঞায় মেয়েটা কপাল কুঁচকালো। সবচেয়ে ভালো শাড়ি পরলেও জমকালো এই বাজারের সঙ্গে সেটা মানায়নি, ভেতরে ঢুকে স্মৃতিকণা বুঝেছিল। বাজারে আস কমবয়সী মেয়ে আড়চোখে তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল রাজহাঁসেদের মধ্যে একটা পাতিহাঁস ঢুকে পড়েছে। স্মৃতিকণা যথেষ্ট রূপসী হওয়ায় সস্তা পোশাকেও তাকে হাঁসের বদলে বক মনে হয়নি। বাড়িতে কাচা

সাদা থান জড়ানো মোটাসোটা ষাট পেরনো ধুচুনি পিসিকে আলাদা করে দেখার কিছু ছিল না। কলঘরের কাজ সেরে বাইরে এসে স্মৃতিকণা স্বস্তি বোধ করল। জীবনে এই প্রথম আধুনিক কলঘর দেখলো সে। ছবির মতো সাজানো কলঘরের ভেতরে যে এমন সুবাস ছড়ানো থাকে সে জানতো না। মুখ হাত ধুয়ে মুছে, চুল আঁচড়ে নিতে স্মৃতিকণাকে এখন বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে। স্মৃতিকণার দিকে ধুচুনিও কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো। বাজারে ভিড় বাড়ছে। পোশাকের বাজার থেকে দুজনে গয়নার বাজারে এসে দাঁড়ালো। কাঁচে ঢাকা দোকানগুলোয় এত আলো জ্বলছে, যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রতিটা দোকানে থরে থরে সোনার গয়না, হীরে, মণি, মুক্ত বসানো দামী দামী অলঙ্কার সাজানো রয়েছে। স্বর্গের দেবীদের চেয়ে সুন্দরী মেয়েরা, চোখ ধাঁধাঁনো পোশাক পড়ে হাসি হাসি মুখে গয়না বাছাই করছে। তাদের সামনে একগাল হাসি নিয়ে, বিগলিত চোখে একটার পর একটা গয়নার বাক্স খুলে ধরছে দোকানী। ক্রেতা, বিক্রেতার মধ্যে যে কোনো দর-কষাকষির সম্পর্ক আছে, বোঝা যাচ্ছে না। স্মৃতিকণার মনে হলো, দু'পক্ষ যেন অনেক দিনের বন্ধু। কারো মাথায় লাভ লোকসানোর চিন্তা নেই। সবচেয়ে দামী গয়নাটা দোকানী বিনি পয়সায় ক্রেতাকে দিয়ে দিতে পারে। পুঁতির হার, সবুজ কাঁচ লাগানো নকল সোনার দুল, দু'হাতে দুটো করে চারটে ব্রোঞ্জের চুড়ি, গঞ্জের দোকান থেকে কেনা, তাঁতের সস্তা শাড়ি জড়ানো স্মৃতিকণার শরীরে স্বাভাবিক তাপ ফিরে এসেছে। দু'চোখে ঘন হয়েছে স্বপ্ন। শামুকপোতা গ্রামের দুই অসমবয়সী বেমানান মহিলাকে যারা একটু আগে আড়চোখে দেখছিল, তারা আর তাকাচ্ছে না। একটার পর একটা গয়নার দোকান পার হয়ে ধুচুনি পিসির সঙ্গে স্মৃতিকণা পৌঁছালো চামড়ার বাজারে। সেখানে চামড়ার সুটকেস, হাতব্যাগ এবং এমন আরো কত জিনিস রয়েছে, যা বাপের জম্মে স্মৃতিকণা দেখেনি। বালিকা বয়েস থেকে তার একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কেনার ইচ্ছে। স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত সে পড়েছে। দু'একজন দিদিমণিকে নতুন ধাঁচের জুতো পরে খটখট করে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে যাতায়াত করতে দেখলে, তারও এরকম জুতো পরে, ব্যাগ নিয়ে পাঁচজনের সমানে দিয়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করতো। সে স্বপ্ন না মিটলেও মরে যায়নি। গঞ্জের দোকানে চড়কের মেলায় গেলে দোকানে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ, হাল ফ্যাশনের জুতো দেখলে সৃতষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকতো। মুখ ফুটে ব্যাগ, জুতোর কথা বাবা অথবা স্বামীকে কখনও বলতে পারেনি। হাজার হাজার জোড়া জুতো, ব্যাগ, সুটকেসের বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হলো, সে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছে গেছে। পালিশ করা চামড়ার গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। দোকানের বাইরেও ঝুলছে নানারকম ভ্যানিটি ব্যাগ, বেল্ট চামড়ায় তৈরি এমন সব সমাগ্রী রয়েছে যা সে আগে দেখেনি। চামড়ার মতো দেখতে শক্ত সুটকেস, চাকা লাগানো সুটকেস, কত ধরন আর কত মাপের সুটকেস যে দোকানগুলোতে সাজানো রয়েছে, তাকিয়ে স্মৃতিকণার নজর আটকে গেল। স্মৃতিকণার চকচকে দুটো চোখ দেখে তার মনের ভাব বুঝতে ধুচুনির অসুবিধে হচ্ছে না। সুটকেসের বাজার থেকে দোতলায় উঠলে প্রসাধনের বাজার। পৃথিবীর সব দেশের সুগন্ধী, ক্রিম, সাজের উপকরণে দোতালাতর দোকানগুলো বাঝাই। চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সুবাসে স্মৃতিকণার দুচোখ বুজে গেল। মনে হলো গোলাপ, বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, শিউলি এবং আরো যত গন্ধওলা ফুল আছে সব এখানে একসঙ্গে ফুটে

আছে। তবে এত ফুলের গন্ধ মিশে যে সুবাস ছড়িয়েছে তা মোটেই চড়া নয়। ঘুমপাড়ানি গন্ধের মতো ভারি স্নিগ্ধ আর হাল্কা। জলের ওপর বিভিন্ন রঙের আলো লেগে রামধনুর আভাস তৈরি করেছে। ফোয়ারা থেকে ছড়িয়ে পড়া পাউডারের মতো জলের মিহি কণাগুলোও সুগন্ধে ভরপুর। অবাক চোখে স্মৃতিকণা ফোয়ারা দেখছে। পৃথিবীতে এরকম একটা আশ্চর্য জায়গা থাকতে পারে, সে জানতো না। স্বপ্নেও এখন সুরভিত বাতাসের সংস্পর্শে সে আসেনি। মাথায় মাখার সস্তা সুগন্ধী তেল, গায়ে ছড়ানোর পাউডার ছাড়া কোনো ভালো গন্ধ সে চেনে না। সে সুগন্ধও বেশিক্ষণ থাকে না। বাসি হলে সুগন্ধী তেল, পাউডার থেকে বদখত গন্ধ বেরোয়। শামুকপোতায় তাকে ঘিরে থাকে পাটপচানো জলের, পচা ছোবড়ার দুর্গন্ধ, যেখানে সেখানে ছড়ানো ময়লার দুর্গন্ধ, পুকুরের পাঁকের গন্ধ, কার্তিকের শরীরের ঘেমো গন্ধ, তাড়ি আর পচাই-এর দুর্গন্ধ, কটু গন্ধের বাতাসে তার হাঁপ ধরে যায়।

ফোয়ারা পার হয়ে দোকানের সামনে দিয়ে দু'জন হেঁটে চললো। ধুচুনি দেখলো, ভূতে পাওয়া মানুষের মতো স্মৃতিকণার দুচোখের দৃষ্টি। ঘোর নেমেছে দু'চোখ জুড়ে। স্মৃতিকণা দেখছে কাচে ঢাকা দুপাশের দোকান। দোকানে বেশির ভাগ ক্রেতা ডলপুতুলের মতো ফুটফুটে অল্পবয়সী মেয়ে। তাদের মাথায় নানা রঙের লম্বা, খাটো চুল। পিচকিরি লাগানো প্রসাধনের শিশি থেকে হাতের পাতার উল্টো দিকে প্রসাধন ছিঁটিয়ে গন্ধ শুঁকে যাচাই করছে। সঙ্গিনীর গলার কাছে পিচকিরির সুবাস ছিঁটিয়ে দিয়ে রঙ্গ করছে তরুণ পুরুষ। সপ্রশংস হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দোকানী তাকিয়ে রয়েছে। পাশের বড়ো দোকানটায় ভারিক্কি চেহারার এক মহিলা নোটের গোছা বার করে গুণছে। দোকানটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এক চিলতে খোলা দোকান। বড়ো রাস্তার পান দোকানের মতো চেহারা হলেও ঝকঝকে পরিষ্কার। কাঁচের আড়াল নেই এখানে। দোকানীর সামনে সরু একটা টেবিল। পেছনে কাঁচের আলমারী ভর্তি নেলপালিশ, লিপস্টিক, নানা রঙের রিবণের চাকা। নকল খোঁপা আর লম্বা চুল এমনভাবে সাজানো রয়েছে যে স্মৃতিকণার দেখে মনে হলো পেছনে ফিরে কয়েকজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। নীচু গলায় স্মৃতিকণাকে ধুচুনি পিসি জিজ্ঞেস করল ফিতে, টিপ বা আর কিছু কিনবে নাকি?

প্রশ্ন শুনে ঘোর কাটিয়ে ধুচুনি পিসির দিকে স্মৃতিকণা তাকালো। ফিসফিস করে বললো, একগজ সোনালী ফিতে আর এক পাতা টিপ কেনার ইচ্ছে ছিল।

আর কিছু?

সংকোচে এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে স্মৃতিকণা বলল, একটা ঠোঁটপালিশ আর একটা নখপালিশ কেনার মতো টাকা বোধ হয় হবে না। যা আছে ফিতে আর টিপের দাম দিতে ফুরিয়ে যাবে।

ধুচুনি পিসি ঝিঙ্কার দিয়ে উঠল, চুপ মার্, দামের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। সখের জিনিসগুলো তুই নে।

দাম দেবে কে?

মুচকি হেসে ধুচুনি হলল, যে খায় চিনি, তাকে জোগায় চিন্তামণি।

মানে?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে ধুচুনি বলল, আমি দেবো।

তুমি কেন দেবে পিসি?

আ মলো! এম্নি দোবো নাকি? ধার দোবো।

আমি ধার শুধবো কি করে?

সে দেখা যাবে?

দুর্বল হচ্ছিল স্মৃতিকণা। ধুচুনি পিসি মানুষটা খারাপ নয়। পিসির দুর্নামকারীরা মন্দ লোক। অকারণে পিসির বিরুদ্ধে কুচ্ছো রটায়।

শ্যামলা রঙের চকচকে চোখ গেঁয়ো বধূটিকে দোকানদার জিজ্ঞেস করল, কি নেবেন বৌদি? ফিতে, টিপ, নেলপালিশ, লিপস্টিক, কত দামের মধ্যে চাই?

প্রশ্ন শুনে চমকে গেল স্মৃতিকণা। খসে পড়া ঘোমটা মাথায় টেনে দোকানের সামনে থেকে সরে যেতে চাইলেও পারল না। তাকে হাত ধরে ধুচুনি পিসি দাঁড় করালো। দোকানীকে বলল, সোনালী ফিতে একগজ, একপাতা টিপ, ঠোঁট আর নখের রং।

দোকানী একটা একটা করে জিনিস বার করে হলুদ ঝাড়নে মুঝে সামনের টেবিলের ওপর রাখতে ধুচুনি পিসি তাকে বলল, সব মিলে কত হল, আগে বলুন তো!

মুচকি হেসে দোকানদার ছোট একটা যন্ত্রে বোতাম টিপে টিপে হিসেব করে বলল, মাত্র দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাসিমা।

টাকার অঙ্ক শুনে স্মৃতিকণার মাথায় বাজ পড়ল। অনেকদিন ধরে জমানো সাতচল্লিশ টাকা আঁচলের খুঁটে যত্ন করে সে বেঁধে এনেছে। তার ধারণা ছিল সাতচল্লিশ টাকায় ঠোঁট আর নখের রং, টিপ, গন্ধ তেল, চুলের কাঁটা, আলতা প্রায় অর্ধেক পৃথিবী কেনা যায়। তার বদলে চারটে জিনিসের দাম দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা। লজ্জায় তার মুখ শুকিয়ে গেছে। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। দোকানীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। খনখনে গলায় ধুচুনি পিসি বলল, ভালো করে কাগড়ে মুড়ে বেঁধেছেদে দাও। অনেকদূর থেকে আমরা আসছি।

দোকানী বলল নিশ্চয়। শক্ত করে প্যাক করে দিচ্ছি। সোনালী ফিতে টিপের পাতা নামি প্রতিষ্ঠানের লিপস্টিক, নেলপালিশ সযত্নে দোকানী যখন প্যাক করছে, স্মৃতিকণাকে নিচু গলায় ধুচুনি পিসি বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি। তুই এখান থেকে নড়িসনি।

ভয়ে ভয়ে স্মৃতিকণা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছো পিসি?

কলঘরে।

কথাটা দোকানীর কানে যেতে আর প্রশ্ন করতে স্মৃতিকণা ভরসা পেল না।

প্যাকটে বেঁধে দোকানী অপেক্ষা করছে ধুচুনি পিসির জন্যে। দোকানে কাউণ্টার ছেড়ে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়েছে স্মৃতিকণা। লজ্জায় ঘাড় বেঁকে গেছে তার। সময় বয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত দোকানী জিজ্ঞেস করল, উনি কে হন আপনার?

আবছা গলায় স্মৃতিকণা বলল, পিসি।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দোকানী বলল, সোজা গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে কয়েক পা এগোলে

মেয়েদের কলঘর। দেখুন একবার সেখানে।

স্মৃতিকণার শরীরের ভেতরের সব স্নায়ু কাঁপছিল। দোকানীর চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চাইছিল। দোকানী নিজে থেকে কথাটা বলতে সে সামান্য স্বস্তি পেল। হাতে ঘড়ি না থাকলেও, ধুচুনি পিসি যাওয়ার পর পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেছে, আন্দাজ করতে তার অসুবিধে হল না। ধুচুনি পিসির এত দেরী হচ্ছে কেন। দোকানীর দেখানো রাস্তায় স্মৃতিকণা এগিয়ে গেল কলঘরের দিকে। পেছনে তাকানোর সাহস নেই। দোকানী হয়তো তাকে দেখছে। তার সম্পর্কে মানুষটা কি ভাবছে, কে জানে! বাঁ দিকে ঘুরে দোকানীর চোখের আড়ালে এসে সে ঘাড় ঘোরাল। দোকানীকে দেখা যাচ্ছে না। মানুষের ভিড় বাড়ছে। বেশির ভাগ মেয়ে, পুরুষ কম। দু'একজন পুরুষ তাকে দেখছে। স্মৃতিকণার আবার শীত করছে। অস্পষ্ট কাঁপুনি টের পাচ্ছে সে। পা চালিয়ে আরো কিছুটা এসে কলঘর খুঁজে পেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই হেঁড়ে গলায় একজন হেঁকে উঠল, এটা নয়, এটা নয়, সামনে ডান দিকে।

কেউ একজন খিঁচিয়ে উঠল, গাঁইয়া ভূত।

প্রায় দৌড়ে স্মৃতিকণা বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ভুল করে ছেলেদের কলঘরে ঢুকে গিয়ে তার মাথার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে। পুরুষদের টয়লেট থেকে একজন স্ত্রীলোককে বেরোতে দেখে থমকে দাঁড়াল দু'জন মেয়ে। পেছনে থেকে একজন বলল, ডানদিকে।

মেয়েদের কলঘর খুঁজে পেতে স্মৃতিকণার অসুবিধে হল না। কলঘরে ফাঁকা, সেখানে কেউ নেই। ভালো করে চারপাশ নজর করল সে। চাপা গলায় দুবার ডাকল, পিসি, পিসি। কেউ সাড়া গিল না। দ্বিতীয়বার সে ডাকার মুহূর্তে যে দুজন ঢুকলো, বায়োস্কোপের নায়িকাদের মতো সাজগোজ, 'পিসি' ডাকটা তারা শুনেছে। ফাঁকা টয়লেটে মাথায় ঘোমটা ঢাকা একজন বৌকে 'পিসি' বলে ডাকাডাকি করতে শুনে তারা ঠোঁট টিপে হাসল। কলঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো স্মৃতিকণা। ফিতের দোকানটার সামনে ধুচুনি পিসি ফিরে গেছে ভেবে, সেদিকে পা বাড়ালো। যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল, সেখানে অনেক হাঁটাহাঁটি করেও দোকানটা খুঁজে পেল না। ফোটারাটাও কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। অচেনা কয়েকটা প্রসাধন আর সুগন্ধীর দোকানের পাশ দিয়ে কাঁচের বাসনের বিভাগ সে পৌঁছে গেল। রাশি রাশি কাঁচের থালা, বাটি, গ্লাস, কাপ ডিস। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে কাঁচের পাহাড়। কাছাকাছি কোনো দোকানে ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। কারো হাত থেকে নিশ্চয় কাঁচের কোনো বাসন পড়ে গেল। কাঁচ ভাঙার শব্দে স্মৃতিকণা চমকে উঠেছে। কাচের বাড়ার ছেড়ে বিছানার বাজার, সেখান থেকে আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বাজার ঘুরে তিনতলায় উঠে শিশুদের খেলনার দোকান, বই-এর দোকান, খাওয়ার ঘর পার হয়ে দিশাহারার মদো ধুচুনি পিসির খোঁজে স্মৃতিকণা ঘুরতে থাকল। বরফের মত ঠাণ্ডা সারা শরীরে চেপে বসছে। মনে হচ্ছে, জমে যাচ্ছে বুকের রক্ত! বন্ধ হয়ে আসছে কণ্ঠনালী। কিছুক্ষণ পরে কথা বলতে পারবে না। ময়দানে নিশ্চয় সভা শুরু হয়ে গেছে। রোদের তাপ কমে ছায়া নেমেছে মাঠে। হাওয়ায় উড়ছে নিশান। হাঁ করে কার্তিক ভাষণ শুনছে, আর ভাবছে দিন বদলের বেশি দেরি নেই। তার জীবনটা অভাবে কাটলেও তার ছেলে গোরা সুখে থাকবে। তখনই

স্মৃতিকণার মনে হল, ধুচুনি পিসিকে আর খোঁজার দরকার নেই। রাজবাড়ির মতো এই বাজার থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। শহরটা অচেনা হলেও সে হারিয়ে যাবে না। ময়দানের সভায় সে একাই পৌঁছে যাবে।

বাজার থেকে বেরনোর জন্যে যে দরজার সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো সেটা সদর দরজা নয়। আসবাবের বাজারে গিয়ে হাজির হল সে। সেখান থেকে পৌঁছে গেল পাথরের নানা সামগ্রী আর মূর্তির বাজারে। পাথরের মূর্তিগুলো বেশ জীবন্ত। তাদের নিঃশ্বাস পড়ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠাপড়া করছে বুক। ভয় পেয়ে স্মৃতিকণা সরে গেল। চলন্ত সিঁড়িতে দোতলায় এসে হঠাই সেই ফিতের দোকানটা পেয়ে গেল। স্মৃতিকণাকে দেখে দোকানদার চিনতে পেরে বলল, আপনার পিসি হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজছে। একটু আগেও এসেছিলেন। দাম দিয়ে আপনার প্যাকেট নিয়ে গেলেন। উত্তেজনায় গলা বুজে এলেও স্মৃতিকণা জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেল পিসি?

ডানদিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দোকানী বলল, পিসির সঙ্গে একজন বাবু আছেন। মোটাসোটা কালো, কপালে আব....

কথাটা শুনে ধক করে উঠল স্মৃতিকণার বুক। পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। ডানদিকের রাস্তায় যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো। কালো মোটা, কপালে আব লোকটাকে চিনতে তার অসুবিধে হল না। লোকটার নাম বিলাস হাজরা। বুঝল তার স্বামীর মনিব। কলকাতার সভায় মেয়েদের যাওয়ার জন্যে দুটো বাস দিয়েছে। বাস দেওযার কারণ এতক্ষণে টের পেল স্মৃতিকণা। ধুচুনিপিসি চোখের ইসারায় কেন এই বাজারে তাকে নিয়ে এসেছে, বুঝতে পারল। কোন্ ভরসায় তাকে ফিতে, টিপ, ঠোঁট, আর নখের রং কিনে দিতে চেয়েছিল ধুচুনি পিসি, জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

ডানদিকের রাস্তার বদলে বাঁয়ে ঘুরলো স্মৃতিকণা। বিলাস হাজরা আর ধুচুনিপিসির মুখোমুখি হতে সে চায় না। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে সভায় ফিরতে চায়। সে বুঝে গেছে যে, বিলাসের খপ্পরে একবার পড়ে গেলে তার আর ঘরে ফেরা হবে না। বাজারের নানা বিপনি ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখলেও যাওয়ার রাস্তাটা সে খুঁজে পাচ্ছে না। বাজার ক্রমশ ফাঁকা হতে শুরু করেছে। পাতলা হচ্ছে দোকানের ভিড়। দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করছে দোকানের। দোকান বন্ধ হলেও ভেতরের সব আলো জ্বলছে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু দোকান, সারি সারি দোকান। আলোয় ঝলমল করছে সমস্ত দোকান ঘর। কাপড়ের বাজার থেকে গয়নার বাজার, সেখান থেকে প্রসাধন বাজার, এরপরে চামড়ার বিপনি, তারপর ঘড়ি, শেষে টিভি, রেডিও, ফ্রিজ বাজার থেকে বেরনোর পথ নেই। গোলকধাঁদার মত বহুতল বাজারে স্মৃতিকণা পাক খেতে থাকল। ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুটো পা। বাজার থেকে বেরোনর রাস্তাটার হদিস কিছুতেই করে উঠতে পারছে না। কোন তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, বোধগম্য হল না। বাজার যত ফাঁকা নিস্তব্ধ হচ্ছে, তত বাড়ছে তার ভয়। চড়া আলোয় দোকানগুলো যেন হা হা করে হাসছে। চারপাশ থেকে গুটি গুটি করে এগিয়ে আসছে ঘিরে ধরছে তাকে। তাদের দেখা না গেলেও তারা রয়েছে। আতঙ্কে কাঁটা দিয়ে উঠল স্মৃতিকণার শরীর। সে অনুভব করল, আলোর মধ্যেও আড়াল

থেকে যারা নজর রাখছে, তাকে দেখছে, তারা বিলাস হাজরা নয়, ধুচুনিপিসিও নয়। চোখের আঠায় তারা জড়িয়ে ফেলবে তাকে। ধীরে ধীরে গিলে নেবে। দু'হাত মুখ ঢেকে স্মৃতিকণা মেঝেতে বসে পড়ল। ঘড় ঘড শব্দে তখন বন্ধ হয়ে গেল বাজারের সদর দরজার লোহার ঝাঁপ। পাঁচতলা বাজারের প্রতিটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি ঘুরতে থাকল। পরপর দু'দিন রবিবার আর ব্যবসা বন্ধের জন্যে বাজার খুলবে না। ঝাঁপ টানার পরে বাজারের দুই নিরাপত্তাকর্মী আজ মহা খুশি। দু'জনে এখন দমভোর বাংলা মাল টানবে।

সভা শেষ করে বিলাস হাজরা আর ধুচুনি পিসি বাসে চেপে ঘরে ফিরছে। দু'জনে বসেছে দুটো বাসে। আলাদা বসলেও দু'জনের মুখে হতাশার ছাপ। কুড়ি বছরের মেয়েটা মুঠোর মধ্যে এসেও কিভাবে ফসকে গেল ধুচুনি, কিম্বা বিলাস, কেউ বুঝতে পারছে না। তরতাজা মেয়েটা বাজার থেকে যেন উবে গেল। বিলাসের সন্দেহ হল, তার চেয়েও বড় কোন রাঘব বোয়াল স্মৃতিকণাকে গিলে নিয়েছে!

সখী সম্বাদ

মিহির ভট্টাচার্য

আকাশের বর্ণ দেখিলে মনে বিষণ্ণতা হয়। পোড়া ইঁটের গায়ে ছাইয়ের হালকা প্রলেপ পড়িলে যেরূপ দৃষ্ট হয় সেই রূপ টুকরা টুকরা মেঘ দৃশ্যমান আকশখণ্ডকে সজ্জিত করিয়াছে। নীল শাড়ির জমিনে চুমকি বসাইলে যেরূপ হয়। চুমকির আকৃতি একই রূপ থাকে। মেঘখণ্ডগুলি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, একই প্রজাতির হইয়াও নিঃসঙ্গ। তদুপরি সূর্যালোক ম্রিয়মাণ। দিন শেষ হইবে।

অফিস হইতে বাহির হইয়া, ফটপাথে পা রাখিয়া সৌহিনীর নিঃসঙ্গতা তাহাকে পাতলা চাদরের মতো জড়াইয়া ধরিল। রাস্তায় অসংখ্য মানুষ। নারী ও পুরুষ। সকলেই ইঁদুরের মতো ব্যস্ত, ত্বরিত গতি। হয়তো সকলেই ঘরমুখী; না-ও হইতে পারে। তবে নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। আছে বলিয়াই তাহাদের ব্যস্ততা। কিছু আছে সোহিনীর মতো। শ্লথগতি। আশ্রয় আছে। ফিরিতে হইবে। তাগিদ কম। সেখানে নিঃসঙ্গতা আরো বেশি। একমাত্র অফিসেই যে নিঃসঙ্গ বোধ করে না। বরং বেশিই সঙ্গ পায়। তাহাদের কোনো একজনকে সঙ্গ দিতে বলিলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা হয় না। অফিসে দশজনের পরিবেশে ঠিক আছে। বাহিরের একান্তে সে কি রূপে দেখা দিবে তাহা সোহিনীর মনে শঙ্কা সৃষ্টি করে। দীর্ঘ তিন বছরের অভিজ্ঞতায় সে বুঝিয়াছে, পুরুষদের ভিতরটা দেখিবার ক্ষমতা তাহার নাই। অফিসের সহকর্মী নারীদের সহিত খোলা মনে কথা বলিতে গিয়া সে বলিয়া ফেলিয়াছে— 'মেয়ে হয়ে মেয়েদেরই বুঝতে পারি না, তায় পুরুষ মানুষকে! মা-ই নিজের ছেলেকে বুঝতে পারে না!' প্রসঙ্গ উঠিয়াছে শুভ্রকে ঘিরিয়া। রূপা প্রশ্ন করিয়াছিলো — 'বিয়ের আগেও তো তুই ওর সঙ্গে এক বছরের ওপর মিশেছিস!'

যথার্থ বলিতে কি শুভ্র-র সহিত তাহার মেলামেশা আরো বেশি দিনের। চাকরি পাইবার পর মাস ছয়েক অফিসে ব্যাপরটি কাহাকেও সে জানিতে দেয় নাই। শুভ্রকেও বলিয়া দিয়াছিলো--- 'অফিসের ধারে কাছে এসে না লক্ষ্মীটি। নতুন নতুন সকলের কৌতুহলের সামনে আমার অস্বস্তি হবে।'

--- ও বাব্বা পরিচয় গোপন করতে চাও। এর পরে তো অস্বীকার করতেও পারে। ঠিক আছে শর্ত মেনে নিচ্ছি,। পরে কিন্তু পুষিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে বিয়ের পর!'

— এই অসভ্য।' সেইদিন রেস্টুরেন্টের পর্দার আড়ালে শুভ্রকে অফিস ব্যাগের বাড়ি খাইতে হইয়াছিল। এইরূপ প্রতি মুহূর্তে কৌতুক ও মজা করিত সে। সোহিনী ভাবিয়া পায় না এখনও, এরূপ ব্যক্তি নিজের প্রকৃত রূপকে এরূপ কৌশলে আড়াল করিতে পারিয়াছিল কিভাবে।

সত্যই কি শুভ্র সচেতনভাবে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, না এমন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় নাই যাহাতে সে প্রকট হইয়া পড়ে? অথবা, চোখের সামনে কোনো কোনো সময় প্রকট হইয়া পড়িলেও সোহিনী দেখিতে চাহে নাই কিংবা মনে করিয়াছে উহা সে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে?

সোহিনী চাকুরি পাইবার পরের রবিবার শুভ্রদের বাড়িতে গিয়াছিল। তাহাদের মেলামেশা লইয়া

উভয় বাড়িতে কোনো অমত ছিল না। তাহারা অবাধে উভয় বাড়িতে যাইত। বাড়িতে বসিয়াই প্রেমালাপ করিত। রতিক্রিয়া ছাড়া দৈহিক সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। রতিক্রিয়া ঘটিয়া যাইত। সোহিনী রাজি হয় নাই। আশ্চর্য, বিবাহের পূর্বে শুভ্র কোনোদিন শক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে নাই। করিলে শেষাবধি সোহিনী প্রতিরোধ করিতে পারিতো কিনা সন্দেহ। সেই দিন নিজেদের ভবিষ্যত লইয়া কথা উঠিয়াছিল। শুভ্র সেই কথাসূত্রে এক সময় বলিয়াছিল - 'মাইনে পেলে বাড়িতে যত কম পারবে দিও। বাকিটা নিজেদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জমানো দরকার।'

কথাটা শুনিয়া সোহিনীর মনে একটি ঘটাধ্বনি হইয়াছিল। শুভ্র কি তাহার উপর নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিতেছে? তাহার রোজগারের অর্থ সে কি করিবে তাহা সম্পূর্ণই তাহার ব্যাপার। শুভ্র নাক গলাইবে কেন? পরক্ষণেই শুভ্র-র খুনসুটিতে ভুলিয়া গিয়া ভাবিয়া লইয়াছে—ও সে রূপ চিন্তা হইতে বলে নাই। ছেলেরা অনেক ব্যাপারেই বোকা বোকা কথা বলিয়া ফেলে।

ফুটপাথ ধরিয়া আপন মনে বাস স্টপের দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে শুভ্র-র সহিত তাহার সম্পর্কের প্রসঙ্গ লইয়া স্মৃতিচারণা সোহিনীর একটা নিত্য অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর ছয় মাস কাটিতে না কাটিতে এই অভ্যাস শুরু হইয়াছে এখনও চলিতেছে। মধ্যবর্তীকালে কত ঘটনা, কত অশান্তি তিক্ততা পার করিয়া তিন মাস আগে মুক্তি ঘটিয়াছে। শুভ্র-র সহিত সোহিনীর বিবাহ বিচ্ছেদ আইনত হইয়া গিয়াছে। অথচ স্মৃতিচারণ যায় নাই, এমন কি শুভ্রও অন্তর্হিত হয় নাই। সে এখনও সোহিনীর জীবনের উপর একটি কৃষ্ণবর্ণের সামাজিক ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিন্দুমাত্র যোগসূত্র নাই তো কি হইয়াছে! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত একটি সামাজিক পরিমণ্ডল তো রহিয়াছে! এই পরিমণ্ডলের প্রায় সকলেই ভাবভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি ও নীরবতা দিয়া সোহিনীকে বুঝাইয়া দিতে চাহিতেছে—মেয়ে হইয়াছ এইটুকু সহিতে পারিলে না! এই পারিপার্শ্বিক চাপের মুখে পড়িয়া সোহিনী চিন্তা করিয়াছে এবং এখনও সে চিন্তা বর্জন করে নাই যে, সে সম্পূর্ণ একক, স্বতন্ত্র ভাবে জীবনযাপন করিবে। নিজের মতো বাড়িভাড়া করিয়া থাকিবে। সমস্যা হইয়াছে সুবিধামতো বাসা পাওয়া। একা মেয়েকে সাধারণ মধ্যবিত্ত পাড়ায় কেহ ঘর দিতে চাহেনা। যেসব অঞ্চলে পাওয়া যায় সেইখানে থাকার সামর্থ ও মানসিকতা সোহিনীর নাই। বিকল্প হইল হস্টেল। কিন্তু সেখানে একান্ত জীবনযাপন অসাধ্য। নানান জটিলতা আসিয়া ভিড় করিবে। সোহিনী বহু সময় আপন মনে চিৎকার করিয়া প্রশ্ন করে—'এই বিরাট শহরে মানুষ কেন আমাকে আমার মতো করে থাকতে দেবে না? আমার একান্ত আপন ব্যাপার নিয়ে তাদের নাক গলানো কেন?

রাসেল স্ট্রিট অতিক্রম করিবার পর সোহিনী একটি ডাক শুনিতে পাইল—'এই সোহিনী, সোহিনী, দাঁড়া।' শব্দ অনুসরণ করিয়া সেহিনী ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল তাহার পশ্চাৎ হইতে অনু, অনুসূয়া তাহাকে ডাকিতেছে। অনুসূয়াকে দেখিয়া সোহিনীর মন ঝলকিত হইল। তাহার চোখেমুখে সেই ঝলকের আভা ফুটিয়া বাহির হইল। সে আবেগ তাড়িত হইয়া ফেলিয়া আসা পথ ধরিয়া কয়েক পা হাঁটিল। অনুসূয়া উচ্ছ্বসিতভাবে ওর দুইটি হত উষ্ণভাবে ধরিয়া বলিল— 'তোর খবর কি বল্? দিল্লি থেকে কবে এলি? থাকবি কদিন?'

—'দিন চারেক আগে এসেছি। নানান ঝামেলায় তোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। সৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে আসা যে কি ঝকমারি তা তোকে কি বলবো! শুভ্র-র খবর কি? তুই চাকরি করে যাচ্ছিস! দিল্লীতে আজকাল মেয়েরা অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুধু ঘর-গৃহস্থী নিয়ে খুশি।'

—'তোর বরও এসেছে?'

—'তাই তো বেশিদিন থাকতে পারবো না। সামনে রোববার মধ্যে আয় না শুভ্রকে নিয়ে।'

—'আমি একাই থাকবো।'

—'কেন, শুভ্র কি শহরে নেই?'

অনুসূয়া প্রশ্নটি করিয়া তীক্ষ্ণ ও পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে সোহিনীকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল। সোহিনী অস্বস্তিতে পড়িল। তাহার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইল, আত্মবিশ্বাসে কিছু চিড় ধরিল। মনে হইল, অনুসূয়ার সঙ্গে দেখা না হইলে এরূপ বিব্রত হইতে হইত না। তথাপি সে নিজেকে গুছাইয়া লইয়া বলিল—'শহরেই আছে।'

—'তবে'

—'সে অনেক কথা। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না।'

—'তোরা একসঙ্গে নেই?'

—'ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

—'অঃ।'

একটি অস্বস্তিকর, বিব্রত নৈঃশব্দ দুই সখীকে ঘিরিয়া ধরিল। অনুসূয়ার ভঙ্গিতে সেহিনী ক্ষুণ্ণ বোধ করিল। অনুসূয়া তাহার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল। তাহার মধ্যে প্রচলিত প্রতিবন্ধকতাগুলি ভাঙ্গিবার প্রবণতা ছিল। তাহারা কলেজ জীবনে অনুসূয়াকে বিদ্রোহীনী এবং দুঃসাহসী মনে করিত।

—'শুভ্র তো ভালো ছেলে! তোদের মধ্যে এমন কি হলো?'

—'বললাম তো অল্প কথায় বোঝানো যাবে না। তোদের বাড়িতে যাবো।'

—'তুই আছিস কোথায়? কতদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে?

—'আপাতত মায়ের কাছে আছি। বেশি দিন থাকবো না। বাসা খুঁজছি। পেলেই এক একা থাকবো। ছাড়াছাড়ি হয়েছে বছর দেড়েক। মাস তিনেক আগে ডিভোর্সের রায় পেয়েছি।'

—'তুই তাহলে এখন একা?'

—'হ্যাঁ। তোদের বাড়িতে কখন গেলে সকলের সঙ্গে দেখা হবে?'

—'আমাদের তো টাইট প্রোগ্রাম। তোর সুবিধে মতো চলে আয়। অফিসের পর তো তুই ঝাড়া হাত-পা।'

অনুসূয়া বন্ধুত্বের খাতিরে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পা পারিয়া মোহিনীকে আমন্ত্রণ জানাইবার পর মুহূর্তেই শঙ্কিত হইল। ডিভোর্সি মেয়েদের নানান গল্প সে দিল্লীতে শুনিয়াছে। তাহারা অনায়াসেই পুরুষদের আকৃষ্ট করে। সৌম্য সামাজিকতার খাতিরে মেয়েদের প্রতি গায়ে-পড়া সৌজন্য দেখায়। অনুসূয়ার মনে হয় না তাহা শুধুমাত্র সামাজিকতা। তাহা ছাড়া, অনুসূয়ার মনে পড়িল, সৌম্য বরাবরই

সোহিনীর প্রশংসা করে। বলে---'তোমার অন্য কোন বন্ধু ওর মতো না।' অনুসূয়া কিছুক্ষণের যতির পর বলল— 'তুই বরং একটা ফোন করে আসিস।'

অনুসূয়ার কথা শুনিয়া সোহিনী মুচকি হাসিল। তাহার পরিচিত, ঘনিষ্ঠ মহিলারা সকলেই বাড়িতে যাইতে চাহিলে তাহাদের নিঃসঙ্কোচে আসিতে বলে না সকলেই কেমন দ্বিধার সহিত, এড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া রাজি হয়। শুভ্র-র সহিত বিরোধ সৃষ্টি হইবার পর তাহার বাবা-মা-ভাই-বোনও তাহাকে আপন মনে করে নাই। কত রূপে তাহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে সে যাহা করিতেছে তাহা ঠিক নহে। সোহিনীর চিন্তা ছিন্ন করিয়া অনুসূয়া বলিল---'এই আমি চলি রে।' অনুসূয়া দ্রুতপায়ে গিয়া একটি ট্যাক্সি ধরিল। সোহিনী ধীরপদে বাস স্টপের দিকে আগাইয়া চলিল।

বিবাহের পর কয়েক মাস বড় আনন্দে কাটিয়াছে সোহিনীর। হিন্দু রীতি-রেওয়াজ মতো তাহাদিগকে মাসখানেক নানান অনুষ্ঠান ও নিমন্ত্রণের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাইতে হইয়াছে। তাহার মধ্যেও ছিল পুলক, নতুনত্বের স্বাদ। ইহার পর য়োরোপীয় কায়দায় মধু আর চাঁদ উপভোগ করিয়াছে। পাহাড় আর সমুদ্র তীরে গিয়াছে। তখন দুইজনের দৈহিক সম্পর্কেও গভীর রোমাঞ্চ, নিবিড় উন্মাদনা। তাহার পর কখন সকল রসের ধারা শুকাইতে লাগিল এবং শুভ্র র কৃষ্ণবর্ণ নখদন্ত দেখা দিল। তাহার মা-বাবা পুত্রের সকল বিষয়ে কেমন নির্লিপ্ত। তাঁহারা সোহিনীর সমর্থনে বা বিরুদ্ধে কোন অবস্থানই লন নাই। সে ক্রমে বুঝিয়াছে, শুভ্র বাবা-মাকেও মানে না।

শুভ্র প্রথমে আত্মপ্রকাশ ঘটাইল সোহিনীর মাহিনার টাকা লইয়া। কোনরূপ ইঙ্গিত না দিয়ে অকস্মাৎ দাম্পত্য জীবনের ছয় মাসের মাথায় শুভ্র তাহাকে বলিল 'তুমি মাইনে পেয়েছো?'

—'পেয়েছি।'

—'টাকাগুলো আমার কাছে দাও।'

—'কেন? আমার খরচা আছে না!'

—'তুমি বহুৎ আজেবাজে খরচ করো। তাছাড়া টাকা পয়সা একজনের হাতে থাকা ভালো।'

—'বেশ তো তোমার টাকাটা আমার কাছে দিয়ে দাও।' সোহিনীর চোখে মজা, মুখে কৌতুকের হাসির ছোঁয়া।

শুভ্র তাহার কথা শুনিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। নতুন করিয়া কিছু বলিল না। সেই দিন রাত্রে যৌনমিলনের সময় শুভ্র হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিল। তাহাকে ব্যথা দিবার জন্যই তাহার দেহকে এমনভাবে নিপীড়ন করিতে লাগিল যাহা সহ্য করিতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাহার সহিত জোরাজুরি করিয়া নিজেকে মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যৌনমিলনের এত দিনের আনন্দ সেদিন তিক্ত হইল। ইহার পর শুভ্র অসভ্যতা মাত্রা ছাড়াইতে লাগিল। তাহার মাহিনার টাকা কাড়িয়া লওয়া, যৌনমিলনের নামে দৈহিক নিপীড়ন এবং কুৎসিৎ ভাষায় তাহাকে অপমান করা নিয়মিত ঘটনা হইল। সোহিনী কোনোভাবেই তাহাকে বশ মানাইতে বা বদলাইতে পারে নাই। সে মাঝে-মধ্যেই শুভ্রকে এড়াইবার জন্য পিতৃগৃহে চলিয়া যাইত। সেখানেও নিজেকে তাহার বহিরাগত মনে হইত। বাড়ির লোকেরা তাহাকে সহ্য করিয়া লইত কিন্তু আপন বলিয়া ভাবিত দিত না।

ইহা ছাড়াও ছিল শুভ্র। সে দুই দিন অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় দিন বৈকালে ঠিক আসিয়া হাজির হইত। বাড়ির সকলের সহিত সুমধুর ব্যবহার তাহার অস্ত্র ছিল। কথা দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিত সোহিনীর প্রতি গভীর প্রেমবশত সে আর থাকিতে পারে নাই, ছুটিয়া আসিয়াছে।

—'একটা ফোন পর্যন্ত পাইনি। ভাবলাম, শরীর খারাপ হলো কি না। ওদিকে বাবা- মা তো অস্থির।'

সোহিনী হতভম্ব। সে তাহার মুখোশ খুলিয়া দিবার মতো সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিল না। সাধারণ একটি কথা বলিতে পারিত -'এতই যখন চিন্তা তখন তুমিও তো অফিসে বা বাড়িতে ফোন করে খবর নিতে পারতে।' সোহিনী তাহাও পারে নাই। মনের গভীর জ্বালা ও ক্রোধ লইয়া সে শুভ্র-র সহিত ফিরিয়া আসিয়াছে সেই চক্রে। ক্রমশ তাহার নিকট শুভ্র অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত সোহিনী শুভ্র-র সহিত দৈহিক মিলন হইতে বিরত হইল। তাহারও উপায় নাই। শুভ্র বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। রীতিমতো গালিগালাজ শুরু করিল। এক দিন পরিস্থিতি চরমে পৌঁছাইল। সেদিন ছিল মাসের প্রথম দিন। সোহিনী মাহিনা পাইয়া সোজা পিতৃগৃহে গিয়া নিজের আলমারিতে টাকা রাখিয়া শ্বশুরবাড়িতে ফিরিল। পিতৃগৃহের ওই আলমারির অধিকার বিবাহের পর খর্বিত হয় নাই। সেদিন রাত্রে শুভ্র চরম অসভ্যতা করিল। টাকার দাবিতে, যৌনমিলনের দাবিতে ক্ষিপ্ত হইয়া সে সোহিনীব গালে সজোরে চড় মারিল। শুভ্র এতখানি নিচে নামিতে পারে সোহিনী ভুলেও ভাবে নাই। তাহার সকল আস্থা, বিশ্বাস ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। শুভ্রর প্রতি যদি বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও থাকে তাহা অন্তর্হিত হইল। পরদিন সকালে সে শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিয়াছে।

পিতৃগৃহে আসিবার পর সোহিনী বুঝিতে পারিল সেখানে উষ্ণতা নাই। মা, বাবা বা ভাই অতিরিক্ত কিছু না বলিলেও তাহার ঘন ঘন পিতৃগৃহে আসা যে তাহারা পছন্দ করিতেছে না তাহা ভাবে ভঙ্গিতে আচরণে বুঝইতে ছাড়ে নাই। শুভ্র তাহাদের নির্বাচিত পাত্র নহে-- সোহিনীর স্বেচ্ছাকৃত। সেই স্বেচ্ছাবরণের ঝক্কি-ঝামেলা তাহারা লইতে রাজি নহে— সোহিনীর মনে হইয়াছে ইহাই তাহাদের নীরব জ্ঞাপন। পাঁচ-ছয় দিন অতিক্রান্ত হইবার পর শুভ্র তাহাকে লইতে আসিল না দেখিয়া সোহিনীর মা মেয়েকে সরাসরি প্রশ্ন করিলেন—'তোর কি শুভ্র-র সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে?'

মনোবেদনায় এবং ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত সোহিনী মা'র এই অসামান্য প্রশ্নে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার যন্ত্রণা কাহারও নিকট সে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল। ঐ সময় তাহার বারম্বার অনুসূয়ার কথা মনে পড়িয়াছিল। একান্ত আপন মনোবেদনাও একা একা বহন করা কঠিন। মায়ের নিকট সোহিনী ঝর্ণাধারার ন্যায় বাধাবন্ধহীন গতিতে সকল কথা বলিল। শুভ্র-র অত্যাচার, দুর্ব্যবহার, নীপীড়ন এবং তাহার ব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনা-সকল কথাই সে বলিল। মায়ের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া সে হতাশ হইল। মা সমগ্র বিষয়টির গুরুত্বই বুঝিলেন না। তিনি মেয়েকে বলিলেন—'স্বামী-স্ত্রী মধ্যে এসব হয়েই থাকে। তোর বাবা কি আমাকে কম দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। বিয়ের পর মেয়েদের মানিয়ে দিতে হয় বেশি।' মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া সোহিনীর মনোবেদনার উপশম তো হইলই না, উপরন্তু তাহাতে

একটি কটু স্বাদ যুক্ত হইল। সে সেই দিনই স্থির করিয়াছিল শুভ্র-র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবে এবং ঝামেলা মিটিলে নিজের মতো করিয়া একা থাকিবে। আইন-আদালতের ঝকমারি অতিক্রম করিতে পারিলেও একজন একা মেয়ের যে এই শহরে একাকী থাকা এত কঠিন তাহা সে সেইদিন ভাবিতে পারে নাই। চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা প্রতিনিয়ত তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করিতেছে। সোহিনী সেই কারণে একান্ত প্রয়োজন ভিন্ন মানুষের সহিত কথাবার্তা মেলামেশা এড়াইতে শিখিতেছে। ইহা বড় কঠিন কাজ। কথা তো বলিতে ইচ্ছা করে। সখ্যতার উষ্ণবায়ুর স্পর্শ তো মন চায়।

শনিবার ও রবিবার দুইদিন সোহিনীর অফিস ছুটি। এই দুই দিন তাহার মনে ভার হইয়া চাপিয়া বসে। কিছু ব্যক্তিগত টুকিটাকি কাজ, সপ্তাহান্তিক জামা-কাপড় কাচার কাজ ইত্যাদিতে কিছু সময় নিবেশ করিলেও অধিকাংশ সময় করিবার কিছু থাকে না। বাড়ির শীতল আবহওয়া মনের উপর আরো চাপ সৃষ্টি করে। বই নাড়িয়া-চাড়িয়া, টিভির সামনে বসিয়া কিছুটা সময় কাটায় সে। কিন্তু মানুষের নৈকট্যের মাদকতার পূরণ ঐসব হইতে হয় না।

এই শনিবার দিন সোহিনীর সময় লইয়া সমস্যা হইতেছিল। আজকাল কোন কোন শনি-রবিবার বাড়ি দেখিতে ছোটে। তাহাতে সময় কাটে। এই শনি-রবিবার সেরূপ কোন কিছু নাই। থাকিতে থাকিতে তাই অনুসূয়ার কথা মনে পড়িতেছিল সোহিনীর। অনুসূয়ার কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহারা এই রবিবারের পর কলকাতায় থাকিবে না। হয়তো দিল্লি ফিরিয়া যাইবে। সে বলিয়াছে ফোন করিয়া যাইতে। কেন? অনুসূয়া তাহার ডিভোর্সের কথা শুনিয়াই কি টাইট প্রোগ্রাম, টেলিফোন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনিয়াছে? সোহিনী ভাবিল মানুষের কথা কিছু বলা যায় না। মানুষ এখন প্রতিদিন মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া মনুষ্যবৎ হইয়া যাইতেছে। সোহিনীর মনে প্রবল হইতেছে সৌম্যকে দেখিবার ইচ্ছে, এক সময়ের প্রাণের সখী অনুসূয়ার নিকট নিজের মর্মবেদনা সকলি উজাড় করিয়া দিবার ইচ্ছা। সে হয়তো বুঝিবে শুভ্রর হীনতা। বুঝিবে তাহার নিজের অবস্থান কতখানি ন্যায়সঙ্গত।

অনুসূয়াদের বাড়ির দরজায় বহুদিন পর পা রাখিল সোহিনী। বিবাহের পর একদিন শুভ্রকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল দেখা করিতে। তাহার পর আর আসে নাই। মাসিমা নিশ্চয়ই এমন প্রশ্ন করিবেন যাহাতে সে আড়ষ্ট বোধ করিবে। বেল বাজাইতে অনুসূয়ার মা-ই দরজা খুলিলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি পূর্বেকার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন না। সাধারণ সৌজন্যমূলক প্রশ্ন করিলেন—'সোহিনী, তুমি এত দিন পরে? ভালো আছো তো!'

সোহিনী মাথা হেলাইল। তাহার মনে হইল অনুসূয়ার মা তাহার বর্তমার অবস্থা জানেন এবং সে তাঁহার প্রত্যাশিত অতিথি নহে। তিনি সোহিনীকে ভিতরে ঢুকিবার জন্য পাশ দিলেন। তাঁহার মনে প্রশ্ন রহিয়াছে তথাপি তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। সোহিনীকে তিনি ভালো বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু, অনুসূয়া যাহা বলিয়াছে, তুচ্ছ কারণে স্বামীর সঙ্গে বিরোধ করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো কোনো সুশীলা মেয়ের লক্ষণ নহে।

—'মা কে এসেছে?' অনুসূয়ার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।

—'সোহিনী।'

অনুসূয়া প্রায় তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিল—'তুই? ফোন করে এলি না কেন?

—'ভাবলাম যাই। তোরা বড়িতে না থাকলে ঘুরে চলে যাবো।'

অনুসূয়ার মুখে কোন পুলকের ভাব নাই, বিরক্তির প্রকাশও নাই। সে সৌজন্য বজায় রাখিয়া বলিল —'আয়।'

ঘরে ঢুকিয়া সোহিনী দেখিল সৌম্যও রহিয়াছে। তাহার মুখ উজ্জ্বল হইল। সৌম্যের মুখও সোহিনীকে দেখিয়া উদ্‌ভাসিত হইল। সে বলিল—'আরে, কী সৌভাগ্য! তুমি সশরীরে। তুমি তো এখন বিগ নিউজ।'

সোহিনী ধাক্কা খাইল। অনুসূয়া বাড়িতে সকলের কাছেই গল্প করিয়াছে। তথাপি বিষয়টিকে হালকা করিয়া বলিল—'তাহলে তোমার কাছে নিউজের অভাব হচ্ছে।'

'ও বাব্বা! চিড়িয়া বোলতী হ্যায়।' বলিয়া সৌম্য সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। সে সোহিনীর দেহের দিকে নিঃসঙ্কোচে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল—তাহার নারীত্ব পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। একাকীত্ব তাহাতে যে গৈরিক আভা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সোহিনীকে পূর্বের তুলনায় আকর্ষণীয় করিয়াছে। অনুসূয়াও সুন্দরী কিন্তু নরম নরম, খরতা নাই। পুরুষ সংসর্গে নারী-সৌন্দয কিছু প্রস্ফুটিত হইয়া কেমন তীব্রতা হারাইতে থাকে। সোহিনীর তাহা হয় নাই। শুভ্র এমন রমণীরত্ন অবহেলা করিল! সৌম্য পুনরায় বলিল—'বোসো সখি! কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। আফসোস, পরশুই চলে যাবো।'

অনুসূয়া তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সৌম্য ও সোহিনীকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার মা-ও কোন কারণে ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। তিনি উহাদের কথাবার্তা শুনিয়া, ব্যবহারের ধরন দেখিয়া, সৌম্যর দৃষ্টি দেখিয়া মেয়েকে ডাকিলেন—'অনু একবার শুনে যা তো।' অনুসূয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের ডাকে সাড়া দিল।

সৌম্য অনুসূয়া ও তাহার মায়ের দিকে তাকাইয়া কি লক্ষ্য করিয়া মুচকি হাসিল। তাহার পর মুখভাবে পরিবর্তন আনিয়া বলিল—'এখন তো স্বাধীন! কোন বন্ধু-বান্ধবও জোটাও নি? এমনি করে চলবে?'

—'সে সব নিয়ে ভাবিনি। আপাতত নিজের মতো করে বাঁচবো বলে বাসস্থান খুঁজছি। বন্ধুবান্ধব হতে চায় অনেকে। তাদের নিয়ে ভাবার এখনও সময় পাইনি।'

—'কিছুদিনের জন্য দিল্লি ঘুরে যেতে পারো। আমাদের ওখানে থাকবে। জায়গা পাল্টালে মন হালকা হয়।'

সোহিনী সৌম্যর প্রস্তাব শুনে তাহার চোখের দিকে তাকাইল। বোঝা মুশকিল। তথাপি সোহিনীকে দেখিবার তৃপ্তি রহিয়াছে দৃষ্টিতে।

অনুসূয়ার মা কন্যাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ র্ভৎসনা করিয়া বলিলেন—'বাঁধনছাড়া ওই মেয়েকে তুই রাস্তায়ই বলে দিতে পারিস নি যে তোরা থাকবি না, চলে যাবি। এখন এসে জুটেছে আর

সৌম্যও...!'

অনুসূয়া মায়ের কথা শুনিয়া আরো শঙ্কিত ও আতঙ্কিত হইল। তাহার মনে হইল, সৌম্য বরাবরই সোহিনীর প্রশংসা করিয়া থাকে। সোহিনীর সহিত সৌম্যের যত বার সাক্ষাৎ হইয়াছে সেও গায়ে পড়া ভাব দেখাইয়াছে। সে ঘরে ফিরিয়া দেখিল সৌম্য-সোহিনী কথা ও হাসিতে মশগুল। উহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে এক নিবিড় উষ্ণতার পরিমণ্ডল। তদ্‌পরি সৌম্যের শেষ কথাগুলি সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অনুসূয়ার সহসা পুরীর সমুদ্রতীরে স্নানের কথা। প্রবল জলোচ্ছ্বাস আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ধাক্কায় সে টাল সামলাইতে পারে নাই। উপরন্তু জলের জলের প্রবল টানে পায়ের তলায় বালি সরিয়া যাইতেছিল — সেই অবস্থায় সে বাঁচিয়াছিল সে সৌম্যের দেহ আঁকড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বলিষ্ঠ বাহু তাহাকে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই। এক্ষণে তাহার মনে হইল সোহিনী তাহা অপেক্ষাও বড় ঢেউ লইয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সে সৌম্যকেই না উপড়াইয়া লইড়া যায়। নিরাপত্তা হারাইবার নিরতিশয় আতঙ্কে অনুসূয়া দিশেহার হইয়া সৌম্যকে বলিল—'বেরোবে না। আমার কিছু কেনাকাটা আছে। কালকের জন্য আমি কিছু রাখতে চাই না। সোহিনী তুই একটা ফোন করে এলে প্রোগ্র্যামটা পালটানো যেতো।'

সোহিনী অস্বস্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল --'আমি চলি। তবু তোদের সঙ্গে দেখা হলো।'

সৌম্য অনুসূয়া বা সোহিনীর কথার কোন মূল্য না দিয়া বলিল — 'ধুর, বসো তো! কেনাকাটা তেমন কিছু নয়। কলকাতা থেকে না করলেও চলবে। তোমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ আবার কবে হবে!'

অনুসূয়ার চোখে জল আসিল। সোহিনী আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

অরিন্দমকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যায় সুতপা। চুপচাপ দুজনে বসে থাকে পলিথিনের রঙীন চেয়ারে। আরও কয়েকজন মনোরোগী বসে আছে। অরিন্দম সরু পাজামার উপর বুটিকের ঢোলা পাঞ্জাবি পরেছে। সে জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধের বই পড়ছে। সুতপা 'লি' কোম্পানির জীন্সের প্যান্টের উপর এ্যালেন-সলির --ব্রাউন কালারের ঢোলা সার্ট পরে এসেছে। পায়ে পরেছে রিবকের দামি ফ্ল্যাট হাই হিল। প্লাক করা দুই ভুরুর মাঝখানে ব্রাউন কালারের টিপ। সুতপা হাতে শাখা পরে না। কপালে-সিঁথিতে সিঁদুর লাগায় না। পলা-লোহা এসবও পরে না। এমনকি সোনার চুড়ি-বালা কিছুই পরে না। সুতপার সোনার চুড়ি-বালা লজ্জা পাবে — ঐ উজ্জ্বল সোনার বরণ হাতের রঙের কাছে। সুতপা পায়ের উপর পা তুলে মাঝে মধ্যে স্যাম্পু করা সিল্কি সর্টস্টেপ চুলের ভাজ কপাল থেকে হাত দিয়ে সাইডে সরিয়ে দিচ্ছে। কখনও কখনও ছোট্ট বাটিকের রুমাল দিয়ে নাকের ডগায় শিশির বিন্দুর মতো ঘাম তুলে ফেলছে। এমন সময় সুতপার দিকে কাত্ হয়ে অরিন্দম বলে, 'দ্যাখো দ্যাখো জুলি, আবার একটি লাইন, অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ।' সুতপা সর্টস্টেপ চুলের ভাঁজ ঠিক করতে করতে বলে, 'আবার কেন বলছো?' এই লাইনটা তুমি প্রায়ই বলো। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ঐ শুনে তোমাকে নিয়ে কুৎসিত রকমের joke করে। You can't understand their jokings.'

অরিন্দমের আর বই পড়তে ভাল লাগছে না। সে সুতপার সাথে গল্প করে, খুব আস্তে গলার স্বর নামিয়ে এনে বলে, 'অনর্থক অফিসটা কামাই করালে। আজকে ব্যাঙ্কে জরুরি কাজ ছিল। এভাবে কামাই করলে আমার প্রমোশন আটকে যাবে। তুমি যদি একটা কাজ পেতে ভালো হতো। কি করেই বা পাবে। সামান্য ইংরেজি অনার্সটা রাখতে পারলে না। এ্যা-তো পড়ালাম, কোশ্চেন-এনসার লিখে দিলাম! সব ব্যর্থ। অ-তো সাজগোজ রূপচর্চা নিয়ে থাকলে হয়! আচ্ছা জুলি, তুমি তো এমনিতেই সুন্দর। তাহলে এ্যা-তো উগ্র, এ্যা-তো নোংরা সাজ কেন?

সুতপা ক্রমাগত হাটু-পা নাচালেই বুঝতে হয়, সুতপা বিরক্ত হচ্ছে। সেই সুতপা বলছে, 'আঃ, রাহুল, তুমি একটু থামবে। Everybody overhears us. Stop please' অরিন্দম থামে না, বলে, 'পুরুষদের দেখাবার জন্যে? পুরুষদের কাছে যাবার জন্যে? আমি কি যথার্থ পুরুষ নই। আসলে তোমাদের কাছে পুরুষরা হচ্ছে পণ্য। নারীদের মতো পুরুষরাও তোমাদের কাছে কমোডিটি।' অরিন্দম আর কথা বলে না। জীবনানন্দ ও লাবণ্যের সম্পর্ক ওকে টেনে নেয়, সে পুনরায় বইয়ের পাতায় ঢুকে যায়। একেবারে চুপচাপ। সিরিয়াস পাঠক। ফিরেও তাকায় না সুতপার দিকে। সুতপা ঘড়ির দিকে তাকায়। তিনটে বেজে গেছে। অথচ তিনটার সময় এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ডাঃ বিভাস সোমের সাথে। আরও পাঁচ-দশ মিনিট বসতে হয়।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

তারপর ডাক্তার সোমের এক কর্মচারী অরিন্দম এবং সুতপাকে চেম্বারের ভিতর নিয়ে যায়। ঠাণ্ডা ঘর পাখা নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় ঘর। দরজা-জানালা বন্ধ। হালকা সবুজ আলো জ্বলছে। ডাক্তার বিভাস সোম মুখ তুলে বলেন, 'বসুন' বললে অরিন্দম ডাক্তারের মুখোমুখি বসে।

ডঃ বিভাস সোম বলতে শুরু করে, 'আপনার স্ত্রী সুতপা বলেছেন আপনি যখন তখন যে কোন পরিবেশে, সে নিমন্ত্রিত বাড়িতেই হোক বা ঘরোয়া পার্টিতেই হোক, 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এই পৃথিবীতে' বলে ওঠেন। শুনে অনেকে হাসে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এছাড়াও যখন তখন যে কোন পরিবেশে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার বলেন, কালো টাকা, কালো অর্থনীতি, কালো সমাজ, কালো রাজনীতি, কালো ভালোবাসা, কালো হৃদয়। অন্ধকার, চারপাশে শুধু অন্ধকার। এসব বলেন কেন?' সুতপার বন্ধু-বান্ধব আপনাকে নিয়ে joke করে। হাসিঠাট্টা করে, তামাশা করে বলে ইনসেইন। বলে ইনস্যানিটির লক্ষণ। আপনি এইসব বুঝতে পারেন?

এসব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ডাঃ সোমের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে অরিন্দম সুতপাকে বলে, 'জুলি, বুকের বোতাম দুটি লাগাও খুলে গেছে। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।' সুতপার ঢোলা সার্টের উপরের দুটি বোতাম খোলা থাকলে ওর অহংকারী সুঠাম স্তনের উর্ধাঙ্গ লক্ষ্য করা যায় যেমন লক্ষ্য করা যায় কালার টিভির হিন্দি বিজ্ঞাপনে, ইংরেজি সিনেমায়। এইসব সিনেমা-বিজ্ঞাপন সুতপার প্রিয়। এখান থেকেই সে নানারকম পোষাক অনুকরণ করে।

ডাঃ সোম অরিন্দমের অপ্রাসঙ্গিক কথায় সামান্যতম গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, আপনি জানেন, আপনার স্ত্রী আপনাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন?' অরিন্দম স্বরের ভাজ খুলে উত্তর দেয়, 'জানি, তবে এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি স্বাভাবিকই আছি। তবে আমার একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তাই এলাম।'

এবার অরিন্দমের সাথে প্রশ্নপর্ব শুরু হয়।

ডাঃ বিভাস সোম ঃ আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো। সঠিক উত্তর দেবেন। ডাক্তার সোম প্রথম প্রশ্ন করেন ঃ আপনি জীবনানন্দ পড়তে ভালবাসেন?

কথাটা শুনে অরিন্দম মজা অনুভব করে।

সে সহাস্যে উত্তর দেয় ঃ জীবনানন্দ আমার প্রিয় কবি। রবীন্দ্রনাথ পড়ে আমি আনন্দ পাই। জীবনানন্দ পড়ে আমি নিজেকে দেখতে পাই, নিজেকে চিনতে পারি। যন্ত্রণা বোধ করি। মনের মলিন পর্দায় হেয়ার-ক্র্যাক লক্ষ্য করি।

ডাঃ সোম দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন ঃ আপনি কি কবিতা লেখেন?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় অরিন্দম ঃ লিখি, লিট্‌ল ম্যাগাজিনে।

ডাঃ সোম প্যাডে আঁক কষছেন, পয়েন্ট নোট করছেন, কাটছেন, আবার কাটছেন। আবার প্রশ্নও পরছেন ঃ আপনার লেখা কবিতার বই আছে?

অরিন্দম ঃ আছে দুটো।

ডাঃ সোম ঃ কবিতার বইয়ের নাম কি রেখেছেন?

অরিন্দম ঃ পেরেকে রেখেছো হাত। দুবছর আগে বেরিয়েছে।

ডাঃ সোম ঃ একটা কবিতা পড়ুন, কিছুটা।

ডাক্তারের কথা শুনে অরিন্দম মিত্র উৎসাহিত হয়। ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো যেন কথা বলছে। সুতপা কিন্তু বিরক্ত হয়, পা নাচায়। টেবিলের তলায় পায়ের উপর পা-রাখাটা সে বদল করে। চার আঙ্গ ল সমান করে একবার নেলপালিশে চোখ রাখে। অরিন্দম স্বরচিত কবিতা শোনায়। মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর।

বঙ্গপুত্র পেরেকে রেখেছো হাত

একবার উঠে এসো রক্তভূমি থেকে

চারদিকে মানব সন্তানেরা কাঁদছে

বিদেশি হাওয়ায় উড়িতেছে বাঙালির সভ্যতা

কে বলবে... দাঁড়াও পথিকবর

জন্ম যদি ... ...

ডাঃ সোম ঃ ঠিক আছে। এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন, আচ্ছা সব কবিরাই কি দেশ-প্রেমিক? সমাজ-সমালোচক?

অরিন্দম ঃ দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম ছাড়া কবি হওয়া যায় না। প্রগতিশীল কবি মানেই সমাজ বিশ্লেষক।

ডাঃ সোম ঃ আপনার স্বাস্থ্য তো চমৎকার। ব্যায়াম করেন?

অরিন্দম ঃ না সংযত এবং সংযম দুটোরই অভ্যাস আছে। ফলে স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পেরেছি।

ডাঃ সোম ঃ মেয়েবন্ধু আছে?

অরিন্দম ঃ আছে।

ডাঃ সোম ঃ কোনরকম শারীরিক সম্পর্ক?

অরিন্দম ঃ না নেই। শারীরিক সম্পর্কের জন্য সুতপাই আছে। তবে মেয়েবন্ধুদের সাথে চুমুটুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা মাঝে মধ্যে হয়ে যায়।

সুতপা শুনেও তাকায় না, লুকোয় না। অরিন্দম নিজেই বলে, ব্যাস্‌ ঐ পর্যন্তই। আমি তো সুতপাকেছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবো না। কবিতা এবং সুতপা আমার কাছে এক।

এই মুহূর্তে ডাঃ সোমের সবুজ-চেম্বারে সুতপার মনে পড়ে যায় অরিন্দমের সাথে এক আগুনে রাতের কথা।

ডাঃ সোম আঁক কষেন, নোট করেন, কাটেন, আবার নোট করেন।

ডাঃ সোম আপনার রাগ আছে।

অরিন্দম ঃ আছে।

ডাঃ সোমঃ রেগে গেলে কি করেন?

আরিন্দম ঃ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। দুরাত্তির হোটেলে কাটাই।

ডাঃ সোম ঃ পাঁচ বছর হলে বিয়ে করেছেন। সন্তান চান না?

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

অরিন্দম ঃ আমি চাইলেই তো হবে না। সুতপা এখনও রাজি নয়। সে আরও লাইফটাকে এনজয় করতে চায়। সে রূপচর্চার মধ্যেই সব কিছু ভুলে থাকতে চায়। আমি যেমন কবিতার মধ্যে।

ডাঃ সোম ঃ আপনি একটু আগেই বললেন, শারীরিক সম্পর্কের জন্য সুতপাই আছে। কিন্তু আপনার স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে। আপনি কি চাপ সৃষ্টি করেন?

অরিন্দম ঃ মোটেই না। আমি পছন্দ করি না। সুতপার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছে হলে নিজেকে সংযমে রাখি।

ডাঃ সোম ঃ এবার কিছু মামুলি প্রশ্ন করবো। আপনি কি ফুল ভালবাসেন?

অরিন্দম ঃ আমি সব রকমই ফুল ভালবাসি। তার মধ্যে জবা বেশি ভালবাসি।

ডাঃ সোম ঃ আপনি কি কি খেতে ভালবাসেন? সকালের খাবার, দুপুরের খাবার, বলুন।

অরিন্দম ঃ মুড়ি-দুধ-কলা, আমের দিন আম দিয়ে, কাঠাল দিয়ে। তেলেভাজা, মাগুর মাছ, এসব ভালবাসি। পাবদা, মোরল্লা ভালবাসি। নানা রকম তরিতরকারি রান্না।

ডাঃ সোম ঃ শীতকালে কি পোষাক পরতে ভালবাসেন?

অরিন্দম ঃ পাজামা-পাঞ্জাবি-পশমের চাদর। প্যান্ট-সোয়েটার।

ডাঃ সোম প্যাডে আঁক কষতে কষতে বলেন মিঃ অরিন্দম আমার আর প্রশ্ন করার নেই।

এবার ডাঃ সোম সুতপার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো। আপনি সঠিক উত্তর দেবেন। তাহলে আমার পক্ষে চিকিৎসা করতে সুবিধে হবে। আপনি যদি মনে করেন আপনার স্বামী থাকবে না, তাহলে আমি ওকে চলে যেতে বলবো।'

সুতপা চুল সরিয়ে বলে, থাকাটায় আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে ওর সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, ও থাকলে একটু অস্বস্তি হবে।

ডাঃ সোম সুতপার কথাটা লুফে নিয়ে বলে। না না আপনার স্বামী সম্পর্কে প্রশ্ন নয়, আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন।

এসব কথার মধ্যে হঠাৎ অরিন্দম উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ডাঃ সোম আমি বাইরে যাচ্ছি। সুতপাকে আমি অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে চাই না। সুতপা, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

অরিন্দম চেম্বার ছেড়ে চলে যায়।

ডাঃ সোম ঃ এসব ক্ষেত্রে শুধু পেশেন্টকেই প্রশ্ন করলে হয় না। সেজন্যে আপনাকেও প্রশ্ন করবো। সঠিক উত্তর পেলে আপনার স্বামীর চিকিৎসার সুবিধে হবে।

সুতপা ঃ অরিন্দমের সুচিকিৎসা হোক আমি চাই। ওর মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকুক। সবার কাছে সে যেন হাসি-তামাশার খোরাক না হয়। আপনি যা খুশি প্রশ্ন করুন আমি সত্যি কথাই বলবো। ডাক্তারকে কিছু লুকোতে নেই।

ডাঃ সোম ঃ আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি নিশ্চয় সাজতে ভালবাসেন?

সুতপা ঃ ভীষণ ভালবাসি। ওটা আমার একটা হবি বলতে পারেন। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ডাঃ সোম ঃ ছেলেবেলা থেকেই?

সুতপা ঃ From my school life. আমি সি. বি. এস. সি-র ছাত্রী ছিলাম।

ডাঃ সোম ঃ অন্য মেয়েদের সাজ দেখে, তাদের সুন্দর চেহারা দেখে হিংসে হয়?

সুতপা ঃ একটু-আধটু হয় বৈ কি। স্কুল লাইফ থেকেই হত।

ডাঃ সোম ঃ ঠোঁটের লিপস্টিক, খুব দামি মনে হচ্ছে।

সুতপা ঃ হ্যাঁ, ভেলভেট টাচ্ লিপস্টিক, রেভলনের। এগুলিকে বলে নন্-ট্রান্সফার লিপ-কালার। একটানা ছ-ঘন্টা থাকবে। উঠবে না। ঠোঁটের ক্ষতি করে না। ঠোঁটকে নরম রাখে। নরম ঠোঁট পুরুষের খুব প্রিয়। আমাদের দেশ এরকম লিপস্টিক তৈরি করতে পারে না। বিদেশ থেকে আসে।

ডাঃ সোম ঃ সর্ট স্টেপ হেয়ার স্টাইল। ডায়নাকে ফলো করেন নিশ্চয়।

সুতপা ঃ ডায়নার চুলের সর্ট স্টেপ কাটিং আমার ভীষণ প্রিয়।

ডাঃ সোম ঃ চুল কালার ডাই করেন নিশ্চয়।

সুতপা ঃ নিয়মিত নয়। তবে করি। ওরিল কোম্পানির হেয়ার কালার। মেড-ইন-প্যারিস।

ডাঃ সোম প্যাডে আঁক কষতে কষতে দু'মিনিট নীরবতা পালন করে বলেন, আপনার স্বামীর চিকিৎসার প্রয়োজনে আমাদের নানারকম প্রশ্ন করতে হয়, প্রশ্ন শুনে কিছু মনে করবেন না। আপনি বরাবর কালো ব্রা পরতে ভালবাসেন?

প্রশ্নটা শুনেই সুতপা বুকের দিকে তাকায়। সার্টের একটা বোতাম খুলে গেছে। কালো ব্রা সামান্য দেখা যাচ্ছে। বোতাম লাগাতে লাগাতে উত্তর দেয় সুতপা, শুধু কালো নয়। বিভিন্ন রঙের ভেতর জামা পরতেই ভালবাসি। বিয়ের আগে সাদাই ভালবাসতাম।

ডাঃ সোম ঃ আপনার স্বামী কি কোনদিন কালো ব্রা পরা নিয়ে আপত্তি করেছে?

সুতপা ঃ শুধু বলেছে, আমার ভাল লাগে না। তারপর থেকে শুধু কালোই পরতাম না। অন্য কালারেরও পরতাম। সাদাও থাকতো।

ডাঃ সোম ঃ আপনার কোনো ছেলে-বন্ধু আছে।

সুতপা ঃ In my college life অনেক ছিল। এখন একমাত্র একজনই আছে, তাপস ভৌমিক, কালার ইণ্ডাস্ট্রির মালিক। অরিন্দমের কলেজ লাইফের বন্ধু। ওর একটা কবিতার বই তাপসই বের করেছে।

ডাঃ সোম ঃ তাপসবাবু বাড়িতে আসেন?

সুতপা ঃ আসে।

ডঃ সোম ঃ তাপসবাবু বিয়ে করেছেন?

সুতপা ঃ করেছিল। এখন ডিভোর্স। তাপসের স্ত্রী একজন বিদেশি অধ্যাপককে বিয়ে করে লণ্ডনে চলে গেছে। এখন সেখানেই থাকে। তাপসের একটি ছেলে আছে। ভাবছি আমার কাছে রাখবো।

ডাঃ সোম ঃ তাপসবাবু যেমন অরিন্দমের কবিতার বই বের করেছেন, ঠিক সেরকম আপনাকেও অনেক কিছু প্রেজেন্ট করেন।

সুতপা ঃ করে। গলার সোনার হারটা তো তাপসই গড়িয়ে দিয়েছে। দামি শাড়ি তো কিনে

দেয়ই। এ ছাড়া স্টোন বা অরনামেন্টস যা দেখতে পাচ্ছেন, সবই তাপস দিয়েছে। শুধু তাই নয়। লণ্ডনে যাবার আগে তাপসের দেওয়া ম্যারেজ-রিংটা ওর বৌ রেখে গিয়েছিল, সেটা পর্যন্ত তাপস আমাকে দিয়েছে। ওর তুলনা হয় না।

ডাঃ সোম ঃ আপনাকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করছি, তাপসবাবুর সাথে আপনার কোন শারীরিক সম্পর্ক আছে?

সুতপা ঃ আছে। তবে বেশি আমল দেই না। দুতিন মাসে একবার। ভাল লাগে না। তবে বিদেশে তো অন্যদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক জলভাত।

ডাঃ সোম ঃ এর আগে কোনদিন, কারো সাথে।

সুতপা ঃ কলেজ লাইফে একবার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল খুবই দুর্বল মুহূর্তে, I can't control myself. It's my unforgetful great mistake.

ডাঃ সোম ঃ ওকে তো পরে বিয়ে করতে পারতেন।

সুতপা ঃ ওর কোন যোগ্যতা ছিল না। বড়জোর ছোটখাটো প্রাইভেট কোম্পানির কেরানি হতে পারতো।

ডাঃ সোম ঃ যোগ্যতা বলতে কি বোঝেন, পুরুষদের commodity হয়ে ওঠা।

সুতপা ঃ certainly.

ডাঃ সোম ঃ তাহলে আপনি তো তাপস ভৌমিককে বিয়ে করতে পারেন, অরিন্দমকে ছেড়ে দিয়ে। তাপসবাবু তো বিরাট পণ্য-পুরুষ।

সুতপা ঃ ভাবিনি। ভাবতে পারবো কি না জানি না।

ডাঃ সোম ভাবেন। আঁক কষেন। প্রসঙ্গ বদলান।

ডাঃ সোম ঃ আপনার নেলপলিশের রঙটা ভারি চমৎকার।

সুতপা ঃ ওটাতো মার্ক এণ্ড স্পেনসারের নেলপালিশ।

ডাঃ সোম ঃ গায়ে মুখে কি ব্যবহার করেন?

সুতপা ঃ মুখে ইয়াড্‌লের কমপ্যাক্ট ব্যবহার করি।

ডাঃ সোম ঃ এবার কিছু মামুলি প্রশ্ন করবো। আপনি কি ফুল ভালবাসেন?

সুতপা ঃ নার্সিসাস, ম্যাগনোলিয়া। নার্সিসাস ফুল আমি দেখিনি বটে, তবে ভীষণ ভালবাসি।

ডাঃ সোম ঃ আপনি কি খেতে ভালবাসেন?

সুতপা ঃ প্রণ কাটলেট। চিকেন এসপ্যারাগাস। আইসক্রিম-পিৎজা।

ডাঃ সোম ঃ শীতকালে কি পোষাক পরতে ভালবাসেন?

সুতপা ঃ প্রিমিয়ারে জিন্‌সের প্যান্ট আর পিঙ্কের পুলওভার।

ডাঃ সোম ঃ আপনি গান ভালবাসেন?

সুতপা ঃ ভালবাসি, হিন্দিগান আর ইংরেজি পপ্ ।

ডাঃ সোম ঃ আপনি তো যথার্থ সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। আপনার শরীর সম্পর্কে আপনি গর্ববোধ

করেন নিশ্চয়। অরিন্দম আপনার সুন্দর শরীরটাকে প্রশংসা করে না?

সুতপা ঃ হ্যাঁ আমার মেদবর্জিত নরম শরীরটা নিয়ে আমার অহংবোধ আছে। তবে তার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি নেই। আমি জিমে যাই তবে ডায়েট কন্ট্রোল করি না। যোগব্যায়াম করি। অরিন্দম আমার রূপে পাগল নয়। কিন্তু তাপস আমার শরীরের মোহে পাগল, বুঝতে পারি। আমার একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও আমার ভাল লাগে।

ডাঃ সোম ঃ 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ।' আপনি জানেন, এই কবিতার লাইনটি কার লেখা?

সুতপা ঃ না।

ডাঃ সোম ঃ আপনার বন্ধু-বান্ধবরা কিভাবে জানতে পারলো অরিন্দম এই লাইনটা যখন খুশি আওড়ায়? আপনি কি আপনার স্বামীর ইনসেনটি নিয়ে সবার কাছে গল্প করেন?

সুতপা ঃ আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে, তাদের স্বামী-স্ত্রী মিলে দুমাসের বা তিনমাসে ছোটোখাটো পার্টি করি। আমাদের বাড়িতেও হয়, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতেও হয়।

ডাঃ সোম ঃ পার্টিতে কি হয়?

সুতপা ঃ খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, যে যার খুশি মতো। জিন, রাম, হুইস্কি এসবও চলে। তো সেখানে অরিন্দম জিনসের বারমুড়া পরে, আমাদের বাড়িতে হলে, গায়ে হাতকাটা ঢোলা গেঞ্জি পরে মদ খায়, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে ঐ লাইনটা। আর শালা, বানচোৎ, ঢ্যামনা এসব বলে। কাকে বলে বুঝি না। আমি বারণ করি। বলি, অরু প্লিজ, রাহুল প্লিজ, তুমি নিজের ঘরে যাও। শোনে না, আমকেও বিশ্রীভাবে গালাগাল করে। তাপস মারতে যায়। আমি তাপসকে ঠেকাই। আমি কি পারি। আমিও তো টলছি। তাপস আমার কথা শোনে। কিন্তু অরিন্দম ঐ সময় আমার একটা কথাও শোনে না।

ডাঃ সোম আর কোন প্রশ্ন করেন না। প্রশ্নপর্ব শেষ করেন। মাথা নিচু করে প্যাডে আঁক কষেন, পয়েন্ট নোট করেন, কাটাকুটি করেন। দু মিনিট নীরবতা পালন করেন। ডাক্তারের ফিসের টাকাটা টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রাখে সুতপা। সে ডাঃ বিভাস সোমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ডাঃ সোম অরিন্দমকে ডেকে আনাল। অরিন্দম সুতপার পাশের চেয়ারে বসে।

কালো সরু ফ্রেমের চশমাটা মাথার উপর তোলা। কথা বলার সময় নাকের উপর নামিয়ে নেন। কখন নামাবেন সুতপা লক্ষ্য করছে। অবশেষে ডাঃ সোম চশমা নামান। সুতপার মুখে শান্ত দৃষ্টি রাখেন। তাপর ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় বলেন, 'ঠিক আছে। আপনার স্বামী নয়, আপনি আসবেন একমাস পর। আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।'

অমলের অতীত-সন্ধান

অতীন্দ্রিয় পাঠক

অমল ওর নিজস্ব চেয়ারে বসে আছে অনেকক্ষণ। ঘরের ভেতরে একা, দূরে টেবিলটা, তার ওপর কিছু বইপত্তর। ডানদিকে, বাঁদিকের দেয়ালে লম্বা র‍্যাক। সারি সারি বইগুলি, কিছু গোছানো, কিছু অগোছালো পড়ে আছে। টেবিল নিয়ে ভাবনা নেই, ওখানে কোন কাজ করবে না এখন। দুপাশের র‍্যাকগুলো মাঝে মাঝেই ওর মনে ভাবনা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কত বই কেনা হয়েছিল, তার নানা সূত্র, না আবেগ। বইগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়লে সেই সূত্রগুলো ফিরে এসে, আবেগগুলো হাল্কা ছবির মত মনের পর্দায়, আমলের ভাবনার কেমন একটা গভীর বেদনাবোধ কেনার পর থেকে তেমনই সাজানো রয়েছে র‍্যাকে। কোনোটার দু'এক পাতা, কোনোই খোলাই হয়নি। অমলের জীবন একসময় যে উচ্চতা পেয়েছিল, এখন তার ছায়া সামনের দিকে ক্রমশই হ্রস্বতর হয়ে আসছে। এতসব বই কোনোদিন কি পড়া হয় উঠবে তার? অমল জানে না।

কিন্তু কেন বসে আছে অমল, এইভাবে, এই চেয়ারের ওপর।

সকালে অপূর্ব ফোন করেছিল। ঠিক দশটায় অমল যেন বাড়িতে থাকে। কোনভাবেই ব্যস্ত না রাখে নিজেকে। ওর অনেক কথা বলার আছে, অনেক পরামর্শ করার আছে।

ফোন ধরেছিল অনিতা। অমল তখনো সকালের বেড়ানো শেষ করে ফেরে নি। ফেরার পর অনিতা খবরটা দিয়ে সতর্ক করেছে। তুমি যা দিশেহার, দশটায় আবার বেরিয়ে যেয়ো না যেন। উনি ব্যস্ত লোক, আমি বলেছি, তুমি থাকবে।

স্পষ্টত অপূর্বর কথাই বেশী ভাবছে অনিতা। ওর কাছে অমলের কাজকর্ম, নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছের গুরুত্ব নেই। এ নিয়ে অমল বিতর্কে যেতে চায় না ওর বেরনোর দরকার ছিল, অসুবিধে হলেও সেটা বাতিল করল। বাড়িতেও অনেক কাজ জমে আছে, অপূর্ব যখন আসছে, ও চলে যাবার পরই না হয় বসবে। অতএব প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। ঘড়িতে দশটা পনের, অপূর্ব কখন আসবে কে জানে।

টেবিল, দু'পাশে র‍্যাকসমেত অমলের যে নিজস্ব পৃথিবী, তাকে সামনে রেখে অমল বসে আছে। যে কোনো সময় সেখানে চলে যেতে পারে, কিন্তু পারছে না। ঈশ্বর সম্ভাব্য যে-কোনো-সময় এসে পড়াটা তাকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। এইরকম কোনো-অবস্থানে নেই অমল এক গভীর অস্বস্তিতে। মনের ওপর গভীর চাপ কমাতে অনিতাকে জিজ্ঞেস করল, অপূর্ব ঠিক কখন আসবে বলেছে? দশটা তো বেজে গেল।

কর্কশকণ্ঠ অনিতার। বাড়িতেই তো বসে আছ। অত ছটফট করার কী আছে। কলকাতার যা অবস্থা, কোথাও আটকে পড়েছেন হয়ত।

কাঁহাতক এভাবে। যাকগে, এক কাপ চা করতো।

একটু আগেই তো খেলে। অপূর্ববাবু আসুন, তখন করব।

অমল নিশ্চিন্ত হল। চা পাওয়া যাবে না। অপূর্ব কখন আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই। অতএব দেশ ও কালের অনিকেত এক অবস্থান থেকে অমল তার নিজের পৃথিবীতে দেখছে আশ্চর্য এক গ্রন্থাগার। সারি সারি আলমারি, বড় বড় র‍্যাক, গলি উপগলি দিয়ে তার হেঁটে যাওয়া। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে এই বই, ঐ বই। নতুন, পুরনো, প্রাচীন, জীর্ণপ্রায় অপূর্ব সেই বইমগুলীর ভেতরে পৃথিবীর যাবতীয় সাংস্কৃতির সম্ভার আশ্চর্য এক রহস্যময়তা নিয়ে সুপ্ত হয়ে আছে। ওদের ঠিকমত স্পর্শ করতে পারলেই কথা বলে উঠবে, থামবে না তাকে নিয়ে যাবে নিজেদের ভেতরে, পেরিয়ে যাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী, অজানা রহস্যময় নাম জানা অজানা মানুষের কাছে। তাদের চোখে আরো কত অতীত সংস্কৃতির ছায়া পড়েছে। কখনো কখনো বর্তমান ছাড়িয়ে আগামী শতাব্দীসমূহের দিকেও। এই পৃথিবীতে সময়ের মাত্রা যেন নেই, গৃহহীন এই দেশে শুধুই বিস্তার, অনন্ত বিস্তার...

এই যে শুনছ?

যেন বজ্রপতনের শব্দ। সামলে নিতে কিছুটা সময়, তারপর পেছন ফিরে অনিতাকে দেখে, যে অন্য গ্রহ থেকে। ওঃ তুমি, ভাবলাম বুঝি অপূর্ব এসেছে কাণ্ডটা দেখছ? এগারোটা বেজে গেল।

অপূর্ববাবু ফোন করেছেন। ধর গিয়ে।

আম উঠে গিয়ে ফোন ধরল। হ্যালো, অপূর্ব? কী ব্যাপার তোর? সেই থেকে বসে আছি।

বেশ দেরী করে ফেললাম, তাই তো? তোর অসুবিধের কী আছে, বাড়িতেই তো আছিস। শোন, আমার আরো একটু দেরী হবে। হঠাৎ পবিত্রবাবু এসে পড়লেন।

পবিত্রবাবু? মানে বারাসাত যে থাকে?

ঠিক ধরেছিস।

উনি এখন হঠাৎ করে!

সে অনেক কাণ্ড, গিয়ে বলব। তুই যেন আবার হুট করে বেরিয়ে যাস না। জরুরি কথা আছে।

ফোন রেখে দিয়ে অমল বলল, অপূর্ব কখন আসবে ঠিক নেই। আমার জন্যে চা কর. তো অনিতা।

অনিতা বলল, করছি। তুমি শুধু চা খাও আর ঘরে বসে থাক। অপূর্ববাবুকে দ্যাখ, সবসবয় ব্যস্ত, সামনের দিকে চোখ।

অমল আর কথা বাড়াল না।

চা খেতে খেতে অমল দেখছে, ওর সামনে সেই টেবিলটা, দুপাশে র‍্যাক। অপূর্ব-র আসা যখন অনিশ্চিত, অতএব নিজস্ব পৃথিবীর ভেতর দিয়ে আবার— অপূর্বর সঙ্গে কতদিনের বন্ধুত্ব? প্রায় চল্লিশ বছর। একই রয়ে গেলি তুই? কথার কোনো দাম নেই, অন্যের সময় নিয়ে ছিনিমিনি খেলিস আজও। অথচ তবুও তো সকলেই তোকে পছন্দ করে। তুই ম্যাজিক জানিস অপূর্ব।

পুরনো বন্ধুরা একসঙ্গে পুরী যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনে সবাই পৌঁছে গেল, অপূর্ব কই! টিকিট ও কেটেছে, ওর কাছেই সবার টিকিট। এদিকে আর মাত্র পাঁচ মিনিট, সবাই গভীর উৎকণ্ঠায়। ওকে নিয়ে

অমলের অতীত-সন্ধান

আর কোনোদিন কোনো প্রোগ্রাম নয়, সবাই বিরক্ত। অগত্যা ট্রেনের দিকেই যাচ্ছে সবাই। ট্রেন-ছাড়ার ঘন্টা পড়ে গেল, হঠাৎ ঐ তো ছুটতে ছুটতে আসছে অপূর্ব। ট্রেন ছেড়ে দিল, হাত নেড়ে বলছে, যে কোনো কামরায় উঠে পড়। ও পিছনের একটা কামরায় উঠে পড়ল।

পরের স্টেশনে সবাই নেমে, অপূর্বই খুঁজে বার করল নির্দিষ্ট কামরাটা। যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে স্বস্তি। আশ্চর্য, কারো মধ্যে আর বিরক্তি নেই, যেন অপূর্ব এসে পড়েছে এটাই যথেষ্ট। অমল তবু বলল, খুব টেনশনে রেখেছিলি আমাদের। এত দেরী হল?

টেনশন কিসের? ঠিকই আসব, কোনোদিন মিস করতে দেখেছিস? আসলে গোলমাল হল, লাইন এতটা লম্বা হবে বুঝতেই পারি নি।

সবাই অবাক বিস্ময়ে সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে। অপূর্ব-র ভ্রূক্ষেপ নেই। দাদা বলল, সামনে ইডেনে ইংলণ্ডের সঙ্গে টেস্ট। দুটো টিকিট যদি জোগাড় করতে পারিস টাকাটা আমি দেব। মনে পড়ল, হরেনের মোহনবাগানের কার্ড আছে, ক্রিকেট দ্যাখে না। কিন্তু লাইন দিতে গিয়ে দেখি বিশাল। ঠিক করলাম, লাইনে যখ ন দাঁড়িয়েছি শেষ দেখে ছাড়ব। যাক, শেষ পর্যন্ত টিকিটটা পেয়ে এই ছুটতে ছুটতে আসছি।

পুরী যাবার কথা তোর মনে থাকল না? অমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

থাকবে না কেন? টিকিট যখন কাটা হয়েছে, ও নিয়ে আর ভাবনা নেই। ওটা তখন স্মৃতি হয়ে গেছে। আমি ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে চলি।

এটা যুক্তিগ্রাহ্য কিনা, এ প্রশ্ন বাদ দিলেও, কেই ওকে এ নিয়ে কিছুই বলল না। অপূর্ব এরকমই। বিপরীতে, অমল পুরী থেকে ফেরার পর শুধুই সমুদ্রের ঢেউ, তার নানা রং, বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, দূরে দূরে ভেসে যাওয়া নৌকোগুলি, সমুদ্রে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, এমন আচ্ছন্নতার ভেতর কাটিয়ে দিল বেশ কিছুদিন। একই কথা বাড়ির লোক শুনে শুনে বিরক্ত, বন্ধুবান্ধবরাও যে কতবার শুনল তার ইয়ত্তা নেই।

পরপর কয়েকটা শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু তাতে যেন নির্দিষ্টতা ছিল না।

এবার 'শুনছ' শব্দটায় অপূর্ব-র কথা মনে পড়ল। কে, অপূর্ব?

কোন জগতে আছ? ডাকছি তখন থেকে।

ওঃ তুমি। অপূর্ব-র কী হল বল তো!

আবার ফোন করেছিলেন। আটকে পড়েছেন। তোমাকে বুঝিয়ে বলতে বললেন। বিকেলে অবশ্যই আসবেন। বারবার করে তোমাকে কিন্তু থাকতে বলেছেন। যাকগে, অনেক দেরী হয়েছে, এখন খেতে এস।

সমস্ত ঘটনার কিছুই বুঝতে পারছে না অমল। যেন অনন্তকাল অপেক্ষা করছে, করতে হবে আরো অনন্তকাল। এইরকম আচ্ছন্নের ভেতরে অনিতার ডাকে খাবার জন্য উঠে পড়ল।

খেতে বসে মহিমের কতা মনে পড়ছে। জীবনে খুবই সফল ছেলে মহিম, পড়াশোনায় কখনো দ্বিতীয় হয়নি। বিপরীতে, অমল কোনদিনই পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারেনি, তবু অন্য পড়াশোনা,

অন্য তৎপরতার জন্যে মহিম ও অন্য বন্ধুদের কাছে ওর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। বিশেষ করে মহিমের বাবা-মা-দাদা-বৌদিরা ওকে খুব সমীহ্ করতেন, ভালবাসতেন। মহিমের বাড়িতে গেলে ওরা কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়তেন না। অমল মজা করে বলত, এমন বন্দোবস্ত মন্দ কি। রোজই এখানে ভালমন্দ খাবার ব্যবস্থা থাকলে চাকরি টাকরি করার দরকার নেই। বড়বৌদি তৎক্ষণাৎ বলতেন, আমরা রাজি। তুমি ঘরজামাই হয়ে থাক, চাকরি করতে হবে না হঠাৎ-ই লক্ষ্য করত অমল, মহিমের ছোট বোন বিদিশা দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

হঠাৎ সম্বিত ফিরলে দেখল, অনিতা চুপচাপ বসে ওর দিকে চেয়ে আছে। ভ্রূ কুঁচকে অনিতা বলল, কী হয়েছে তোমার বল তো? ডাল তরকারী মেখে একাকার করছ খাওয়াই শুরু করলে না। মিটিমিটি হাসছ বসে বসে, ব্যাপারটা কী?

অমল নিরুত্তাপ শান্ত গলায় বলল, জানো অনিতা, অতীত আমার অগৌরবের ছিল না। আজ না হয় থমকে গেছি, একটা সময় ছিল যখন অনেকে আমায় অনুসরণ করত। অপূর্ব-র জন্যে আজ সারাদিন অপেক্ষা করছি। অথচ ও একসময় আমার কথা শোনার জন্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকত। যাক্‌গে আফশোস নেই আমার।

অনিতা বিরক্ত হয়ে বলল, আফশোস করার দরকার কি। ভবিষ্যৎকে যারা অন্ধকারে রাখে, তাদের আমি অন্ধই বলি।

অমল হেসে বলল, তা যাই বল, আমাদের প্রত্যেকেরই সম্বল এই অতীত। বর্তমান প্রতি মুহূর্তে অতীত হয়ে যাচ্ছে, আর ভবিষৎ তো শুধুই কল্পনা।

অনিতা আরো বিরক্ত হল। বেশ তো, অতীতের ভেতরেই বসে থাকো গিয়ে।

খাওয়া শেষ করে অমল তার ঘরে ফিরে এল। সামনে টেবিল, দুপাশে বইয়ের র‍্যাক, সেই পৃথিবী সামনে রেখে অর্পূব-র জন্যে অনন্ত অপেক্ষায় বসে থাকা।

বসে থাকতে থাকতে আমলের পৃথিবীটা হয়ে উঠল কলেজের কমনরুম। প্রশস্ত, দীর্ঘ ঘরটার এককোণে অমলকে ঘিরে মহিম, সুধাংশু, অমলেশ, মহীতোষ, অপূর্বরা। ওদের মধ্যে অপূর্বই ছটফট করছে, অন্যেরা মন দিয়ে শুনছে অমলের ব্যাখাগুলি। কিভাবে হেগেলের দর্পণ থেকে মার্কস সরে এল, কোথায় কোথায় ওদের মূল পার্থক্য। কিভাবে মার্কস তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তি দিয়ে নস্যাৎ করেছিল। সমাজতন্ত্রকে কী চোখে দেখেছিল নীৎসে, তার যুক্তির কোথায় জোর।

অপূর্ব অধৈর্য হয়ে পড়ছে। ফিজিক্সের ক্লাশটা সুরু হয়ে গেছে। চল চল।

মহিম ওকে থামিয়ে বলল, ওসব ফিজিক্স টিজিক্স ছাড়। আমরা এখন অনেক ওপরে হাঁটছি।

মহীতোষ এর মধ্যেও হিসেবী। বলল, কমল ক্লাশে আছে, ওর কাছ থেকে নোট পেয়ে যাব। এখন যা হচ্ছে তার নোট কোথাও পাবি না। অমল চালিয়ে যা।

উৎসাহিত অমল এগিয়ে চলেছে। বেদান্ত এল, সোপেন হাওয়ারের ওপর উপনিষদের প্রভাব, মার্কসের তত্ত্ব বিষয়ে ক্রোচের মন্তব্য। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে। ব্যাখা করে চলেছে অমল, বেদান্তের নৈতিকতার সঙ্গে ইওরোপীয় নৈতিকতার কোথায় পার্থক্য। জরাথুষ্ট্রও এসে পড়েছে।

অমলের অতীত-সন্ধান

অপূর্ব আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এসব তো পরেও হতে পারে। তোরা তাহলে থাক, আমি চললাম। অপূর্ব চলে গেলে অমলেশ বলল, বাঁচা গেছে। হ্যাঁ বল, জরাথুস্ত্র মানে তো অগ্নির উপাসক। অগ্নির উপাসক তো ভারতীয় ঋষিরাও ছিলেন। এটা বোঝা দরকার, একই সূত্র থেকে কিভাবে ভারতীয় দর্শন বদলে গেল। বলতে পারিস বিপরীতমুখী হল। জরথুস্ত্রে যে দর্শন, তার কাছে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম অনেকটাই ভিন্ন।

সুধাংশু কি বলতে যাচ্ছিল, অমলের কাঁধে কে যেন ধাক্কা দিয়েছে। চমকে উঠে দেখল অনিতা পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম? কিছু করার নেই, অপূর্ববাবু আবার ফোন করেছেন, তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চান।

অমল উঠে গিয়ে ফোন ধরল। অমল বলছি, কি খবর বল।

এ্যাই শোন, আই এম সরি। তোর সারাটা দিন নষ্ট করলাম।

ঠিক আছে নষ্ট তো হয়েই গেছে, এখন আমাকে আর কী করতে হবে বল।

আর একটু অপেক্ষা করা ছাড়া তোকে কিছু করতে হবে না। আমি তো বাড়ি যাচ্ছিই, যে করে হোক। কিন্তু আর একটু দেরী হবে। যা খবর চমকে যাবি, প্লীজ বীয়ার উইথ মী।

পবিত্রবাবু এখনো আছেন বুঝি?

না না, সে তো কখন চলে গেছে। এখন একটা নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে পড়েছি, তোর সাহায্য চাই, পরামর্শ চাই, ন'টার মধ্যে তোর বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি।

কিন্তু কী তোর দরকার, সেটাই বলছিস না, বুঝতেও পারছি না। বললি জরুরি, তারপর পবিত্রবাবু কেন এলেন, এখন আবার নতুন প্রোজক্ট।

ধীরে বন্ধু ধীরে। কতগুলি বিষয়, কিছু ভাবনা, গুছিয়ে নিতে হবে। আর মাত্র ঘন্টা চারেক, একটু ধৈর্য ধর বৎস।

তোর সঙ্গে কথা বলা মানে—। এত রহস্যের কী আছে। অমল বুঝল, অপূর্ব ফোনটা রেখে দিয়েছে।

অনিতা ফোনের কাছেই ছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, এত জেরা কর কেন। উনি তো আসছেন, সামনাসামনি কথা বল। দ্যাখ উনি কী বলতে চান।

অমলকে প্যান্ট শার্ট পরতে দেখে অনিতা জিজ্ঞেস করল, বেরোচ্ছ নাকি? উনি যে আসবেন বললেন।

অমল হাসল। উনি তো সবসময় আসছেন। এলে বসতে বলবে, চা খেতে দিও। সারাদিন বসে আছি, ঘন্টাখানেক হেঁটে আসি। অপূর্ব রাত ন'টার আগে আসছে না। এই রাস্তায় হাঁটতে বেশ লাগে। নিরিবিলি। হাঁটতে হাঁটতে অমলের অন্য পৃথিবী হয়ে যায়। তখন আর এই রাস্তা থাকে না। দিল্লী বা মুম্বাই চলে যাওয়া যায়। নিউ জার্সি বা লণ্ডনও যাওয়া যায়। নিউ জার্সিতে মহীতোষ, লণ্ডনে সুধাংশু থাকে যেমন দিল্লীতে অমলেশ থাকে, মুম্বাইতে মহিম আছে এখন। এই রাস্তায় চলতে চলতে পৃথিবীটা

একাকার হয়ে, কী যেন বলে, গ্লোবালাইজেসন, নাকি গ্লোবাল ভিলেজ, কোনো ইন্টারনেট কম্যুনিকেশনের দরকার নেই। মুখোমুখি ওদের সঙ্গে কথা চালাচালি হয়। মহীতোষ বলে, জানিস কি কাণ্ড হয়েছিল? এখানে ইন্টেলেকচুয়ালদের এক আসরে আমাকে যখন কিছু বলতে বলল, তোর বলা কথাগুলি থেকে বেমালুম আউড়ে গেলাম। সবাই কুপোকাৎ। মাত করে দিয়েছি একেবারে। তুই সত্যি জিনিয়াস, নিজেকে একদম প্রকাশ করলি না। বছর কুড়ি আগের মহীতোষের চিঠিটা হুবহু সামনে ভেসে উঠেছে। অমলেশের অবাক বিস্ময়, এখানে বাঙ্গালীদের এক সাহিত্যসভায় একজন আবৃত্তিকার তোর 'একদিন আমি' কবিতাটা আবৃত্তি করছে দেখে আমি তো থ। এক গুজরাটি ভদ্রলোকে, বাংলা জানেন, ওর ভাল লেগেছে তাই কপি করে নিয়ে গেলেন অনুবাদ করবেন বলে, ওখানে চুপচাপ বসে আছিস তুই, আর এখানে কী ঘটছে দ্যাখ। বছর পনের আগে দিল্লী থেকে টেলিফোনে বলা অমলেশের কথাগুলি হুবহু শুনছে অমল রাস্তায় যেতে যেতে। ঐ তো লণ্ডন থেকে সুধাংশু, মুম্বাই থেকে মহিম আসছে। চল, বসন্ত কেবিনে সেই পুরনো আড্ডাটা জমাই গিয়ে। এখনো আড্ডা চলে?

না রে, গেলে কেমন অচেনা মনে হয়। একদিন গিয়েছিলাম, খেয়েই উঠে পড়তে হল, ওদের এত তাড়া।

তাহলে চল কফিহাউসে যাই।

কফি হাউসের দিকে এগোতে এগোতে, আরে! চৌরাস্তার মোড়ে কখন এসে পড়ল! কফিহাউস কোথায়! ওটা তো জীবন বীমার অফিস। ঘড়িতে চোখ পড়তে, সাড়ে সাতটা! কতদূরে চলে এসেছে অমল বাড়ি ফিরতে এখন হেঁটে অন্তত এক ঘন্টা। অপূর্ব যদি আগেই এসে পড়ে? অমল বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ি ফিরে, নাঃ, অপূর্ব আসেনি। অনিতাকে জিজ্ঞেস করল, অপূর্ব ফোন করেছিল?

না তো।

অপূর্ব এল সাড়ে ন'টার পর। আসবে না ধরে নিয়ে ওরা রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে। এল তারপর।

অপূর্ব এসেই বলল, খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে তো? আমার জন্যে কিচ্ছু নেই? এটাই চেয়েছিলাম। ম্যাডাম, আমার জন্যে চা বসান।

অনিতা হেসে বলল, খাবেন যদি বলুন, অসুবিধে হবে না।

না না, মজা করলাম। চা খাব শুধু।

এরপরই অপূর্ব ব্যস্ত হয়ে, শোন অমল, বেশীক্ষণ বসব না। রাত অনেক হয়েছে। আসার আগে কাজের কথাটা সেরে নি।

অমল মনোযোগী হল। অনিতা এরই মধ্যে চা হাতে ঢুকে পড়েছে। ওকে দেখে, অপূর্ব আরো উৎসাহিত। ম্যাডাম, আপনিও বসুন, আপনার মতামত দরকার হবে। সোফার এককোণে অনিতা গুছিয়ে বসেছে। অপূর্ব গম্ভীর গলায় সুরু করল। তুই তো জানিস অমল, আমি বসে থাকার লোক নই। এগোতেই হবে আমাকে। 'রিটায়ার করার পর বসে থেকে, ভাবনাচিন্তায় অসুস্থ হবার চেয়ে কিছু একটা

করতে হবে, আগেই ঠিক করেছিলাম। করতে হবে এমন কিছু যা অবশ্যই লাভজনক, তোর মত বিনি পয়সায় ছাত্র পড়ানো জ্ঞান বিতরণ নয়। বেশ কিছুদিন ধরে তক্কে তক্কে ছিলাম। বারাসতে কয়েক একরের একটা জমি বিক্রী হবে খবর ছিল। পবিত্রবাবু সেইজন্য এসেছিলেন। ওর সঙ্গে দেখতে যাব ঠিকও করলাম, কিন্তু দাম একটু বেশী। গেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম।

অমল বলল, আমাকে আবার এর মধ্যে কেন?

বসে বসে গায়ে মরচে পড়ছে, ঘুরে এলে ক্ষতি কি?

অনিতা বলল, ঠিক বলেছেন, ঘর থেকে বার করুন তো ওকে।

বার করার ব্যবস্থা করতেই তো এসেছি। আপনি ভাববেন না। অমল তবু নিস্পৃহ থেকে বলল, তুই যে সকালে বললি, জরুরি কথা আছে, এই সেই কথা নাকি?

সকালে? ও হ্যাঁ, না, এই কথা নয়, অন্য ব্যাপার। এখন সেটা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তবু আগে সেটাই শুনি। তোর কোন কথার জন্যে সারাদিন বসে থাকতে হলে আমাকে।

অপূর্ব হতাশ হয়ে, উঃ তুই আগের মতই রয়ে গেছিস। শোন তাহলে। আমার শ্যালকের ছোট একটা ফ্যাক্‌টরি আছে। একজন ম্যানেজার চায়। বেশী মাইনে দিতে পারবে না অবশ্য, তবু বসে থাকার চেয়ে কিছু রোজগার ভাল, শরীর মন ভাল থাকবে। তোর সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য শুনে ওর খুব উৎসাহ, তাই তোকে ফোন করেছিলাম। যাক সে কথা। আসল ঘটনায় আসি। পবিত্রবাবু থাকতে থাকতেই খবর পেলাম, ঝাড়গ্রামে বেশ একটা জমি কম দামে পাওয়া যাবে। পবিত্রবাবুকে ভাঙ্গলাম না, বললাম, পরে যোগাযোগ করছি। অলকেন্দু বিকেলে কথা বলতে আসবে বলল, তাই তোকে ফোন করে জানালাম। কী কথা হল, জমি তোর পছন্দ? অমল জিজ্ঞেস করল।

অলকেন্দুর কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, ঠিক আছে। তবু একবার নিজের চোখে দেখতে হবে, জমির কাগজপত্রও দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, কাল সকালেই ঝাড়গ্রামে যাচ্ছি, তুই ও চল, নিজের চোখে দেখে নিবি।

অমল অবাক, আমি দেখে কী করব?

সে কিরে! এত কথা বলছি কেন? তুই-তো আমার পার্টনার হবি। ঠিকঠাক সব চললে চাষবাস, মাছের পুকুর, নানারকম ফল, তুই বুঝতে পারছিস না, মাসে মাসে কত রিটার্ন আসবে। সব দেখে শুনে নিই, পাক্কা হিসেব তোকে দেখিয়ে দেব। আমার সব ছকে রাখা আছে, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, শুধু ফিফটি পার্সেন্ট ইনভেস্ট করবি জমি, ইন ফ্রাস্ট্রাকচার ইত্যাদি নিয়ে লাখ সাতেক আর নিয়মিত খরচের জন্য দু লাখ। তুই সাড়ে চার, আমি সাড়ে চার।

শুনতে শুনতে অমল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু অনিতা বেশ উদ্দীপ্ত। বেশ হবে কিন্তু, ওখানে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকব আমরা।

অপূর্ব উৎসাহিত হয়ে বলল, অবশ্যই। তাহলে কাল আমরা যাচ্ছি অমল। ম্যাডাম আপনিও যেতে পারেন, নিজের চোখে দেখবেন।

অমল শান্ত গলায় বলল, আমি যাচ্ছি না। কারণ টাকা আমি ইনভেস্ট করব না। তুই কি করে

ভাবলি অপূর্ব, এই বয়েসে যথাসর্বস্ব দিয়ে ফাট্‌কা খেলব।

ফাট্‌কা কোথায়। জমিতে টাকা রাখা ব্যাঙ্কে রাখার চেয়ে কম ঝুঁকির, একথা একটা বোকা লোকও জানে।

অমল তবু নির্বিকার। তা হতে পারে কিন্তু আমাকে তো প্রোজেক্‌টে পাচ্ছিস না। খুব বেশী দূরে এখন আমার দৃষ্টি যায় না।

অনিতার চোখেও সমর্থনের কোন ভাষা নেই দেখে অপূর্ব হতাশকণ্ঠে বলল, তাহলে যেমন আছ তেমনই থাকো। আমি চলি। অলকেন্দুর সঙ্গে ঝাড়গ্রাম সেক্ষেত্রে একাই যাচ্ছি। লগ্নি করার জন্যে লোকের অভাব হবে না।

অনিতা বলল, ঐ যে বলছিলেন একটা ফ্যাকট্‌রি-ম্যানেজারের চাকরি। সেটা দেখুন না যদি হয়। বসে বসে ওতো আরো বুড়িয়ে যাচ্ছে।

অপূর্ব কৌতুক করে বলল, ওতো বলল বেশ আছে। তবু আপনি যখন বলছেন, শ্যালককে না হয় বলব।

অমল হাসল। আমি কিন্তু বলছি না অপূর্ব।

অপূর্ব এবার গভীর বিস্মিত। কোনো কথা না বলে, কাউকে সম্ভাষণ না করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনিতাও নিশ্চল দাঁড়িয়ে, অপূর্বর প্রতি কোনো সম্ভাষণ নেই। এই পরিস্থিতিতে অমল নির্বিকার বসে থেকে, ওর সামনে নিজস্ব পৃথিবী।

অতীত ভবিষ্যতের মাঝখানে বর্তমান সময় কিনারাটা অমল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। যা অতিক্রম করে অপূর্ব এইমাত্র চলে গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনিতা, তার স্ত্রী, বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে। সেখানে থেকে অমল পেছন ফিরে চলল তার অতীত স্মৃতিময়তার ভেতরে যা ধূসর হয়ে আছে, যেখানে অনেক আবিষ্কার এখনো বাকি, অনেক সৃষ্টিকর্ম অপেক্ষায় আছে, নিজের সত্তাকেও উদ্ধার করা বাকি।

আত্মজীবনী

মনোজ চাকলাদার

পৌরুষকে লুঠ করে নিয়ে গেল বা বলা যেতে পারে পৌরুষ হারালাম। একটি পরিবারে কোন পুরুষ নেই ভাবতে বেশ কষ্ট হয়। আমিও যে পুরুষ নই একথা ভাবতে যেমন কষ্ট হয়, আবার নিজের ওপর রাগও হয়।

আমাদের পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হই। পৈতৃক বাড়ি বা ভিটে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অজস্র স্মৃতি। স্মৃতি বিক্রি হয়ে গেল। বলা যায় আমাদের ইতিহাস অস্বীকার করা হল। শিকড় কেটে দেওয়া হল।

বাড়ি বিক্রি করে আমাদের লাভ হয়নি। ভেতরে সঞ্চারিত হতে থাকে কষ্ট। হারিয়ে গেল, কি চলে গেল সব সময় বুক জুড়ে এক শূন্যতা।

বাড়ির যে চোখ থাকে, তার যে নীরব চোখ থাকে তা বিক্রি করে অনুভব করি। পাশ দিয়ে গেলে মনে হয় কী অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রয়েছে, যেন হরিণ দৃষ্টি। আমরা এখন যে বাড়িতে থাকি সেখানে আসতে গেলে ও বাড়ির পাশ দিয়ে আসতে হয়। ও বাড়ির পাশ দিয়ে যখন আসতাম তখন ওদিকে তাকালাম না। এতে মনে হত আরো বেশি আর্তনাদ শুনতে পেতাম।

আমাদের বাড়িটা ভাঙা শুরু হয়। বাড়ি ভাঙা হচ্ছে না তো আমাদের স্মৃতি ভাঙা হচ্ছে। আমাদের ইতিহাস ভাঙা হচ্ছে। স্মৃতিদের আর্তনাদ নাকি সবাই শুনতে পায়। আমি অবশ্য শুনতাম না। কিন্তু কোথায় যেন এক রিক্ততা অনুভব করতাম। শিকড় ছেঁড়ার ব্যাথা অনুভব করতাম।

বাড়ি ভাঙার সময় একেক জনের একেক দিন তদারকির দায়িত্ব ছিল। শর্ত অনুযায়ী কথা ছিল বাড়ি ভাঙার সময় আমাদের কেউ না কেউ থাকবে কারণ কোন পারিবারিক ঐতিহাসিক কোন বস্তু বা দ্রব্য থাকলে সেগুলো আমাদের। কেবলমাত্র বিল্ডিং মেটেরিয়ালগুলোই ক্রেতারা নেবে।

বাড়ি ভাঙার সময় কাকা নাকি কেঁদে ফেলেছিলেন। আমার ছোটভাই অজ্ঞান হয়েছিল। স্টাডিরুম ভাঙার সময় দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। সেদিন আমার ছুটির দিন।

স্টাডিরুমের বইপত্তর আগেই নেওয়া হয়েছিল, সকল আসবাবপত্তরও। কিছু দেয়াল আলমারি ভাঙা বাকি ছিল। এইসব আলমারিতে মূলত দুর্লভ বই রাখা ছিল, ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনী। কখনো তাঁরা নিজে লিখতেন, কখনো বা কোন ঐতিহাসিকরা লিখতেন, কখনো বা কোন ভাড়া করা লিপিকরদের কাছে জীবনী বলা হত, তাঁরা লিখে দিতেন। সব যে ছাপা হত তা নয়। কেউ কেউ সে লেখা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রেখে দিতেন। এইসব জীবনী কখনোই তার জীবৎকালে পড়া হত না।

আলমারির ভেতরেও যে আলমারি আছে তা কখনো লক্ষ্য করিনি। সত্যি কথা কি এইসব আত্মজীবনীর প্রতি কখনো আমার কৌতূহল ছিল না। আলমারির ভেতরে যে আলমারি রয়েছে তার জন্য কৌতুহলী যেমন হই আবার ব্যথিতও কম হই না। কবে এসব হয়েছে আমার জানা নেই। এছাড়া

বরাবরই অনুসন্ধিৎসা ব্যাপারটা আমার কম। যেসব মজুরেরা ভাঙছিল তারা বিস্মিত যেমন হচ্ছিল আবার দুঃখিত হয়ে উঠছিল। তারা বলছিল, এসব আজকাল মিস্ত্রিরা করতে পারবে না। এসব নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। দেখি বইয়ের রাশি আর পাড়ুলিপি। বইগুলো গুছিয়ে রাখতে বলি, পাড়ুলিপিগুলোতে যাতে ধুলো বা জল না লাগে সেভাবে যত্ন করে রাখতে বলি। আলমারিটি যেন গোপন সিন্দুক। খুবই স্বাভাবিক, মজুরেরা কখনো দাপুটে লোক ছাড়া কখনো কথা শোনে না। এসময় সহানুভূতি ও মানবিকতা শব্দ দুটি অভিধানেই থাকে মাত্র। এছাড়া এসব জিনিস ওদের কাছে মূল্যহীন। ওদের ভাঙার মধ্যে অদ্ভুত এক তৃপ্তি। কোন মোহর বা সোনা গয়না আছে কিনা মজুরেরা সেই সাবধানতা অবলম্বন করছে, গোপন চাহনি দিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য রাখছে। আমি নিশ্চিত ওটা সেজন্য করা হয়নি, করা হয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষদের আত্মজীবনী রক্ষা করা জন্য। ভাবি নিজের জীবনকে গোপনীয় করে রাখার এ প্রবনতা কেন। এখানে কি ভীরুতা প্রকাশ পায় না। কার আমলে এবং কার মাথা থেকে এ উদ্ভট ভাবনা এসেছিল কে জানে। এ এক গবেষণার ব্যাপার, বলা যায় একদিক থেকে দেখলে এ এক মজার ব্যাপার। ভাবি একবার পড়ে দেখলে হয় এসব আত্মজীবনী।

মজুরেরা আলমারি ভাঙছে, ওদিক নজর না দিয়ে আত্মজীবনীগুলো দেখতে থাকি। হাত এক অলৌকিক ভীতি অনুভব করে। বাবা গয়ার পূর্ব পুরুষদের পিণ্ডি দিতে গিয়েছিলেন, এসে বলেছিলেন, যখন পিন্ডি দিচ্ছি মনে হয়েছিল আমার পূর্ব পুরুষেরা কাতর বুভুক্ষুর মত ছুটে আসছে। সকলেই যেন ঠেলাঠেলি করে পিন্ডি নেবার জন্য পাগল। হু হু করে প্রেতাত্মারা চলে আসে। তারা দুরন্ত ক্ষুধার্ত। আমাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে খাদে ফেলে দেবে। কাপড় উড়ে যাচ্ছে ফরফর করে। পুরোহিত আমাকে ধরে রাখতে পারছে না। পুরেহিত বলে, একটু ধৈর্য ধরো বাবাগণ! বাবা বলেছিলেন আসলে কি ফাঁকা জায়গা তার ওপর ঐরকম টিলা। সারাক্ষণই হু হু করে বাতাস। ভেতরে ভেতরে আমিও দুর্বল। মনে হয়েছিল সকলে ছুটে এসেছেন। তবে যাই ভাবি না কেন পিন্ডি দেবার পর অন্তরে এক প্রশান্তি অনুভব করি। কুলকুল করে আমার শরীরে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস বয়ে চলেছে। রক্তের ভেতর রেখে দিয়েছে ওদের স্বপ্ন। আমি নাস্তিক হলেও কেমন যেন মনে হতে থাকে সুখী অসুখী পূর্ব পুরুষেরা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভাবি কতদিনে পড়ব এসব, আর সাংরক্ষণ বা করব কি করে। সামর্থ্যও নেই আর সরকারই বা নেবে কেন আমাদের মত মানুষদের আত্মজীবনী। এই সব ভাবতে ভাবতে পান্ডুলিপি গুলো দেখছি, দেখছি ওদের হস্তাক্ষর। হঠাৎই দেখি আমার হস্তাক্ষর। আমারই হাতের লেখা। কি করে এল। দেখি আমারই নাম। বিস্মিত হই। আমার লেখা এখানে আসার কথা নয়। এছাড়া আমার আত্মজীবনী লেখা দূরে থাকুক। কোন বিষয়ে আমি এ পর্যন্ত কিছু লিখিনি। পাতার পর পাতা উল্টে যাই। আমারই হাতের লেখা। সব পাতাতেই। এ লেখা পড়লে আমার মা-বাবা, ভাই বোন, কাকা, কাকিমা, জ্যাঠামশাই জ্যেঠিমা, জ্যেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা কি ভাববে? আমি বেশি চালাক। আমি লিখে এখানে রেখে দিয়েছি। আমি যে লিখিনি একথা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। পাতার পর পাতা উল্টে যাই। ভেতরে অজানা ভীতি তৈরি হয়, বোধহয় অলৌকিক আতঙ্ক। তালপাতার পুঁথিতে আমার হস্তাক্ষর দেখে ভাবি কিভাবেই বা আসে। আমি কখনো তালপাতায় লিখিনি। পুজোর পর বিসর্জনের পর গুরুজনদের

প্রণাম করে কলাপাতায় দূর্গা, লক্ষী সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের নাম পাঁচবার লিখে পুকুরে ভাসিয়ে দিয়ে এসে পড়তে বসতাম। এ রকমই রীতি ছিল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় দেখি ন'শ দশ। ন'শ দশে যে আমি জন্মাইনি এ নিশ্চয় বিশ্বাস করানো যাবে। কিন্তু সবাই যদি মনে করে আমি মিথ্যাচার করেছি! এই মিথ্যাচারে আমার কি লাভ! এই তালপাতার পুঁথি, ধুলোবালি মাখা এই লেখা। আমাকে লুকিয়ে রেখে কি লাভ! আর আমার আত্মজীবনী তো আমার মৃত্যুর পরেই পড়বে। আদৌ কেউ পড়বে কিনা কে জানে। যেমন আমি আজ পর্যন্ত কারোর জীবনী পড়িনি। আচ্ছা এসব আত্মজীবনী পড়ে কি লাভ! অবশেষে বংশ তালিকায় দেখি আমার নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন। এ অবশ্য বিস্ময়কর নয়। এ থাকতেই পারে। রাজবংশ দেখলে দেখতে পাই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। বংশ তালিকাটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকি।

লক্ষ্য করার ব্যাপার, বংশ তালিকায় কোন কন্যার নাম নেই। এদের কি কোন মেয়ে সন্তান হয়নি। নাকি রাখেনি। মনে হয় লেখক এ ব্যাপার গুরুত্ব দেয়নি। দায়সারা ভাবে করে গেছেন। [কৌলিকের জীবনীতে অবশ্য বংশতালিকাটি দীর্ঘ এবং সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রয়েছে। মনে হয় কৌলিকের জীবনী কোন পেশাদারী লেখক লিখে থাকবেন। যদিও অন্যদিকে মন নেব না। শুধুমাত্র আমার কৌতুহল যে জীবনীটিতে তার কথা লিখছি। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা ভাল লেখাটি বাংলা ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হল। কারণ পাঠকদের মনে হবে এটি এক বিজাতীয় ভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদরীতি মানা হল]

❑ আমার ঠাকুমা পঞ্জিকা দেখতে পারতেন। তবে ঠাকুমাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্মের বহু আগে ভেদবমিতে মারা যান। তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। গাঁয়ে তাঁকে সরস্বতী নামে ডাকত। যদিও তাঁর নাম ছিল বসন্তদেবী। এসব শুনেছি আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

❑ পুজোতে খুব আনন্দ করব ভাবতাম। কিন্তু পুজোর সপ্তাহ দুয়েক আগে কোন না কোন ভাবে পায়ে চোট পেতাম। পুজোর আগের দিন যন্ত্রণায় কাতরাতাম। মা সারারাত জেগে গরম জল করে সেঁক দিতেন— একেবারে আমার মত। তবে কি পুজো তার উল্লেখ নেই।

❑ আমি চারটে বছর ফাউ পেয়ে গেছি। ভেবেছিলাম পঁয়তাল্লিশ বছরে আমি যদি সফল না হই তবে আর বাঁচব না। আত্মাহুতি দেব। দিব্যি উনপঞ্চাশ বছরেও বেঁচে আছি, অথচ সাফল্য আমার এক বিন্দুও নেই! কি জঘন্য আমার জীবন! অকারণ কেন এ বেঁচে থাকা!

❑ বেঁটে খাটো মানুষ আমি। আমার বংশ কৌলিন্য ও শিক্ষা রয়েছে একথা আত্মীয় পরিজনেরা যেন মনে করত না। নানা রকম বিয়ের সম্বন্ধ তারা আনত। মেয়ের বাবাকে এমন স্বপ্ন দেখাত যে সে বললে আমি রাজি হয়ে যাব। তবে মেয়ের যে হিল্লে করে দেব, তা তুমি ছেলেরও একটা ভালো রকম হিল্লে করে দেবে তো? তারা নাকি ঘাড় কাত করে দ্রুত রাজি হয়ে যেত। তারা চুপিসারে ঠাকুরদার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেত। সে চলে গেলে ঠাকুরদা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, মেয়েটি কালো বটে কিন্তু খুব গুণী। গৃহকর্মে নিপুণা। মুখশ্রী সুন্দর নয় বটে কিন্তু ব্যবহারে সুমধুর। লক্ষ্মীশ্রী। মেয়ের বাবা তোমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে দেবে। তাঁকে কোন উত্তর দিতাম না। খুব পীড়াপিড়ি করলে উত্তর দিতাম, যেমন ভাল বোঝেন। এতেই তিনি মনে করে নিতেন আমার সম্মতি রয়েছে। তিনি তোড়জোড় শুরু করে দিতেন।

একবার আমার এক দুর সম্পর্কের পিসিমা এলেন। দক্ষিণ দেশে তাঁর বাস। কলিঙ্গ তার নাম। এসে বললেন, বুঝলেন মামার মেয়েটি সুশ্রী নয় বটে তবে খুবই সুলক্ষণা। মেয়েটি জন্মাবার পরই বাবার খুবই যশ বেড়ে যায়। অর্থ সম্পদ উপচে পড়ে। বর্তমানে রাজার সঙ্গে দহরম মহরম। বিয়ের সময় রাজা উপস্থিত থাকবেন।

কাকা সরাসরি আমাকে বললেন, দেখ মেয়ে কালো, কানেও একটু কালা আছে, তবে সাদা সিধে সরল। মেয়ের বাবা একজন সঙ্গীতজ্ঞ বলে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। রাজার বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান হলে অবশ্যই তিনি গায়ক হিসেবে আমন্ত্রণ পান। রাজার কোষাগারে তোমার কোন না কোন কাজ জুটিয়ে দেবেন তিনি।

পিসিমা বার বার বলতে থাকলেন, রাজা বিবাহ বাসরে উপস্থিত থাকবেন।

আমার পিসিমা থাকতেন কটকে, বাবার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন, আমাকে ব্যাংকে চাকরি করে দেবেন। বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপতি। মেয়ের বাবাও ছিলেন গায়ক, শান্তিনিকেতনের ছাত্র।

আর একবার আমার মামা চিঠি লিখলেন, তোমার মা গত হইয়াছে, কবে ভগবান লইয়া যাইবেন তাহার ঠিক নাই। বহুদিন তোমাকে দেখি না। তোমার মুখমন্ডলও আমার স্মরণে আসে না। এই বয়সে গিয়া দেখিব তাহাও সম্ভব নহে, তুমি যদি একবার আসিয়া দেখা করিয়া যাও তবে অতি আনন্দ পাইব।

মামার বাড়ি উপস্থিত হতেই এক ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। এসেছে। বহু কথার পর মামা বলেন, দেব তোমার জন্য পাত্রী ঠিক করিয়াছি, বৈকালে পাত্রীটিকে দেখিয়া আইস।

বলি, দেখুন আমি তো এখন বিয়ে করব না —

আমি কথা দিয়াছি, আমাকে ভালমন্দ যাহা বল, আমার সম্মান রাখিবার ভার তোমার উপর—

এ ঠিক নয় মামা --

মামা নাছোড়বান্দা। অবশেষে আমাকে পাত্রী দেখতে যেতে হল শত অনিচ্ছায়। পাত্রীর মা অতি সুন্দরী। তাঁর হাসিতে যেন জ্যোৎস্না মাখা। কিন্তু তাঁর মেয়ে এত অসুন্দরী হয় কি করে! মেয়েটি যেন অপরাধী। তার মা আমাকে বলেন, বাবা কথা দিয়ে যাও আমাকে যেন অন্য পাত্রের সন্ধান না করতে হয়। আমার মেয়েকে বিয়ে করলে সুখী হবে এ আমি নিশ্চিত। মেয়েকে তো আমি জানি --

বেরিয়ে এসে মামার নিষ্ঠুরতায় আমি অখুশি হই। আমার চোখে আজো মেয়েটির করুন মুখটি ভাসে। আমিও ভাবি আমার এই পূর্বপুরুষটি যে মেয়েটি দেখে এসেছিলেন সেও কি আমার দেখা মেয়েটির মত।

আমার পরিবারের জমিজমা বেশ থাকলেও চাষবাসের আয়ের ওপর র্নিভরশীল ছিল না। সকলেই ছিল চাকুরিজীবী। হয়তো চাষবাস ও জমিজমা নিয়ে থাকলে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারে কোন অসুবিধে হত না। যেহেতু আমরা শিক্ষায়, নানা প্রশাসনিক কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখতাম। আমার বাবা অস্ত্রাগারের হিসাব রক্ষক। আমিও যে এধরনের রাষ্ট্রকৃত্যক হিসেবে জীবিকা চালাব এটাই স্বাভাবিক ছিল। জীবিকার জন্য বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করি কিন্তু কোথাও কিছু হয় না। রাজা অতি বিলাসী থাকার দরুণ সর্বত্রই এক অরাজকতা চলছিল। সর্বত্রই নিজের আত্মীয় - পরিজনকে কাজে নিযুক্ত করতে ও বহু উৎকোচ দেওয়া নেওয়ার চল ছিল বলে আমি এসব প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ ছিলাম।

একবার রাজকোষের হিসাবরক্ষক হিসেবে পরীক্ষা দিলাম। যা পরীক্ষায় জানতে চেয়েছিল তা ঠিক ঠিক উত্তর দিলাম। একজন কোতায়ালের পুত্রকে সেকাজে নিযুক্ত করেছিল।

এক সময় ভেবেছিলাম অন্য রাজার অধীনে চাকুরীর চেষ্টা করব। বাবা বললেন, রাজা এতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন, সমগ্র রাগ আমাদের পরিবারের ওপর আসতে পারে।

বৈশ্যবৃত্তি আমাদের পরিবারের যোগ্যকাজ ছিল না। অগত্যা আমাদের নগরের কিছু বালকের শিক্ষার ভার নিতে ইচ্ছে প্রকাশ করি। এতে পন্ডিত সমাজ ক্ষুব্ধ হয়। আমাকে বাড়িতে বসে বসে বিনা কাজে অন্ন গিলতে হয়। এতে নিজের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে ও নিজের ওপর ধিক্কার জন্মায়। খাওয়া পরার কোন অসুবিধে হয়না বটে কিন্তু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না এবং মনের আনন্দ ক্রমশ শেষ হয়ে যায়। পৌরুষে বাধে। মানসিক ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হই। স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হই।

ভেবেছিলাম পুস্তপাল বা উপরিক বা বিষয়াধিকরণ জীবিকা হিসেবে নেব। কিন্তু সেখানেও এক সংকীর্ণ নীতি। বৈশ্বানর নামে এক ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করে দেবে বলে রাজি হয়েছিল। কিন্তু সে এত অর্থ চায় যা আমি বাড়ির কাউকে বলতে সাহস পাই না। সত্যি কথা কি এত সম্পদ বিনিময় করে কাউকে রাজি করাতে পারব বলে মনে হয়নি। আমার জীবিকা ঠিক করাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলাম।

আমার যখন পঞ্চাশ বছর সে সময় উপলব্ধি করি জগতের কোন কিছুই আমাকে আর্কষণ করে না। কোন আকর্ষণ নেই। এ এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা। কোথাও আর মায়া অনুভব রইল না।

বয়স তের হবে। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুমটা কেন ভেঙেছিল কে জানে। এবয়সে ঘুমটা ভাঙার কথা নয়। একটি পুরুষ কণ্ঠ বলছে। এদিকে। শুধু মাত্র নিঃশ্বাসের অন্তর কমছে! পুরুষ কণ্ঠ বলে, মাখনের মত। আরো ঘনীভূত হচ্ছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। জ্বর আসছে. আমার জ্বর আসছে, জড়িয়ে ধরো। মৃদু শব্দ আঃ। নিস্তব্ধ। সে সময় বুঝিনি। আজ বুঝি। আজো শুনতে পাই। সুখী দম্পতি। আমার মা ও বাবা। তারা সুখী ছিল। সুখী দম্পতির সন্তান আমি। সত্যি কি! কে জানে!

অর্থের সঙ্গে কেন যেন মনে হয় অসততা ও নিষ্ঠুরতার যোগসূত্র রয়েছে। মানবিক পুরুষের সঙ্গে অর্থের বিরোধ রয়েছে। বুদ্ধি ও বিদ্যা এর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই প্রতিকূল।

ঘোরতর নিষ্ঠুরতা এর মিত্র। আমি যে অর্থ আয় করতে পারিনি এটাই কারণ। যারা অর্থ আয় করে তাদের তুলনায় আমার বোধবুদ্ধি কম রয়েছে তা নয়। একটা তফাৎ গড়ে দেয় তা হল নিষ্ঠুরতা, এবং নিলর্জ্জ হওয়ার প্রয়োজন হয়। শিরা উপশিরায় কিসের সে বাঁধন বুঝতে পারি না। আমার সামনে দুটো পথ খোলা-এক মানবিক সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা, দুই নিষ্ঠুরতা সহ ঘৃণিত জীব হিসেবে বেঁচেথাকা। প্রথমটি বেছে নিই। আমি প্রকৃতি দর্শন শিল্পকলা পাঠ নিয়ে বাঁচার পথটি বেছে নিলাম। এতে ইন্দ্রিয় সকল সুখ থেকে বঞ্চিত হল।

এখানেই তাঁর আত্মজীবনীটি শেষ। এরপর তিনি আরো পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিভাবে বেঁচে ছিলেন তার আপাতত কোন হদিশ নেই। ওর আত্মজীবনী যে বয়সে শেষ হয়েছে সেটি আমার বর্তমান বয়স।

বাড়ির স্টাডি রুমটি ভাঙা চলছে। ভাবি আমার জীবনও কি শেষ হল। কি করা থাকতে পারে। ভাবি আত্মজীবনীগুলো পুড়িয়ে দিলে কেমন হয়। এসব জীবনীর কি ই বা মূল্য আছে।

লেখাগুলো পুড়িয়ে অপরাধের দায়ভাগ আমি নিলাম না। আমার একটা কাজ কমে গেল তা হল পঁচিশ বছর আগে কোন এক ব্যক্তি আমারই জীবনী লিখে রেখে গিয়েছেন। আমার আর অতিরিক্ত একটি লাইনও যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র আমার নাম সাক্ষর করে আজকের তারিখটি লিখে রাখলাম।

ধুলো মেঘ হয়

অমর মিত্র

খবর সব খবর উড়নোর উস্তাদ জাফরের কাছে। পীরতলার যত গুপ্ত খবর জাফরই বয়ে আনে। তার সঙ্গে কে পারবে? 'অথৈ খবর' নামে যে পাক্ষিক খবরের কাগজ খুলেছে পীরতলার মহাজনেরা তারও সে খবর পায় না, সেই খবর আছে জাফরের কাছে। আবার 'আসল খবর' নামে যে পাক্ষিক সংবাদপত্র রয়েছে বহুজনের, তারাও হেরে যায় জাফরের কাছে। জাফর খবর উড়ালে তবে না তারা ধরতে পারে :

ক. পীরথানে গিয়ে মরা বাচ্চা জিন্দা হয়ে গেছে।

খ. যুবতী নারীর যৌবন আচমকা উধাও হয়ে সে বুড়ি থুত্থুড়ি।

গ. আনখা জায়গায় কবর খুঁড়ে চলে গেছে কে বা কারা যেন।

ঘ. ধর্ষণ করতে গিয়ে পুরুষাঙ্গ খুইয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করতে চলে গেছে কোন ব্যক্তি।

জাফর হলো ভ্যান রিকশাওয়ালা, কিন্তু তার রিকশাটি গেল বোশেখমাসে বামুনপুকুর হাইরোডে দুমড়ে গিয়েছিল লাভলি সাবান কেনা বেচার হাঙ্গামায়। থাক ওসব পুরনো কাসুন্দি। খবরের কাগজে যেমন পুরনো খবরের দাম নেই, ওড়িশার জঙ্গলে পাদরি পোড়ানোর খবর এখন ছাপলে কেউ চেয়েও দেখবেনা, তেমনি পুরনো খবর কে শোনে, কেই বা বলে? জাফরের কাছে খবর সব সময় তাজা, হাতে গরম, সে বলে, শুনো চাচা :

গোপ্ত খবর, হাতে গরম
মেয়ে মানুষের লজ্জাসরম
নাইরে নাইরে নাইরে ভাই,
বায়োস্কোপে চলল বিবি
মাথায় তাহার ঘোমটা নাই।

হ্যাঁ, পীরতলার যত খবর, সব বায়োস্কোপের পথেই। সিনেমা দেখতে আসা মানুষ টানতে টানতেই না জাফর খবর জোগাড় করে। আর সব রিকশাওয়ালারা বলে জাফরের কান যেন রেডিওর যন্ত্র, বেতারে না বলা কথাও ধরে ফেলে। স্বামী-স্ত্রীতে যত ফিসফাস থেকে, জোয়ান, জোয়ানিতে যত কানাকানি হোক পর্দার আড়ালে, জাফর শুনতে পাবেই। এমনই তার শ্রবনশক্তি যে ঘুমের ঘোরেও

জাগন্ত পৃথিবীর কথা শুনতে পায়, রাতের শিশির পড়ার শব্দও নাকি। এখন তার ভ্যান রিকশা নেই, গদি রিকশা চালায়। এরটা ওরটা ধারে নেয়, মালিক দিনে তিরিশ টাকা, বাকিটা তার।

ভ্যান নেই তবু ভ্যানওয়ালা জাফরই খবর এনেছে খালপাড় ধরে ছ'মাইল পূবে কদমগাছির মাঠে ঝড়ে পড়ে যাওয়া শিকড় উপড়ে, শুকিয়ে মরে পড়ে থাকা একটা বেলগাছ নাকি আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ডালে ডালে কচিপাতা, কচি বেলও নাকি দেখা দিয়েছে পাতার আড়ালে। এ যেন আট-এ শূন্য আশি বছরের বুড়ির আট বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়া। কচি মুখ, কচি দেহ, কচি কচি মন!

খবর বড় জবর। এ যেন মরা মানুষ জিন্দা হয়ে ওঠার মতো খবর। কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের মাটি ঝাড়ছে বছর খানেক আগের মড়া। বেলগাছ, বামুন গাছ, মরে ক্রমশ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এমনই ছিল কথা, কেননা ও গাছের কাঠে যজ্ঞব্যতীত আর কোনো কাজই যে হয়না। কদমগাছিতে বড় বামুন নেই, তাই যজ্ঞ নেই, তাই গাছটা পড়েই ছিল মাঠের ভিতরে, উঠে দাঁড়িয়েছে পৈতেধারী বামুনের মতো। শোন চাচা, শোন :

বেঘোরে পরাণ এল মরা বেল গাছে,
এমন গোপ্ত খবর বাতাসেতে ভাসে।
কদমগাছি, হাঁচি কাশি, ছিল বৃক্ষবেল,
কাঁটাভরা, ঘুণধরা, দেখাইছে খেল।
কচিপাতা, ত্রিপত্র, শাখায় ফুটিল,
ভূমিশয্যা ছেড়ে বৃক্ষ একপায়ে উঠিল।
সেই গাছ, পুণ্য গাছ, মহাতীর্থ হলো,
সকলে দুই হাত তুলি হরি হরি বলো।

শোন চাচা, এটাই হলো আসল খবর। কদমগাছিতে কেউ দা-কুড়ুল ছোঁয়ায়নি মরাগাছে, সবাই যেন জানত ওগাছ বেউলোর সোয়ামি লখিন্দারের মতো বেঁচে উঠবে। বামুন গাছ তো, তাই মোছলমানও হাত দেয়নি, আবার কদমগাছির নমঃশুদুর হিদুঁও হাত দেয়নি, সবাই বলতেছে তারা যেন জানত গাছ বাবা বেঁচে উঠবেন।

জাফর উরু চাপর মেরে বলল, পীরতলায় যেমন মরা বাচ্চা জ্যান্ত হয়, তেমনি কদমগাছিতে গাছ হলো।

জাফর তার গদি রিকশা টানতে টানতে জিজ্ঞেস করে, জানা আছে কদমগাছি?

হি হি করে হাসে রিকশার যাত্রী সাদা জুতো, সাদা প্যান্ট, সাদা শার্টের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কালোমানিক জোয়ান, আর তার পাশের জোয়ানি, বলল, আমড়াগাছি জানা আছে।

না, না হাসির কথা লয়, কদমগাছি গে বেলগাছ ভগবানের কাছে মানত করো, বে তুমাদের হবেই।

গাছ ভগবান কী ভাই? সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করে সুন্দরী।

জাফর তখন তার শোনাকথা বর্ণনা করে দ্বিগুণ চড়িয়ে। হাত তুলে বোঝাতে থাকে :

পীরতলা পুণ্য স্থান, হেথায় এমন হয়,

পূর্বদিকেতে ছ'মাইল, গাছ ভগবান রয়।

কথা ওড়ে এইভাবে। এক মুখ থেকে অন্য মুখে চলে যায়। পীরতলার সিনেমা হলে, ভি.ডি.ও. হলে প্রত্যেকদিনই তো প্রায় নতুন মজা, এক জায়গায় যদি হয় 'সতীর দেবতা পতি', তো অন্য জায়গায় 'ভালবাসার মরণ নাই'। আর রাতের শোতে তো ইংরেজি আধা নীল আধা গরম ছবি আছেই। তারা সব বাস স্ট্যান্ড থেকে রিকশায় আসে সিনেমাতলা, রিকশায় সিনেমাতলায় আসতে আসতেই খবর পায় নতুন নতুন। সিনেমার মজার চেয়েও এ মজা কম কিছু নয়।

জাফরকে ধরেছে আর রিকশাওয়ালা বুড়ো সুলেমান, সত্যি কী হয়েছে বল দেখি জাফর, গাঁজা ছড়াসনে।

পীরতলার পীরবাবা বহুশত বৎসরের প্রাচীন কাহিনীময়। এসেছিলেন দূর আরবদেশ থেকে গাছের উপর চেপে, সেই গাছ পীরতলায় নেমে হয়ে গেল ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চেপে, পীরবাবা অনাথ আতুরের সেবা করতে লাগলেন। তখন নদী বিদ্যাধরীর যৌবন ছিল, নদী মরেনি। কী ছিল তার ঢেউ, কী ছিল তার গর্জন! পীর সয়েব মোয়াজ্জেম শাহ্ সেই নদী শাসন করলেন। নদী মুখ লুকিয়ে মাটির নীচে চলে গেল। যতদিন পীর সায়েব ততদিন আর মুখ তুলবেনা খরস্রোতা বিদ্যাধরী। ভাসাবেনা দুই কূল। পীর সায়েব আছেন এখনো। তাঁর মাজার হয়েছে পীরথান, তিনি রাতে ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ান পীরতলা, বিজয়গঞ্জ, শানপুকুর, পাকাপোল থেকে চন্দনেশ্বর, কপাট হাট। ঘুমের ঘোরে কে শোনেনি তাঁর আরবি ঘোড়ার খুরের শব্দ?

জাফর বলে, গাছবাবার কাছে পীরবাবা নস্যি!

চুপ কর, কী হয়েছে বল।

গাছবাবা শুধু হিঁদুর, মোছলমানকে হিঁদুর মতো কপালে সিঁদুর দিয়ে মাথা ঠেকাতে হবে গাছ পানে।

বুড়ো সুলেমান বলে, পীরবাবা তো হিঁদুর যেমন মোছলমানেরও।

জাফর হাসে, এবার থেকে পীরতলার নাম গাছতলা হয়ে যাবে চাচা, তাই শুনে পাগলা দুলাল বলে অন্য কথা।

পাগলা দুলাল? জাফরের মুখে যত আবোল তাবোল ছড়া শোন, সবই পাগলা দুলালের। সে হলো পীরতলার কবিয়াল, আট বছর আগে অঘ্রাণ মাসে অযোধ্যা গেল শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে মাথা ঠেকাতে। মাথা তুলে দ্যাখে কপালটা ঠেকে ছিল মিলিটারি বুটে। অযোধ্যা থেকে ফিরতে ফিরতেই মাথা খারাপ হলো দুলালের, ফিরেছিলই বা কতদিন বাদে! দিকহারা হয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে দাঙ্গার আগুন থেকে বেঁচে বেঁচে যখন পীরতলা পৌঁছলো, ধুম পাগল। তারপর কতদিন লাগল একটু শান্ত হতে। দুলালের কথা জাফরের মুখে শোনা যায় :

পূবে যাও, পচ্চিমে যাও, তরবারি ঘোরে
ত্রিশূল দিয়া সাধু মনুষ্য বধ করে।
ফুল অলা, ধূপ অলা কাঁদিয়া পালায়
অযোধ্যায় রক্ত বহে, হায় হায় হায়।
ওই দ্যাখো সাধুবাবা, হাতে মেসিনগান
সরযূ নদীর জলে করিয়া সিনান
পায়ে বুট, শিরে টোপি, কোমরে কৌপিন,
হাসিয়া হাসিয়া তিনি চিবান নমকিন।

তো জাফর এখন বলে গাছ বাবার কথা। একথা যেমন পাগলা কবিয়াল দুলালের, তেমনি তারও। একদিন শো টাইমে বামুন পুকুর হাইরোডে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকছিল জাফর, তখন মাখন মাখন সাদা গা, সাদা হাতির মত একটা লোক তার রিকশায় এসে উঠল।

কতদিন আগের কথা এডা? জিজ্ঞেস করে সুলেমান রিকশাওয়ালা।

বেশিদিন না, আবার কমদিনও না, শোন চাচা, তার কথা শোন,
কপালে সিঁদুর লেপা, ঠোঁটেতে হাসি
দুচোখ ঢলো ঢলো, চলো কদমগাছি,
কাঁহা হায় গাছ ভগোয়ান, কহো রিকশাওয়ালা,
সাচ বাত কহো দেখি, হাম আগরওয়ালা।

তারপর কী হলো?

জাফর বলে, তিনি রিকশায় বসে পকেট থেকে একটা টিভির ক্যাডবেরি বের করে চুষতে লাগল, রিকশার পর্দা ফেলা থাকল, আমি নিয়ে গেলাম কদমগাছি, খিরিশতলায় পৌঁছে দেখি রিকশা থেকে

নামল এক সাধুবাবা, তার হাতেও ক্যাডবেরি।

সাধু!

হ্যাঁ সাধু, পুরা গেরুয়া, কপালে তো সিঁদুর ছেলই, হাতে তিরিশূল, জয় গাছ ভগোয়ান বলে তিনি নামল।

আশ্চর্য!

ছিল বেওসায়ী, হয়ে গেল সাধু।

বেওসায়ী?

হ্যাঁ, আমারে রিকশায় উঠেই তো বলল বড়বাজারে তার ঝাড়াইমশলার ব্যবসা, অযোধ্যায় নকুলদানার পাইকিরি কারবার, কদমগাছিতে নকুলদানা সাপ্লাই করবে প্যাকেটে ভরে।

বড় অবাক কথা!

অবাক কথাই তো বটে।

তুই চোখে দেখেছিস এডা?

এবার চুপ করে থাকল জাফর। এই যে আগে বলল, তার রিকশায় উঠেছিল সাদা হাতি, এখন বলছে রিকশাটা তার নয়, অন্য কার, দেখেছেও সে নয়, আর একজন, তবে কথাটা তার শোনা।

বুড়ো সুলেমান বলল, এডা কি পাগলা দুলালের কথা?

গানডা পাগলা দুলালের। বলল জাফর হাসতে হাসতে,

মাখন মাখন সাদা হাতি, কপালে সিঁদুর।

নামিল যেই দেখি, রূপটি সাধুর।

সাধুতে সাধুতে ভরে যাচ্ছে কদমগাছি। সাধুরা যাচ্ছে সব পীরতলা দিয়ে। গেরুয়া বসন সব, গেরুয়া প্যান্ট, গেরুয়া গেঞ্জি, গেরুয়া ফেট্টি --- চলেছে সব কদমগাছি। রিকশায়, পায়ে হেঁটে গাছ ভগবানের গোড়ায় জল ঢালতে। যত সাধু ততো বেওসায়ী মহাজন। মহাজন ডাক দিচ্ছে, চলো কদমগাছি, এসেছে শ্রাবণ মাস, শ্রাবণে যেমন তারকেশ্বরে শিবের মাতায় জল ঢালো তেমনি জল ঢালো গাছ ভগবানের গোড়ায়। এসো কদমগাছি, বেলগাছের গোড়ায় দুধ ঢালো, জল ঢালো, দুধে পুণ্য বেশি, জলে পুণ্য কম।

দুই

বুড়ো সুলেমান রিকশাওয়ালা ধরল পাগলা দুলালকে, বলল, এসব তুমি রটাও?

দুলাল বলে, হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না, গাছবাবা পার করাও, দেখছনা গেরুয়া। স্রোত নেমেছে

কদমগাছির পথে, অযোধ্যায় সেবার এমনই হয়েছিল।

বুড়ো আনমনা হয়, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় মসজিদ ভাঙা পড়ল তা সে জানেনা, কিন্তু সেবার খুব হাঙ্গামা হয়েছিল এধারেও। আর তরতাজা ছেলে দুলাল কেমন হয়ে ফিরে এল। এই যে এখন দুলাল বসে আছে খালপাড়ের পুরনো মেহগিনি গাছের গোড়ায়, একা একা, চুপচাপ, আকাশে তাকিয়ে কী দেখছিল কে জানে।

সুলেমান জিজ্ঞেস করে, কথাটা কি সত্যি?

কী?

ছিল মানুষ হয়ে গেল সাধু?

দুলাল বলে, বড় ভাবনা হয় চাচা, ভাবনা হয়, পীরবাবা নিয়ে ছিনু ভাল, এখন গাছবাবা বলে তিনি বামুন ঠাকুর।

সুলেমান জিজ্ঞেস করে, মরা বেল গাছটা কোথায় ছিল?

মাঠের ভিতর, সেখেনে ধানজমিন, গিয়ে দেখে এস।

গাছটা মরে পড়েছিল, না পড়ে মরেছিল দুলাল?

ভীষণ ঝড়ের কথা মনে নেই?

কোন ঝড়?

দুলাল বিড়বিড় করে, পুবে যাও, পচ্চিমে যাও, তরবারি ঘোরে

ত্রিশূল দিয়া সাধু মনুষ্য বধ করে ....

সুলেমান বলে, শুনেচি, শুনেচি, ও কথা কহেনা দুলাল।

দুলাল বলে, ওই ঝড়েই পড়েছিল হয়ত, ঝড়ে কত ঘর পুড়ল, মানুষ মরল, হিন্দুর কোলে মোছলমান মরল, মোছলমানের কোলে হিন্দু মরল, কত নারী সব হারালো, কত ধুলো উড়ল, কত আগুন জ্বলল, সরযূ নদীর জল লাল হয়ে গেল, ওই ঝড়েই হয়ত পড়েছিল বেল গাছ, পড়ে মরে গিয়েছিল।

সুলেমান বলে, তোমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে দুলাল।

দুলাল মাথা নাড়ে। কিছুই গোলায় নি, সব স্পষ্ট মনে আছে তার, বলে, অঘ্রাণ মাস যেন বোশেখ মাস হয়ে গেল চাচা, ঝড় এল আগুন হয়ে। আগুনের রঙ আর গেরুয়া বসন এক হয়ে গেল। আবার কোনো দেশে আগুনের রঙ আর মাটির রঙ এক হয়ে গেল। আগুনের রঙের সঙ্গে কোথাও রক্তের রঙও মিলে গেল। ঝড় এল আগুন হয়ে। ঝড়ের ঠাকুর এল রথে চেপে। রথের চাকা যেখান দিয়ে ঘুরল সেখানে ঝড় উঠল ভীষণ! রাম রাম করতে করতে ঝড় এল। সে যে কী হলো তখন!

মানুষ ওড়ে, বৃক্ষ ওড়ে, ভাঙে পাখির ডানা,
নদী মরে, সাগর মরে, মরে খোঁড়া কানা।
কদমগাছি, নেই আছি, ছিল বৃক্ষ এক,
পড়িয়াছে, মরিয়াছে প্রাণ ভরিয়া দ্যাখ।
বেলগাছ বামুন গাছ অক্ষয় অমর,
সেই গাছ হইল দ্যাখো। প্রাণের ভ্রমর।
মহাবৃক্ষের মরণ নাই, জীবিত হইল,
সাধু সন্ত যত আছে সেখানে জুটিল।
অক্ষয় বিল্বতলে ওঠে নতুন ঝড়,
যে কেহ মরিতে পারে, নাহি আপন পর।

শুনতে শুনতে বুড়ো মুগ্ধ হয়। অভিভূত হয়। আহা কী সুন্দর বলছে দুলাল। এর চেয়ে বড় কবি কে আছে পীরতলায়?

দুলাল বলতে থাকে, সাবধান বিধর্মীসব, যতেক রিকশাওয়ালা,
বৃক্ষ দেবতার সহিত না করিয়ো দেয়ালা।

বুড়ো সুলেমান বলে, না না দেয়ালা করব কেন, পীরবাবা যেমন ইনিও তেমন হবেন, গাছের কি ধম্মো আছে বাবা!

দুলাল মাথা দোলায়, হ্যাঁ কি না ধরা যায়না।

বুড়ো জিজ্ঞেস করে, দেওতা দেখে এয়েচ বাপ দুলাল?

যেতে কি হয় চাচা, খালপাড়ে বসে সব জানা যায়।

তার মানে?

ওই যে বাঁক কাঁধে হাঁটছে ছেলে বুড়ো, গেরুয়া জামা কাপড়, এতে বুঝা যায় সে ভগবান কতবড়!

বুড়ো ফিরে আসে থানা গোড়ায়, বকুলতলায়। তার রিকশা নিয়ে খেপ খাটতে গিয়েছিল জাফর, সেই জাফর এখন রিকশা নিয়ে থানা গোড়ায় মিশেছে। বুড়ো ডাকে জাফরকে, এই জাফরা ওঠ দেখি।

কী হলে চাচা?

গাছ যে ভগবান হয়েছে, এ কথাডা কে পেথম ভাসালো বাজারে?

মাথা নাড়ে জাফর, এখন আর তা বের করা যাবেনা। সে নিজেই কতজনের কাছে কথাটা শুনে কতজনকে বলেছে। মরা বাচ্চা জিন্দা হবার কথা যদি রটে যায়, তো মরাগাছ জিন্দা হবার কথা রটতে দোষ কী? আর মরা গাছ কি জিন্দা হয়না,ইটের নীচে চাপা ঘাস ইট তুললে আস্তে আস্তে কি আবার রঙ ফিরে পায়না।

সত্যি কি এমন হয়েচে?

নাহলি লোকে যায় কেন?

জাফর তুই সাবধান, থানার নজর আছে তোর উপর।

আমি তো রটাইনি চাচা।

রিকশায় উঠল সাদা হাতি, হয়ে গেল সাধ্, এটা কে বলেচে?

জাফর বলল, কে বলেচে কেউ জানে না চাচা, সবাই বলচে সে দেকেচে, আমিও তাই বলি। সুলেমান বলল,খুব সাবধান জাফর, আমার ভয় ভয় করতেছে।

তিন

চলিতেছে শ্রাবণ মাস, ধারা বর্ষা নাই,
অবারিত আকাশতলে মেঘচ্ছায়া নাই!
শ্রাবণ আগুন হলো, মাঠ পুড়ে যায়,
সু সময়ে অসময়, হায় হায় হায়!

থানার মেজবাবু বললেন, এ কেমন কান্ড, গাছ ভগবান হলো, আকাশের মেঘ গেল।

পীরতলার মহাজন এক, বর্ণে গন্ধে উচ্চ যিনি, টাকায় জমিতে আরো উচ্চ, তিনি হেসে বলেন, সবই ভগবানের খেলা।

মেজবাবু বললেন, তদন্তে যেতে হবে।

চমকে ওঠেন মহাজন, কিসের তদন্ত স্যার?

বেলগাছ তো বেলগাছ, তার আশপাশের যত জমি সব নাকি ঘিরে নিচ্ছে বেলগাছের সেবাইত সাধুরা?

মহাজন মায়াময় হাসেন, এমন সে হাসি যে দেখলে বুক জুড়ায়, বুক হিমও হয়। মহাজন ধীরে ধীরে বলেন, সাধুরা আসছেন সব অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, দ্বারকা, সোমনাথ, হরিদ্বার, কনখল, হিমালয় থেকে, জমিজমা বিষয় সম্পত্তি এসবে তাঁদের কোনো লক্ষ্য নেই, তাঁরা সর্বত্যাগী, রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সাধু হয়েছেন, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, পোখরান থেকে কার্গিল সর্বত্র তাঁদের বিচরণ, তুচ্ছ কদমগাছির জমি তারা নেবেন কেন?

জমির চাষারা পিটিশন দিয়েছে।

তারা সব নমঃশূদ্র আর যবন। মহাজন পকেট থেকে মোবাইল বের করেন পিঁ পিঁ আওয়াজ শুনে। নেড়ে চেড়ে দেখে মোবাইল অফ করে বললেন, শুনুন মশায়, গাছটা মরে পড়েছিল তা বছর কয়েক তো হবেই, নির্জন মাঠ, ওদিকে কেউ যেত না তেমন, বেলগাছ বলে বেঁচেও গিয়েছিল গাছটা, নাকি আসলে ভগবান বলেই ওঁর গায়ে হাত পড়েনি, তো সেই গাছ দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, গিয়ে দেখি সত্যি, স্বপ্নে তা জানতে পেরে চলে এসেছিন কনখলের মহারাজ?

আপনি তাঁকে ডেকে আনলেন?

না, না, তিনিই তো এসে খবর দিলেন আমাকে।

খুব ফর্সা মানুষ তিনি?

আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

মস্ত দেহ, মোটাসোটা?

অযোধ্যার নকুলদানার কারবার?

মহাজনের মোবাইল বেজে উঠল। দৈববাণী। মহাজন একহাতে কানে দিলেন যন্ত্রটা, অন্য হাতে পকেটে হাত দিলেন। মোবাইলে হাঁ, হুঁ, দেখিয়ে জি, হাঁ জি, বোলিয়ে জি করতে করতে পকেট থেকে গোটাকয় পাঁচশোটাকায় নোট বের করলেন, কথা বলতে টেবিলে রাখলেন, অস্ফুট গলায় বললেন, প্রণামী! তারপরেই বলতে লাগলেন, হাঁ জি, বহুৎ প্রণামী কালেকশন হো রহা হায়, ম্যায় পোলিস স্টিশন পর হায় --

মোবাইল বন্ধ হলো। টেবিলে টাকা নেই। মেজবাবু বললেন, সবই তো হলো, লেকিন পাবলিক পিটিশনটা ফেলনা নয়।

সে আপনি দেখবেন, ভগবান তো পাবলিকেরও।

মহাজন গেলেন। একা গেলেন না। যত সময় তিনি মেজ দারোগার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তত সময় থানার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল দুইজন। তাদের গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, সোনার চেইনে গাছ ভগবানের ছবি, কোমরে ঠাসা বারুদ। তারা বলল, জয় বাবা গাছ ভগবান, বিল্বদেবের জয়।

সকলকে নিয়ে মহাজন গেলেন। মেজ দারোগা গেলেন ক'দিন বাদে। কালক্ষেপ করে শেষে

গেলেন। বহু জনের ক্ষোভ হচ্ছিল কদমগাছিতে। থানাতেও তারা আবার এসেছিল দরখাস্ত নিয়ে। মহাজন এবং সাধুরা বৃক্ষদেবতাকে ঘিরে তিরিশ বিঘে চাষ জমি ঘিরে নিয়েছে। আরো ঘিরবে বলছে। সবই দেবতার অভিলাষ। চাষের জমিতে মেলা বসে গেছ এই শ্রাবণ মাসে। চাষবাস হবেনা, গাছ ভগবানের পুজো হবে? শ্রাবণে যদি মেলা এভাবে বসে যায় বছর বছর, তবে তো জমি গেল। মারুতি, টাটা সুমো, হুনডাই চেপে সাধুরা আসছেন। মোটর সাইকেলে চেপেও আসছেন সর্বত্যাগীরা।

হায়! বৃষ্টি নেই শ্রাবণ মাসে
শুকনো ভুঁয়ে নৌকা ভাসে ।

চাষ বন্ধ। সিনেমাতলার লোকও টেনে নিচ্ছেন বিল্বদেবতা। গাছ ছুঁয়ে দেখতে পঞ্চাশ টাকা, গাছের গোড়ায় জল ঢালতে তিরিশ টাকা, দুধ ঢালতে বিশ টাকা। গাছ ভগবানের মাহাত্ম্যলীলা ১১.৭৫। তাতে কী লেখা আছে? দেবতা কেমন করিয়া হইল, দেবতায় কাহার কী হইল, ইত্যাদি।

কদমগাছি, নেই আছি, জনে জনে যায়
সিনেমাতলায় বসি হিরো মাছিটি তাড়ায়।
লোক নাই জন নাই হিরোয়িন কাঁদে
প্রেমের সমাপ্তি হলো মহাজনী ফাঁদে।
কাঁদে হিরো, হিরোয়িন, কাঁদে লাইটম্যান
এমত জগতে তাই যেন গাছ ভগবান।

দারোগাবাবু থানার গোড়া থেকে যে রিকশায় চাপলেন তার পাইলট জাফর। জাফরকে ভালমত চেনেন তিনি। জাফর কেন পীরতলা-কদমগাছির যত রিকশাওয়ালা, সকলকে। পীরতলায় যে এত গুজব ওড়ে, তার মূলে যে রিকশাওয়ালারা, তার ভিতরে জাফরই হল এক নম্বর। জাফর যদি কথাগুলো রটিয়ে না দিয়ে তাঁকে এসে বলত, কত কেসের সুরাহা হ তো, কত জুয়াচোর ধরা পড়ত, গাছ ভগবানের মত খালপাড়ে বাজপড়া তালগাছও জিন্দা হয়ে যেত।

যেতে যেতে দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এসব তোর কাজ জাফর?

হুঁজুব, ছার।

তুই রটিয়েছিস?

কী হুঁজুর?

মারব পেটে এক লাথি, মরাগাছ বেঁচে উঠেছে, এটা রটাল কে?

জানি না ছার।

মহাজন তোকে টাকা দিয়েছিল?

না, ছার।

বল দেখি মরাগাছ জ্যান্ত হতে পারে?

ঠাকুর গাছ হুজুর, বামন গাছ।

দারোগাবাবু চুপ করে যান আচমকা। তিনিও তো টাকা খেয়েছেন মহাজনের। তাঁকে সাবধানে তো কথা তো বলতে হবে। কিন্তু কখনও কখনও উর্দির মেজাজ এমন এসে ভর করে ---- মাথার গোলমাল হয়ে যায়। টাকায় কি মানুষ কিনে নেওয়া যায়। তদন্ত তো হবেই।

কদমগাছি খিরিশতলায় নেমে দারোগাবাবু দেখলেন মানুষ যাচ্ছে। বুড়ো, আধবুড়ো, জোয়ান, আধাজোয়ান, যুবতী, আধাযুবতী, কিশোর, কিশোরী, গাঁয়ের বধূ, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, কাকা, জেঠা, পিসে সবাই চলেছে খিরিশতলা থেকে বেলতলায়। এ পথটা হেঁটেই যেতে হবে।

দারোগাবাবু দেখলেন কত গাড়ি। ঝাঁ চকচকে, নতুন মডেলের। গাড়ি থেকে নেমে নারী পুরুষ নগ্নপদে হেঁটে চলেছে ভগবান গাছের দিকে। লোকে হাঁক মারছে, জয়বাবু বিল্বনাথ।

জয় জয় বিল্বনাথ, বাবা বেলতলা
বিল্বয় থাকে কেন ল-এ ব ফলা?
গো মাংস খায় কেন, কেন রামপাখি?
পড়ে পেলে চোদ্দ আনা, তাহা নেব নাকি?
জয় বাবা বেলতলা, পক্ক বিল্ব ফল।
কাহার উপমা হলো, বন্ধু ভেবে বল।
জোড়া বেল, ভরা কলস, যায় কার সঙ্গে?
বিদেশী পীর ঠাকুর, থাকে কেন বঙ্গে?
জয় বাবা বিল্বস্থ, রণে, বনে স্মরি,
মারুতি হইতে নামে ডানাকাটা পরী।
শুক বলে সারী শুনো বেলতলা যাই,
কোন গাছে বিল্ব ফলে, বলো দেখি ভাই।

বেলতলা গিয়ে মেজ দারোগা ভগবান দর্শন করলেন। আষাঢ়ের বৃষ্টিতে সে গাছে যে পাতা

এসেছিল এখন তা পরিপূর্ণ। সুপত্র, ত্রিপত্র, সবুজপত্রে গাছখানি ঢাকা। মেঘহীন শ্রাবণের তৃষিত হাওয়ায় গাছের পাতারা কাঁপছে। গোড়াটি বাঁধানো, জল ঢালছে লোক দশহাত দূরের একটি গর্তে। তারপর নালি দিয়ে সেই জল গাছের বাঁধানো গোড়া ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে খালের দিকে। দুধও পড়ছে কলসি কলসি, ঘটি ঘটি। একশো লোক দন্ডী কাটছে তো আরো একশো লোক বুক চাপড়াচ্ছে। একশো লোকে বুক চাপড়ায় তো আরো একশো লোক মাটিতে মাথা ঠোকে। যত লোক মাথা ঠোকে, তার চেয়ে বেশি লোক দুহাত তুলে নাচে। তাদের গেরুয়া বসনে শেষ বেলার গেরুয়া আলো পড়ে। মেলা বসে গেছে প্রায়। আশপাশের সব ধানজমি ঘিরে সাধুরা বসে গেছে ধুনি জ্বালিয়ে। শ্রাবণ ভাদ্র এমনি চলবে নাকি। একটা উপর বোর্ড বসে গেছে, 'সাইট ফর ভগবান আবাসন'। চাষ জমি সব চলে গেছে ভগবানের জিম্মায়।

দারোগাবাবু ঠান্ডা পানি খেয়ে আঠাশ রকম নরকের ছবি কিনে তা জাফর রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে তদন্ত আরম্ভ করলেন।

দারোগা : গাছ কবে মরেছিল?

জনৈক চাষা : জানা নেই, সাধুরা জানে।

দারোগা : তোমরা কি জানো?

চাষা : আমরা জানি কিছু।

দারোগা : ঝড়ে গাছ পড়েনি?

চাষা : কেন পড়বেনা, শানপুকুরে বড় মেহগিনি পড়ে গেল।

দারোগা : এই বেল গাছ?

চাষা : গাছ না ভগবান?

দারোগা ? কে বলেছে?

চাষা : সাধুরা।

দারোগা : তোমরা কী বলো?

চাষা : চাষ হলোনি, জমি ঘিরে সাধুরা বসে গেছে।

দারোগা : ভগবানের জন্য ছেড়ে দাও জমি।

চাষা : না খেয়ে মরবো।

দারোগা : মরবিনা, বিশ্বনাথ বাঁচাবে, রণে-বনে-জঙ্গলে তাঁহারে স্মরণ করিয়ো।

চাষা : হুঁজুর শাওন মাস, বিষ্টি নাই, মোদের জমিন দখল হয়ে গেল, সাধু বসে গেল, দোকান বসিয়ে দিল মহাজন।

দারোগা : বাবা বিশ্বনাথের মহিমা! বল গাছটা মরেছিল কবে?

চাষা : জানিনা।

দারোগা : খুব জানিস, বল কবে মরে গেল গাছ?

চাষা : আজ্ঞে মরে নাই।

মেজ দারোগা চমকে উঠলেন, মরে নাই মানে?

----- জিন্দাই তো ছিল, কিন্তু মাটিতে পড়ে গিয়ে মড়ার মতো হয়েছিল না গাছ ভগবান না দারোগাবাবু, গাছ মাটিতে পড়ে ছিল না।

----- ঝড়ে পড়ে যায়নি শিকড় উপড়ে?

----- না হুঁজুর, এদিকে তেমন ঝড় হয়নি।

মেজবাবুর বিশ্বাস হয়না। বিশ্বাস হলেও তা বিশ্বাস করেন না তিনি। তাঁর বিশ্বাস মহাজনের পক্ষে। তিনি ভাবছিলেন চাষা, নমঃশূদ্র, মোছলমান মিথ্যে কথা ছাড়া সত্যি বলল কবে? বছর বছর ঝড় হয়, তবু বলে ঝড়ে পড়েনি গাছটা? অথচ কত ঝড়ের কথাই না মনে পড়ে মেজবাবুর। কত বড় ঝড়, কতগাছ ভেঙে পড়ল একবার.... বাজ পড়ে পাঁচটা মানুষ মরল একসঙ্গে।

এক চাষা এগিয়ে এসে বলল, বেলগাছ কোনোদিন মাটিতে পড়েনি বড় মেহগিনির মতো, ও যেমন ছিল তেমনিই আছে।

বলছনা কেন তা, বলার হিম্মত আছে?

বললে সাধুরা ত্রিশূল ঢুকিয়ে দেবে।

দেবেই তো। গর্জন করলেন মেজ দারোগা, দেবতার নামে মিথ্যে বলা ঠিক না, এত লোক কি এমনি আসছে?

আজ্ঞে যেমন শুনেছে তেমনই জানছে বটে।

কদমগাছির চাষারা কেউ সোজা মানুষ যে নয় তা টের পেলেন দারোগাবাবু, তবু তিনি বললেন, ও তো গাছ নয়, ভগবান, মরতেও পারে আবার মরা অবস্থা থেকে বেঁচে উঠতেও পারে, জয় বাবা বিশ্বনাথ!

চাষা বলল, কথাটা মহাজন আর তার সাধু রটিয়েছে....।

দারোগাবাবু হাঁটছেন। তাঁর পিছু পিছু চাষার দল। তাদের ভিতরে মিশে আছে রিকশাওয়ালা জাফর। কথাটা তার মুখ দিয়েও তো ছড়িয়েছিল। আশ্চর্য কথা পেলেই সে ছড়িয়ে বেড়ায়, যেমন উঠল সাদা হাতির মতো মানুষ রিকশায়, রিকশা থেকে নামল গেরুয়া পরা সাধু। ছিল ইদুঁর হয়ে গেল বেড়াল। ছিল বেড়াল, হয়ে গেল বাঘ। আগে আর একবার একথা ছড়িয়েছিল :মরাগাছ পড়েছিল ভুঁইয়ের উপর, সেই গাছ জিন্দা হলো, আশ্চর্য খবর! জাফর উত্তেজিত হয়ে উঠল, সব খবরেরও বড়

খবর জুটে গেছে আজ, আসলে গাছ মরেনি, এদিকে ঝড়ই হয়নি -- না হয় যদি কোন গাছ উঠে দাঁড়াল আকাশের দিকে ডালপালা মেলে?

জাফর শুনছিল চাষাদের কথা আর পুলকিত হচ্ছিল। মরা বেলগাছ উঠে দাঁড়িয়েছে শুনে নেড়ারাও সবাই বেলতলায় হাজির, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সবই মিথ্যে। গাছ মরেনি। কোনোদিন মরেনি। জিন্দাই ছিল মাঠের ভিতরে। ভীষণ ঝড়ে কত কিছু উপড়ে গেল, কতবাড়ি ভাঙল, ভাঙল কত সৌধ, দালান কোঠা, মন্দির মসজিদ, গির্জা, পড়ল কত মেহগনি, শিরিস, গিরিশ, কিন্তু বেলগাছ পড়েনি। এই যে কদমগাছি, এর উপর দিয়ে যে ঝড়ই থাকনা কেন কোনো মানুষের কিছু হয়নি। কত ঘূর্ণী বায়ু আচমকা এসেছে, অযোধ্যার গরম বাতাস এসেছিল, মীরাটের আগুন এসেছিল, কিন্তু তার আঁচও লাগেনি কারোর গায়ে।

দারোগাবাবু হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ালেন, মনে হলো, তদন্ত একতরফা হচ্ছে। মহাজন আর তার লোকজন কই? কেউ আসেনি। ঠিক আছে, তারা সব দূর থেকে নজর রাখছে তো । মোবাইলে কথা বলে নেবেন না হয়।

দারোগাবাবু বললেন, ও গাছ যে মরেনি, বলতে পারবি?

পারব।

মানে মাটিতে পড়ে শুকিয়ে ও মরেনি তো?

না, যেমন ছিল তেমন।

তাই ই তো হবে, ও গাছ যে ভগবান, মরবে কেন? বলে দারোগাবাবু মাটিতে পদাঘাত করলেন, মরলেও ভগবান, না মরলেও, এত লোক যাঁর গোড়ায় ঢালতে আসছে, তিনি তো ভগবানই, না হলে এত সাধু আসে?

বুড়ো চাষা একজন বলল, আসুন তাঁরা, কিন্তু মোদের জমিন ছেড়ে দিন, গাছের নামে জমি নিয়ে নিচ্ছে দখলে, চাষ করব কোথায়?

দারোগাবাবু হাসলেন, চাষ না হয় না হবে....., কথায় বলে জীব দিয়েছেন যিনি অন্ন দেবেন তিনি, ভয় কী, আছেন বাবা বিশ্বনাথ।

রিকশায় উঠে বসলেন মেজদারোগা।

চার

কদমগাছি, নীলগাছি, গোপ্ত খবর কহি।
বেলগাছ বামনগাছ, শেষপাতে দহি।
সে গাছ মরেনি কভু, দাঁড়ায় আজীবন

ধুলো মেঘ হয়

মিথ্যা কহে, মিথ্যা কহে , যতেক মহাজন।

দারোগা ডাকেন পাগলা দুলালকে, এই ছড়া কে লিখল?

দুলাল বুকে হাত দেয়।

এসব কথা কে বলে?

মানুষ বলে, শুনবেন আরও:

বেল গাছ মরণশীল, মরিবে নিশ্চয়,

মরে নাই এখনো, তাই ভগবান হয়।

শুনে দারোগার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘোরে। দুলালটা অযোধ্যা থেকে ফিরে এসেছিল স্যায়না হয়ে না পাগল হয়ে? কতদিন কেটে গেছে তারপর কিন্তু পাগলামি সারেনি।

দারোগাবাবু বললেন, সবাই বেলতলা ছুটছে।

ছুটবেই তো, গাছ যদি ভগবান হয়, লোকে শুধু হুজুক চায় স্যার।

দারোগাবাবু বললেন, ঠিক আছে যাও।

দারোগাবাবু দুলালকে বিদায় করে মোবাইলে মহাজনকে ধরেন, কী করা যায়?

মহাজন বললেন, পীরতলায় বৃক্ষ ভগবান বিল্বনাথের নামে ভি.ডি.ও চালানো হচ্ছে নাইট শো এর আগে। প্রণামীর ভাগ পাবেন।

দারোগাবাবু বললেন, রটে যাচ্ছে যে গাছটা আদপে মরেনি।

যে বলে তাকে কেস দিয়ে হাজতে ভরে দিন, শুনুন মশাই এবার থেকে লোকে আর পীরথানে যাবে না, বেলতলায় যাবে, সেই ব্যবস্থা হচ্ছে।

আঁজ্ঞে পীর সায়েবে যে আমারও বিশ্বাস। দারোগা বিড়বিড় করলেন।

থুয়ে রাখুন বিশ্বাস, পীর সায়েব ভিনদেশী, বেলগাছ বামুন গাছ, এই দেশি, বিল্ব ফলে শিবপুজো হয়।

মোবাইল বন্ধ হয়। দারোগাবাবু নিঝুম হয়ে বসে থাকেন। পীরতলায় পীরথানে হিন্দু-মুসলমানের হাত চিরাগ জ্বালায় সন্ধ্যের অন্ধকারে। দারোগা হবার আগে ও পরে তিনি নিজেই কি জ্বালাননি বারবার। মহাজন তার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে পীর সায়েবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামল! একি ঠিক হল? পীরতলার নাম নাকি বেলতলা হবে, এমন লিফলেটও হাতে এসেছে। তিনি আবার মোবাইলে ধরেন মহাজনকে, কথা হয় এইরকম,

দারোগা : পীরতলার পীরবাবা থাকুক, আবার বিশ্বনাথও থাকুক এমন হয়না?

মহাজন : সেবার অযোধ্যায় পুলিশও মসজিদ ভেঙেছিল।

দারোগা : আমার পীরবাবায় যে বিশ্বাস ---

মহাজন : কতকালের প্রেম ধুলো হয়ে যায় তো বিশ্বাস।

দারোগা : ব্যাপারটা খারাপ দিকে চলে যাবে।

মহাজন : প্রণামীর ভাগ আপনিও পাবেন স্যার, লোক যাচ্ছে।

মেজদারোগা নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস নিলেন। এই থানার বড়বাবু বদলি হয়ে গেছেন মাস তিন। নতুন কেউ আর এসে পৌঁছতে পারেননি। এখন মেজদারোগাই বড় দারোগা। মহাজন কথা দিয়েছে বিশ্বনাথের পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে মেজদারোগার জীবনে উন্নতি হবে।

পাঁচ

পাগলা দুলালের হাতে গেরুয়া কাগজে ছাপা লিফলেট এনে দিল বুড়ো সুলেমান রিকশাওয়ালা। বুড়ো জিজ্ঞেস করে, তুমি লিখেছ?

চমকে ওঠে দুলাল, আমি তো লিখিনি।

তুমি ছাড়া কে আছে কবিয়াল?

দুলাল মাথা নাড়ে, বলল, তোতন ঠাকুর কার চোখে মায়া লেগেছে কে জানে! দেখি লিফলেটটা।

দুলাল দেখল গেরুয়া রঙের কাগজটি। এমন ভাল কাগজে এমন ভাল ছাপা পীরতলায় হয়না। কালার কম্প্যুটারে ঝকঝকে ছাপা, মনে হয় বড় শহর থেকে এসেছে সাধুবাবাদের হাতে হাতে।

বেলতলা আসল তলা, পীরতলা নয়,
পীরতলার নাম এবার বেলতলা হয়।
যেমন মাদ্রাজ শহর হলো চেন্নাই,
বোম্বাই মুম্বই হলো তাকি জানা নাই।
পীরবাবা ভিনদেশি, ও ঠাকুর হটাও,
শিকলে বাঁধিয়া ফেলে ওপারে পাঠাও।
জয় বাবা বিশ্বনাথ, শুনো বহুজনে,
বেলগাছ বাবা হলো, অতি শুভক্ষণে।

ধুলো মেঘ হয়

দুলাল মন্ডল লিফলেট পড়তে পড়তে কেমন যেন হয়ে যায়। সুলেমান বুড়ো দ্যাখে তার চোখের রঙ বদলে যাচ্ছে। কাঁপছে দুলাল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। দুলালের চোখে ভেসে উঠছিল আট বছর আগের সেদিন।

পূবে যাও, পশ্চিমে যাও, তরবারি ঘোরে
ত্রিশূল দিয়া সাধু মনুষ্য বধ করে
ওই দ্যাখো সর্বত্যাগী, হাতে মেসিনগান
সরযূ নদীর জলে করিয়া সিনান ......

কী হলো দুলাল, কী হলো? বলল সুলেমান।

চাচা বড় ভয় করে, দিন কাল খারাপ মনে হয়!

কেন, দিনকাল খারাপ কেন?

পীরের থান তুলে দেবে বলেচে মহাজন।

কী বলিস, কী বলিস দুলাল!

দুলাল ঘোর দৃষ্টিতে দ্যাখে হাজার হাজার মানুষ শাবল, ত্রিশূল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পীরথানে, যেমন হয়েছিল অযোধ্যায়। সে হাঁটতে লাগল থানার দিকে। তাকে অনুসরণ করে সুলেমান।

সুলেমান ডাকে, কোথাও যাও দুলাল?

দুলাল বলে, :

ইহা বড় অসত্য কথা, ইহাতে কী হয়?
মিথ্যার উপরে কি গাছ ভগবান হয়?

সুলেমান বলে, তোমারে দেখে ভয় করছে দুলাল।

দুলাল বলে,

মহাজন পীরতলায় কবে যে আইলো?
কীভাবে জল হাওয়া হাঁমুখে খাইলো?
কে কহিতে পারে ওগো, কী হবে উপায়?
কেন কাঁটা ফুটিতেছে ডান পা বাঁ পায়।

দুলাল বলে, কী হবে উপায়!

কী হবে উপায়? এই পীরতলায় কতদিনের বাস পীর মোয়াজ্জেম শাহ্‌র। এখানে তাঁর সাধনা, এখানে সিদ্ধি। ইন্তেকালের পর এখানেই আছেন। মাটিতে মিশে আছেন। আছেন আলোয়, অন্ধকারে, বাতাসে, মেঘে, বৃষ্টিতে। রাতদুপুরে তাঁর ঘোড়াকে স্বপ্নে পায় কতজনে! ওই যে তিনি গভীর রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন ধুলো উড়িয়ে। ওই যে তিনি বাতাসে হেঁটে যাচ্ছেন। পীরবাবাই যদি না থাকেন, পীরতলায় থাকবে কি? একটা বেলগাছ নাকি জ্যান্ত হয়েছে, তা বাদে আর কী? বেলগাছ ঘিরে মানুষের কল্পনা কি আছে? দুলাল বিড় বিড় করতে করতে হাঁটে। শোনে মহাজনের কথা লাউডস্পীকারে কথা বাজছে-----

বুড়োপীর, ভিনদেশি, এবারে বিদায়
সুদেমূলে কত হলো, করিব আদায়।
পীরতলায় নাই থান, দাগিয়া দিলাম,
জমিজমা ভিটে বাড়ি করিব নীলাম।

দুলাল টের পায় ঝড় আসছে পীরতলায়। সেই যে আটবছর আগের একদিনের মতো ঝড়। দুলাল দেখল খালপাড় থেকে যাচ্ছে বুড়ো পীর। তাই তো! আহা কত বুড়ো হয়েছে পীরবাবা! ময়লা লুঙ্গি, কোকাকোলা ছাপ মারা ময়লা গেঞ্জি। খালপাড় থেকে দেখল দুলাল, বুড়ো পীর থানাগোড়ায় বকুলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। ওই যে তার ঘোড়া। দুলাল সোজা হেঁটে যায় থানাগোড়ার দিকে। বুড়ো পীর বিড়ি ধরিয়ে আকাশপানে চেয়ে আছে। মুখখানি অন্ধকার।

দুলাল দেখল ঘোড়া হাঁটিয়ে চলল বুড়ো পীর। কোমরটা বেঁকে গেছে কত! গালের সাদা দাড়ি খসে যায় যায় ভাব। গা দিয়ে পুরোন মাটির গন্ধ বেরোচ্ছে। কত শত বছর সে রয়েছে এই মাটিতে। দুলাল ডাকল নত হয়ে, হেই পীরবাবা, পীর সায়েব, কুথা যাও।

কী হবে উপায়? বুড়ো পীর কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে প্রায়, মহাজনে যে থান ভাঙবে কয়েছে, যাব কুথায়? পীরতলা ছাড়া চিনিনে কিছুই।

দুলাল নিঃস্তব্ধ। তার চোখে ভাসে আট বছর আগের এক অঘ্রান। অযোধ্যা, সরযূ নদীর তীরে।

বুড়ো পীর হাসফাঁস করে, কতকাল আছি কত জনারে নিয়ে!

রিকশা প্যাঁক প্যাঁক করে। দুলাল শোনে ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি রব। দ্যাখে ঘোড়া পা আছড়াচ্ছে। আহা ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে কত! সে ডাকল পীর সায়েবকে, কান্না তুমার মানায় না বাবা, যাবা নাকি কদমগাছি? দেখে আসি সবড়া।

যাব, উঠে এস। পীর সায়েব নিজে তাঁর ঘোড়ায় উঠে দুলালকে ডাকেন।

বুড়ো সুলেমানের রিকশায় চেপে দুলাল বলল। পীরের ঘোড়ায় চেপে পাগলা দুলাল চলে বেলতলা। একটা ঘোড়া তো নয়। শত শত ঘোড়া। পীরের ঘোড়ায় চেপে দুলাল হাঁক দেয়, আছ যারা ঘোড়া নিয়ে, চলো কদমগাছি।

পীরতলার সব রিকশাওয়ালারা দুলালের ডাকে রওনা দেয়। বুড়ো সুলেমান রিকশাওয়ালার পিছু পিছু প্যাডেল ঘোরায়। আশ্চর্য কাণ্ড! দুলাল গদি রিকশার গদির উপর দাঁড়িয়ে দ্যাখে, শত শত ঘোড়া! সব ঘোড়ায় পীর আছে। সব পীরের ঘোড়া আছে। ধুলো উড়ছে মেঘহীন শ্রাবণের পথে। ধুলোয় আঁধার হয়ে যাচ্ছে পথ ঘাট।

শত শত ঘোড়া যায়, শত শত পীর
দিবসে আঁধার নামে, পরাণ অধীর।

পাগলা দুলাল কানে শোনে অশ্বক্ষুরধ্বনি। বুড়ো পীর হাত তুলে থাকে। সারিবদ্ধ রিকশা, ভ্যান রিকশা, সব চলেছে। রিকশার গদিতেও পীর, রিকশার প্যাডেলেও পীরের পা। সব ঘোড়ায় পীর, পীরের পিছনে পীর।

মহাজন অবাক, কে যায়, কে যায়? এত ঘোড়ায় কে যায়?

দুলাল জবাব দেয়, পীরবাবা।

কোথায় যায়, কোথায়?

পীরতলা থেকে পীরতলায় যায় ভায়া কদমগাছি। পাগলা দুলাল হেঁকে বলে।

ছিল পীর একজনা, কালে বুড়ো হলো,
শত পীর, শত ঘোড়া, দ্যাখো এসে গেল।
ভ্যান চলে, গদি চলে, ঘোড়ার কি বাহার
সকালে বিকালে তবু না জোটে আহার।

চলেছে অশ্বারোহী পীরবাবা। পীরবাবার কাহিনীর কোনো শেষ নেই। পীরতলায় এমন ঘটনা ঘটেই থাকে। প্রায়ই ঘটে। ছিল মরা বেলগাছ, মাটিতে শুয়ে প্রায় মাটি হয়ে যাচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে ভগবান হয়ে যায়। ছিল এক যুবতী, এক লহমায় হয়ে যায় বুড়ি। ছিল বুড়ি, হয়ে যায় খুকি। ছিল ভ্যান রিকশা, গদি রিকশা, হয়ে যায় ঘোড়া। ছিল রিকশাওয়ালা, সুলেমান, জাফর, ননী, ফণী, হয়ে যায় পীরবাবা। শত শত পীর হলো, শত শত ঘোড়া।

ছয়

ছিল যে রিকশাওয়ালা জাফর, যে কিনা যত সব আবোল তাবোল কথা রটিয়ে বেড়ায়, শোনে

যত অদ্ভুত সব কাহিনী ---- মরা গাছ জিন্দা হলো, পীর থানে গিয়ে মরা বাচ্চা হাসল খিল খিল করে, সেই জাফরের বিবি হয়েছে পোয়াতি। পোয়াতি বিবি পা ছড়িয়ে স্বামীর কাছ থেকে অদ্ভুত সব খবর নেয়, কত খবর, এসেছে লিপস্টিক এক,

এসেছে লিপস্টিক এক, ঠোঁটেতে ঘষো,
হুরী পরী হয়ে যাবে, কহি সব রসো।
এসেছে সাবান এক, বুকেতে মাখো,
যৌবন অক্ষয় হবে, মাধুরী দ্যাখো।

এমন সব খবর বয়ে আনা জাফর রিকশাওয়ালা বিবিকে বলছে, ছিল ভ্যান রিকশা, হয়ে গেল ঘোড়া।

সে কী সত্যি?

সত্যি।

তারপর কী হলো?

ধুলো উড়ল খুব, ধুলো উড়ল ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে, আকাশ ছেয়ে গেল।

তারপর?

সেই ধুলো মেঘ হলো।

তারপর?

সেই মেঘে বৃষ্টি হলো।

তারপর?

সেই বৃষ্টিতে ধান হলো।

তারপর?

নতুন ধানে জাফরের বিবি পোয়াতি হলো।

জাফরের বিবি আহ্লাদে গলে যায়, তারপর কী হলো?

কী হলো, পীরবাবা থেকে গেল?

তারপর কি হলো গো?

জাফর দু হাত আকাশে তুলে উঠে দাঁড়ায়, কী হলো? কী হলো তা দুলাল জানে। পাগলা দুলাল, যা ঘটে তা আগে থেকে টের পেয়ে যায়। পদ্য লিখে ফেলে। লিখছে দুলাল পদ্য। চাঁদের আলোয় খালপাড়ে বসে। পীরথানের চিরাগের আলোয়। দিবসে সূর্যের আলোয়। সে লিখেই চলেছে পীরবাবার কাহিনী।

বাঞ্ছাকল্পতরু

কিন্নর রায়

জলাশয়--তাহা পুষ্করিণী, দীঘি অথবা খরস্রোতা নদী যাহাই হউক না কেন, সর্বত্রই চন্দ্রে খণ্ডিতাংশ মিলিতেছে। সেই খণ্ডিতাংশ দুই হস্ত ডুবাইয়া অঞ্জলিবদ্ধভাবে তুলিবার উপক্রম করিলেই গাত্র মার্জনার সাবান হইয়া যাইতেছে।

এইরূপ বার্তা গ্রাম-নগরের সর্বত্র ফিসফাস হওয়ায় ভাসিতে লাগিল। জল হইতে খণ্ড শশাঙ্ক তুলিয়া ধরিতে গেলেই তাহা সুগন্ধ সাবানে রূপান্তরিত হইতেছে। উক্ত সাবান ময়েশ্চারাইজার ও ল্যানোলিন যুক্ত। সাবান গাত্র ত্বকে ঘষিলেই ফেনিল জ্যোৎস্না। কৃষ্ণাঙ্গী অবিলম্বে শ্বেতাঙ্গিনী ইহা যেন কার্যত এক ইন্দ্রজাল।

গ্রাম্য বৃক্ষেরা এইরূপ চমৎকারিত্ব দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছে। তাহারা পরস্পরের ভিতর ফিসফাস করিয়া নিচু স্বরে উক্ত বিষয়ে আলাপ করিতেছিল।

পনস বৃক্ষ কহিল, ইহা কি আলাদিনের জাদু? নাকি ভানুমতির খেলা অথবা ভোজবিদ্যা?

নারিকেল তরু বলিল, না! যতদূর জানি কোনো জাদু চিরাগ বন্দি জিন বা ক্ষমতাধর বেতাল এইরূপ কর্ম করিতেছে না।

তাহা হইলে কে? রসাল জানিতে চাহিল।

ইদানীং রসালের গাত্রে আর স্বর্ণলতিকার পেলব বন্ধন নাই। পোকা মারা ওষুধ---পেস্টিসাইড তাহার তুষ্টিনাশ করিয়াছে। উপরন্তু পূর্বের ন্যায় তাহার আদর-কদরও আর যেন সেরূপ নাই। রামায়ণে যে সহকারকে অমৃত ফলের বৃক্ষ বলা হইয়াছে, তাহার এখন বড়ই দুর্দিন। বিশ্বজোড়া দুর্দান্ত সংকরায়ণ ও পেটেন্ট ফাঁদের ফলে অসাধারণ সমস্ত হাইব্রিড আম আসিতেছে বাজারে।

রসাল এই লইয়া কয়েকদিন বেশ বিমর্ষ ছিল। এমনকি মাথার উপর নীল নভোমণ্ডলে শশীমুখ দেখিয়াও তাহার বিষাদ দূরীভূত হইতেছিল না। ইতো মধ্যে পবন এক রাত্রে তাহার কর্ণে ফিস ফিস করিয়া বলিয়া গেল, দুঃখ করিও না। চতুর্দিকেই এখন বিশ্বায়নের সু-পবন বহিতেছে। সেই মলয় বাতাসে বিশ্বয়নের সুগন্ধ। কেনটাকি চিকেন আসিতেছে। সমস্ত—প্রভূত সস্তায় পাইবে। আসিতেছে চীনা সাইকেল, জুতা, টিভি, ওয়াশিংমেশিন। কোরিয়া ও জাপানের নানা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম—সবই জলের দরে। সস্তা, অথচ তাহার তিন অবস্থা হয় না।

মুখ ব্যাজার করিয়া রসাল বলিল, সবই কিছু কিছু শুনিয়াছি। ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের গর্ব বাসমতি তন্ডুল টেক্‌স মতি নাম লইয়া সাহেব হইয়াছে। তাহা লইয়া আমাদিগের রাষ্ট্র-কর্ণধারদের কোনোরূপ দুশ্চিন্তা নাই। বাসমতি তণ্ডুল রপ্তানি করিয়া যে সহস্র সহস্র ডলার আসিত, তাহা আমাদিগের কান মুলিয়া বন্ধ করিয়া দেয়া হইল। আমেরিকার সাহেবরা সংকরায়ণের মাধ্যমে

টেক্সমতি তৈয়ারি করিয়া আমাদিগকে পথে বসাইয়াছে। এখন হা-হুতাশ করা ছাড়া আমাদিগের আর কিছুই করণীয় নাই।

অল্প দূর নিম্ব বৃক্ষ একাকী দণ্ডায়মান ছিল। গ্রীষ্মের সারা দিবসব্যাপী দাবদাহের পর সন্ধ্যা পার হইয়া রজনীর প্রথমার্ধের জ্যোৎস্নালোকে তাহার হরিৎ পত্রগুলি বাতাস স্পর্শে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে।

নিম্ব বলিল, পরিতাপের কথা কি আর বলিব! কহিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার দেহ দিয়া জগন্নাথের মূর্তি হয়। সঙ্গে বলরাম। সুভদ্রারও। অবশ্য সেইসব বৃক্ষে বিশেষ কতগুলি দৈবী চিহ্ন থাকে। পুরীর মহারাজা সেই সংকেতময় বৃক্ষ রজত নির্মিত কুঠারে ছেদন করেন। সে প্রসঙ্গ অবশ্য এ স্থলে আসিতেছে না।

যাহা হউক, নিম কাষ্ঠে কীট উপবেশন করিতেই ভয় পায়। দংশন করা তো দূরের কথা। এই দারু হইতে অন্যসব দেবমূর্তিও হয়। হয় আমার পত্র, ফল, পুষ্প— সবই ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ ক্ষত নিরাময় কর্মে লাগে।

বল্কল দিয়াও ক্ষত শোধনের কর্ম করা:হয়। আর কত কহিব। নিজ সম্পর্কে অধিক কথা কহিতে লজ্জা হয়। কিন্তু বেদনার কথা এই, আমার গুণও নাকি সাহেবরা পেটেন্ট করিতে চাহিতেছে।

ভারতের নিম ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অনুমতি ব্যতীত নিজ ইচ্ছা মতো ব্যবহার করিতে পারিবে না। কি আশ্চর্যের কথা। বলিতে বলিতে দীর্ঘ শ্বাস ফেলিল নিম্ব বৃক্ষ। যামিনী ঘন জ্যোৎস্নালোকে তাহার এই শ্বাসপতন বেদনার তরঙ্গ তুলিল।

নিম্বের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া কাতর কণ্ঠে নারিকেল বৃক্ষ কহিল, এ স্থলেই শেষ নহে। শুধু বাসমতি তন্ডুল বা নিম্বের উপর আক্রমণ নামিয়াছে তাহাই নয়। সম্ভবত বহু রোগহর হরিদ্রাও এই তালিকা হইতে বাদ পড়িতেছে না। এহো, কহিতে কহিতে কথার ফাঁকে আর একটি বাক্য বিস্মরণের অন্তরালে পতিত হইয়াছে।

কি, কি—সমবেত কণ্ঠে বৃক্ষকূল জানিবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতি শুধু 'টেক্সমতি'ই হয় নাই। 'কাশমতি'ও হইয়াছে। ইহা ছাড়া অপর একটি নামও পেটেন্ট শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছে মার্কিন সায়েবরা। আর হরিদ্রার সহিত সম্ভবত গোলমরিচও হাত ছাড়া হইবে। যে গোলমরিচ একদিন ভারত হইতে পর্তুগিজ বণিকদের অর্ণবপোতে বোঝাই হইয়া য়ুরোপের রন্ধন বিদ্যার ব্যাকরণ বদলাইয়া দিয়াছিল, তাহা আজ আমেরিকান বানিয়াদের করতলগত।

সব শুনিবার পর খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া পনস বৃক্ষ কহিল, আমি নির্গুণ কাঁঠাল। কাষ্ঠ চিরিয়া বড়জোর পিঁড়া বা চৌকি প্রস্তুত হয়। নয়ত বঁটি অথবা কাটারির হাতল। ফলও সকলে 'আহা, বেশ, বেশ' বলিয়া গ্রহণ করে না। বরং বহুজনই পক্ক পনস গন্ধে বিবমিষা আসিতেছে এইরূপ ভাব করে। তাহাদের নটিপনা দেখিয়া অন্তরাত্মা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। শৃগাল ও মক্ষিকা ব্যতীত পক্ক পনসের কোনো অকৃত্রিম প্রেমিক আদৌ কেহ আছে বলিয়া জানি না। অবশ্য কোনো কোনো রসিক,

ভোজনবীর পক্ক, রসাল পনসে, তৃপ্ত হয় বটে। তাহারা দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর—সবেতেই পক্ক পনস দিবার পক্ষপাতি। অপক্ক পনস—যাহাকে রসিক জন ইচড়, এঁচোড় বা গাছ-পাঁঠা বলেন—তাহার স্বাদ অবশ্য অনেকেরই রসিক রসনায় লালা আনয়ন করে। ঘৃত, গরম মশলা সহযোগে, কিংবা চিংড়ি সহ অপক্ক পনস সত্য সত্যই ছাগ মাংসকেও লজ্জা দান করে।

যাহা হউক, বহুক্ষণ নিজ গুণ কীর্তন করিলাম। এক্ষণে নারিকেল বৃক্ষের বিপদের কথা বলি, সকলে শ্রবণ কর।

বৃক্ষকুল সমস্বরে কহিয়া উঠিল—আপনি বর্ণনা করুন।

পনস বৃক্ষ পুরাতন কথার ছিন্ন সূত্র পুনরায় বন্ধন করিয়া বলিল, হ্যাঁ, যা বলিতেছিলাম। গ্রাম বাংলায় এখনও নারিকেল বৃক্ষের কদর খুব। গ্রামের মানুষ তাহাকে ব্রাহ্মণবৃক্ষও আখ্যা দেন। নারিকেল ফল—কচিও পক্ক দুই-ই নানা ব্যবহারে লাগে। তাহার শুষ্ক পত্র হইতে শলাকা নির্গত পূর্বক সম্মার্জনী তৈয়ারি হয়। এই সম্মার্জনী গৃহ, অঙ্গন ইত্যাদি পরিষ্কার করণের কাজে যেমন লাগে, তেমনই তাহা কখনও কখনও নারীর হাতে হইয়া উঠে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্র। শলাকা বিহীন নারিকেল পত্র জ্বালানীর কাজে লাগে। নারিকেল পত্রের ভস্ম ভর্জিত তাম্বকু পত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখ ও দন্ত প্রক্ষালণের নিমিত্ত একরূপ গুড়াখু প্রস্তুত করা হয়। গ্রামীণ রমণীরা সেই কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণ সাগ্রহে দন্তে প্রদান পূর্বক অঙ্গুলির সাহায্যে দন্তে ধাবন করেন। যদিও নারিকেল কাষ্ঠের তেমন বৃহৎ কোনো কদর নাই। গৃহের খুঁটি ও নদী বা পুকুরঘাটের রানা তৈরিতে তাহার ভূমিকা অবশ্য ফেলিয়া দিবার মতো নয়। সর্বোপরি শুষ্ক নারিকেল—যাহাকে ঝুনা নারিকেলও বলা হয়, তাহার খোসা বা ছোবড়া দিয়া দড়ি সহ নানারূপ শিল্পসামগ্রী নির্মাণ করা হইয়া থাকে। পূর্বে নারিকেলের ফাঁকা মালা বা আঁচি লইয়া গরিব মানুষ গৃহস্থের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করিতেন। ইহাকে কোথাও কোথাও 'আঁচি হাতে মাগনও' বলা হইত। ইহা ছাড়াও আঁচি বা মালা লইয়া লবণ তোলা হইত আজ হইতে তিরিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে। তৎকালে কাষ্ঠ নির্মিত 'কোঠা'-র ভিতর খোলা লবণ ঢিপি করিয়া রাখা হইত। তাহা ছাড়া বর্তমানের পরিবর্তে নারিকেল মালার ব্যবহার সিদ্ধ ছিল। বামাচারী কাপালিকরা কেহ কেহ নরকপোলের পরিবর্তে নারিকেল মালায় আসব ঢালিয়া ঢক ঢক করিয়া পান করিতেন। বর্তমানে এই সকল নারিকেল মালায জল, তৈল, লবণ, ভিক্ষার চাউল, কাপালিকের আসব—কিছুই রাখা হয় না। বরং ইহা অবলম্বনে নানা প্রকার শিল্প কর্ম তৈয়ারি হয়। এই কালে তাহা বেশ মুনাফা বর্ধকও বটে। তাই পেটেন্ট শৃঙ্খলা নারিকেল বৃক্ষের বন্ধনদশা আসিবার সম্ভাবনা বিপুল। অমিত সম্ভাবনাপূর্ণ এই পাদপের উপর কি নামিয়া আসিবে পেটেন্ট রূপ খড়্গ? বক্তব্য সমাপ্ত করিয়া পনস বৃক্ষ নীরব হইল।

বৃক্ষেরা নিজেদের ভিতর আপসে ফিস্ ফিস্ করিতে লাগিল।

বিপদ তো সমূহই কিন্তু গ্রাম-নগরে যে রূপ শশধর খণ্ড সাবানে পরিণত হইতেছে, তাহাও তো কম চিন্তার বিষয় নয়। বলিয়া নারিকেল তরু মস্তক আন্দোলিত করিল।

একটি কুলীন নয়, এরূপ নবীন বৃক্ষ—যাহাকে সাধারণ জন জঙ্গলী তরু কহিয়া থাকে বহুক্ষণ

বাক্য শ্রবণ পূর্বক মুখ খুলিল। সে জানিতে চাহিল গগন শশী কি রূপে পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা অথবা নদী স্রোতের গভীরে চন্দ্রখণ্ড রূপ থাকিতেছে। আর তাহাকে কি ভাবেই বা সাবানে রূপান্তরিত করা হইতেছে।

নারিকেল বৃক্ষ উত্তর দিল, বাপু হে ব্যাপার বড়ই গুরুতর। ইহাকে গুরুচরণও বলা যাইতে পারে। টেলিভিশনের কল্যাণে গ্রামে শহরে এই বার্তা ছড়াইয়া পড়িয়াছে খণ্ডিত শশাঙ্ক নারী করস্পর্শে সাবান হইয়া যাইতেছে। যেমন বিজ্ঞাপন বলে।

উক্ত বাক্য বলিবার পরই প্রাজ্ঞ নারিকেল বৃক্ষ এই বিষয়ের উপর একটি ছাড়া শুনাইয়া দেয়—

'কে দেখেছে কে দেখেছে
টিভি দেখেছে
টিভির বুকে ছবি ছিল
ছুঁড়ে মেরেছে
সে ছবি ভালো লেগেছে
বড্ড ভালো লেগেছে।।'

বস্তুত চন্দ্র খণ্ড যে নারী করস্পর্শে সাবান হইয়া যাইতেছে, তাহা বিজ্ঞাপন মারফতই প্রচারিত হইয়াছে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ এখন সর্বদাই কি খাইব, কি মাখিব—এই রূপ প্রচার দূরদর্শনের পরদা জুড়িয়া চলিতেছে।

পূর্বে গ্রামে— 'চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা—'
'আয় চাঁদ নড়ে চড়ে ভাত দেব বেড়ে গুড়ে—'

চাঁদ পড়িবার দিব বলিলে তাহারা বিবিধ বায়নাক্কা ভুলিয়া খানিকটা শান্ত হইত। এবং সেই শিশুও হাত নাড়িয়া চন্দ্রকে ডাকিত।

এই ধারাবাহিকতা যুগ যুগ চলিয়াছে। আরও পরে বহু সঙ্গীতে, কাব্যে চন্দ্ররূপকথা বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হইয়াছে। 'আমার সোনা চাঁদের কণা' বলিয়া একটি সঙ্গীতের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়িতেছে। ইহা ছাড়াও—'তোমার খোকা চাঁদ ধরতে চায়'—এইরূপ একটি লাইন বাংলা ফিল্ম মারফত বাঙ্গালি বহুদিন খাইয়াছিল।

চন্দ্র বিষয়ক এত কথা বলিয়া প্রাজ্ঞ নারিকেল বৃক্ষ চুপ করিল।

পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা অথবা নদী গভীরে চন্দ্রখণ্ড সাবানে পরিণত হইবার টিভি কাহিনী গ্রাম-বৃদ্ধারাও বিশ্বাস করিতে শুরু করিল। অনেকেই কহিল, কি ভালো শ্যাম্পু এয়েচে, সাবান, লিপিস্টিক—দাম একটু বেশি তাতে কি হলো! দেখতে তো ভালো দেখাবে।

'অ্যাময়' ও 'অরিফ্লেম' নামের দুইটি বিদেশি কোম্পানি তাহাদের শ্যাম্পু, সাবান, লিপস্টিক লইয়া দ্বারে দ্বারে পঁহুছিয়া যাইতেছে। দ্রব্যের দাম অধিক। কিন্তু ইহাতে নাকি রূপ খোলে, সুতরাং রূপটান হিসাবে অনেকেই উক্ত প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় করিতেছে।

কেহ বা রাতারাতি ধনী হইবার নিমিত্ত উক্ত দুই কোম্পানির এজেন্ট হইয়া যাইতেছে। কিছু টাকা

লাগাইয়া এজেন্ট হওয়া। তাহার পর অন্যদের পাকড়াইয়া এজেন্টকরণ। এইরূপে বৃত্ত সম্পূর্ণ হইতেছে। তখন সেই এজেন্ট আবার অন্য এজেন্ট পাকড়ায়। এইভাবেই চলিতে থাকে।

শোনা যাইতেছে, ব্যাঙ্ক বা সওদাগরী আপিসের মোটা মাহিনার বড় চাকুরি হইতে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের পর অনেকেই এই সব সাবান, শ্যাম্পু, লিপস্টিকের বৃহৎ এজেন্ট হইয়া বসিতেছে। প্রথমে নাকি টাকা লাগাইতে হয়, পরে টাকা আসে। অর্থের নিয়মই নাকি এইরূপ।

সুতরাং যাহাদিগের হাতে নিয়মিত অর্থ আসিতেছে, তাহারা ঊর্দ্ধবাহু ও মুক্তকচ্ছ হইয়া বিদেশি সংস্থার জয়গান করিতেছে।

এইসব তথ্য বাক্য হইয়া নদী, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণীর জলে ভাসমান থাকে। গ্রামবৃদ্ধা, কিশোরী, যুবতীরা এই সকল বাক্য পড়িয়া পড়িয়া নিজেদের ভিতর উক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করে। বেশ কিছুদিন পূর্বে একটি টিভি কোম্পানি শিঙ সহ মুণ্ডিত মস্তক শয়তানের চিত্র দেখাইয়া বলিত— 'আপনার গর্ব প্রতিবেশীর ঈর্ষা'— তাহা দেখিয়া গ্রামের প্রাচীন বৃদ্ধা হরিদাসী কহিয়াছিলেন, মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন। খ্যাংরা মার অমন বিজ্ঞাপনের মুকে। একবার নয়, হাজার বার খ্যাংরা মার। একি অলপ্পেয়ে কথারে বাবা! আমি জিনিস কিনব আর আমার পাশের বাড়ির লোকের বুক জ্বলবে। এমন অলুক্ষুণে সামগ্গিরি কেনার দরকার কি লা! কিনলেই হয়! মুয়ে আগুন অমন কেনাকাটার।

হরিদাসীর বাক্য সমূহ তেমন করিয়া কেহ গ্রাহ্য করে নাই বটে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে জল যেখানে, সেখানেই আসিয়া শশাঙ্ক খণ্ড পড়িতেছে ও রমণী করস্পর্শে তাহা সাবানে পরিণত হইতেছে-এইরূপ তথ্য পাইয়া পঞ্চায়েত প্রধানের তো আহার নিদ্রা ছুটিয়া গেল। কি! পুকুরে সুগন্ধি সাবান! ব্যাপারটা কি বল তো হে! সি আই এ-র কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো! কিংবা আই এস আই!

চামচা বলিল, ঠিক বুইতে পারছি না সার।

প্রথম প্রথম তো তিনি বিশ্বাসই করিতে চাহিতে ছিলেন না। চামচারা বার বার বলা সত্ত্বেও তাহার প্রত্যয় জন্মিতেছিল না। কিন্তু চামচা চাড়িবে কেন! সে তো নাছোড়বান্দা। বারংবার ইনাইয়া বিনাইয়া সে উক্ত বিষয়টি পঞ্চায়েত প্রধানের নিকট উপস্থাপিত করিয়া করিয়া তাহার কান ভারী করিয়া তুলিল। চামচা এমনও বলিল, গ্রামে গ্রাম কল্পবৃক্ষ আসিয়াছে। তাহার শাখা-প্রসাখায় 'অ্যাময়' 'অরিফ্লেম' ইত্যাদির প্রডাকট্-শ্যাম্পু, সাবান, নেলপালিশ, লিপস্টিক!

কল্পবৃক্ষে ওষ্ঠরঞ্জনী, নখরঞ্জনী, সাবান, শ্যাম্পু! প্রধান ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

চামচা আরও বলিল, এই বৃক্ষ হাঁটিয়া হাঁটিয়া-সরাসরি পদব্রজে গৃহস্থের আবাস অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহার মোড়কগুলি অতীব দৃষ্টিনন্দন। ভিতরে যে দ্রব্য-তাহার সুঘ্রাণ বড়ই মনোরম।

টিভি-র দৌলতে, সংবাদপত্রের কল্যাণে গ্রামে গ্রামে এখন বডি ফ্রেশনার, হেয়ার রিমুভার, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পারফিউম, ময়েশ্চারাইজার, সান ক্রিম, বডিলোশান ইত্যাদি ইত্যাদিরা হু হু শব্দে ঢুকিয়া পড়িবার প্রয়াস করিতেছে। মহল্লায় মহল্লায় এখন কল্প বৃক্ষ। সর্বত্রই বিশ্বায়নের সুপবন।

সমস্ত দিবস রৌদ্রাঘাতে জর্জরিত হয় ধরিত্রী। নিশীথে প্রকৃতির আশ্চর্য মায়ায় চন্দ্র উদিত হয়

গগনে। সে মুহূর্তে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত হইতে থাকে সমগ্র চরাচর।

শশীর মন খারাপ হইয়া যায়। সাবান কোম্পানির বিজ্ঞাপন তাহার খণ্ডিতাংশগুলিকে মহার্ঘ মণিমুক্তা হিসাবে না দেখাইয়া সাবান হিসাবে দেখাইতেছে। চন্দ্রদেবের নিকট ইহা যথেষ্ট অসম্মানের। প্রবাল, বৈদূর্য, মরকত, পদ্মরাগ ইত্যাদি ইত্যাদি মণি হইলে না হয় কথা ছিল। পুরাণে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইহাদের ভূরিভূরি উল্লেখ আছে। কিন্তু টিভি বিজ্ঞাপন আমায় কোন স্থলে নামাইয়া আনিল। খণ্ডিত চন্দ্রাংশ দিয়া সুন্দরীর গাত্র মার্জনার সাবান!

নারিকেল বৃক্ষ, অশ্বত্থ, পনস তরুরা ও অতীব চিন্তিত। কি করিয়া কি হইবে! শুনা যাইতেছে বিদেশি কল্পবৃক্ষ আসিয়াছে। প্রতি দ্বারে দ্বারে গমন পূর্বক সেই বৃক্ষ নানাবিধ ভোগ্যপণ্য পৌঁছাইয়া দিতেছে। বৃক্ষ চলিতে ফিরিতে পারে। উড়িতেও সক্ষম।

সেই উড়ন্ত ও চলন্ত বৃক্ষ দেখিয়া একরাত্রে গ্রাম বৃদ্ধা হরিদাসী তাহার বান্ধবী, ও প্রায় সমবয়সিনী অন্নদা ঠাইরেনের সহিত একত্রে ভিরমি খাইল। পতন ও মূর্চ্ছা।

শূন্যপথে বায়ুবেগে কল্প বৃক্ষ গমন করিতেছিল। কি তাহার শোভা! কি তাহার শোভা! কি আলোর বাহার! জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে বৃক্ষ শাখা, কাণ্ড হইতে। বৃক্ষ শাখায় থরে বিথরে বিদেশি দ্রব্য সাজান রহিয়াছে। পারফিউম, বডি লোশন, ময়েশ্চারাইজার, সাবান, শ্যাম্পু, টিনের মাছ-মাংস, ছত্র, ঘড়ি, পাদুকা, কম্পিউটার-কিছুই বাদ নাই

হরিদাসী অন্নদা ঠাইরেনরে বলিলেন, হ্যাঁ গা বামুনদিদি, গাছ চলাবার কথা ছোট বেলায় শুনেছিলাম। কাঁয়ুর কামিখ্যের বিদ্যে থাকলে গাছ চালান করা যায়। সেসব পারে ডাইনিরা। আর পারে বেতাল সিদ্ধ মানুষ। হঠাৎ গাছ কোথা থেকে যেন উড়ে এসে বসে পড়ে। তাকে চট করে চেনা যায় না।

হরিদাসীর কথা শেষ হওয়া মাত্র সেই উড্ডীয়মান বৃক্ষ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া আসিল। তাহার পর ধীরে ভূমির উপর অবতরণ করিল।

হরিদাসীর দু চোখ বিস্ফারিত। অন্নদা ঠাকরেনের অবস্থাও তদ্রূপ। বৃক্ষ শিকড় ব্রজে ক্রমশ তাহাদের নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

হাঁটি হাঁটি পা পা

গাছ হাঁটে, দেখে যা

এমন কথা সম্ভবত কোনো ফাজিল পক্ষি সুর করিয়া বলিয়া উঠিল।

সেই নড়িয়া চড়িয়া বেড়ান বৃক্ষের গাত্রে নানা রূপ ঝিনচাক আলো জ্বলিতেছিল। সেই গাত্র আলোক ধারায় ছত্র, পাদুকা, কম্পিউটার, বডি লোশান, ময়েশ্চরাইজার, লিপগ্লস, লিপস্টিক ও আরও কী কী সব ডাকিনীর চোখ হইয়া জ্বলিতেছিল।

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অন্নদা ঠাইরেন ও হরিদাসী উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইলেন।

সন্ধ্যা নামিল।

অতঃপর রাত্রি।

তাহারও পরে ঘোর নিশীথ।

নভোমন্ডলে --- মহাব্যোমে চন্দ্র ছিল। বড়ই ম্লান। যদিও কৃষ্ণপক্ষ নহে, তবুও শশাঙ্কর অন্তরে সুখ নাই। বিজ্ঞাপন তাহার খন্ডাংশ সহযোগে সাবান প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা হইতে অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে!

হতমান শশধর ক্রমশ ম্লান হইয়া যাইতেছে। তাহার কিরণে সেই উল্লাস ও মাধুর্য নাই।

বৃক্ষ সকলের সমাবেশের রাত্রিকালিন কথোপকথনে নারিকেল বৃক্ষ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, পেটেন্ট লইয়া বিস্তর চিন্তিত ছিলাম।

নিম্ব, হরিদ্রা, গোলমরিচ, বাসমতি, টেক্সমতি, কাশমতী লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন তো দেখিতেছি কল্পবৃক্ষ সর্বত্রই তাহার করাল ছায়া ফেলিতেছে।

পুষ্করিণী নীরে যেমত চন্দ্রাংশের বিভ্রম, সেইরূপ মায়ারই প্রায় সৃষ্টি হইতেছে কল্পবৃক্ষ ঘিরিয়া। কোথায় কখন বৃক্ষ পহুঁছিতেছে কেহ জানে না। অনেকেই চলন্ত বৃক্ষ দর্শন করত সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু উক্ত কল্পতরুর আকর্ষণ ছাড়িতে পারিতেছে না। কল্প পাদপের শাখায় শাখায় ভোগ্য পণ্যের সমাহার দর্শন করত তাহারা ক্রমেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইতেছে। কেহ বা প্রাণপণে রাধিকা হইবার চেষ্টা করিতেছে। তমাল তরুজ্ঞানে উক্ত কল্পতরুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কেহ কেহ প্রভূত উদ্যোগও লইতেছে এমত শুনিয়াছি। বৃষভানু কন্যা শ্রীমতি শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে তমাল তরু আলিঙ্গন করার কথা ভাবিত --- উক্ত কাহিনী তো আমাদিগের অনেকেই জ্ঞাত আছে।

কল্পবৃক্ষের উপস্থিতি সংবাদ চামচার নিকট পাইয়া পঞ্চায়েত প্রধান যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। ইহা সি আই এ না আই এস আই-এর কার্য্যকলাপ -- কোনটা বলিলে তাহার বিরোধী শক্তিরা টিট হইবে অথবা কোণঠাসা হইবে ---- ভাবিতে ভাবিতে ঘন ঘন তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন।

চামচা বলিল, সার, বড়ই বিপদ। কলপো না কি এক বিরিক্ষি আসিয়াছে। চলন্ত গাছ। কেহ কেহ বলিতেছে, উহা কাঁয়ুর কামিখ্যের ডাকিনিবিদ্যা জানা লোকেদের কাজ।

পঞ্চায়েত প্রধান চামচাকে বলিলেন, কোনো কথাই শুদ্ধ করিয়া বলিতে শিখিলে না। বৃথাই এতদিন আমার সান্নিধ্যে রহিলে। উহা কলপো নহে, কলোপ। বিরিক্ষি নহে বিরিক্ষ।

চামচা মাথা নিচু করিয়া কহিল, ঐ হইল।

উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্বক পঞ্চায়েত প্রধান রোষ কষায়িত নয়নে চামচার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, কলোপ বিরিক্ষ বস্তুটি কি, খায় না মাথায় দেয় সি আই এ, না আই এস আই অনুসন্ধান কর। অনুসন্ধান কর। উক্ত তদন্তের রিপোর্ট সত্ত্বর প্রেরণ কর আমায়।

হরিদাসী ও অন্নদা ঠাকরেন নিজেদের ভিতর আলাপচারিতায় পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার গভীরে শশীশোভার সাবানে পরিবর্তনের সমস্যাটিকে আলোচনা করিতে করিতে মস্তিষ্কের যাবতীয় কীট বাহির করিয়া ফেলিল।

দিন যায়।

চন্দ্র খন্ডের সাবানে পরিণত হওয়া ও কল্পবৃক্ষের গমনাগমন বিষয়ক কথাবার্তা ক্রমশ বাতাস ভারী করিয়া তোলে।

হরিদাসী ও অন্নদা ঠাকরেন সদৃশ প্রবীণা, অতি প্রবীণাদেরও গাত্র ত্বকে শশাঙ্কখন্ড বুলাইয়া রূপবতী ও শ্বেতাঙ্গিনী হওয়ার ইচ্ছা প্রবলতর হইল 'এক টুকরো চাঁদ' ইত্যাদি বিজ্ঞাপন দেখিয়া। তাঁহারা খন্ডিত চন্দ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুন্দর হইবার ইচ্ছা পঞ্চায়েত প্রধানের মনেও যে জাগিবে তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কী আছে! প্রধানের প্রায় প্রৌঢ়া স্ত্রী শশী টুকরোর নিমিত্ত উদব্যস্ত হইয়া উঠিল।

প্রধান চামচাকে নির্দেশ দিলেন - দ্যাখো, কোথায় খন্ড চন্দ্র মেলে, শীঘ্র লইয়া আইস।

চামচা এই আদেশনামা তস্য চামচাকে পাঠাইল।

তাহার পর একরাতে প্রতি সরোবর, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও নদীমধ্যে কোন মন্ত্র বলে বুঝি বা মায়াদ্বীপ জাগিয়া উঠিল। তন্মধ্যে সেই বাঞ্ছিত বাঞ্ছা কল্পতরু। কল্পনাতরুর শাখা-প্রশাখায় পণ্যের সমাহার। সমস্ত পণ্যই আন্তর্জাতিক। কেনটাকি চিকেন, স্কচ্ হুইস্কি, ফরাসি সুগন্ধি, চীনা সাইকেল, পাদুকা, ব্যাটারি, কোরিয়ার ছাতা, জাপানি ক্যামেরা, টিভি, ওয়াসিং মেশিন --- একেবারে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর হদ্দমুদ্দ। ইহা ছাড়াও কল্পতরুর শাখে শাখে বিদেশি বডি ফ্রেশনার, লিপস্টিক, লিপগ্লস, ময়েশ্চরাইজারসহ নানাবিধ রূপচর্চার সামগ্রী।

সবাই কল্পবৃক্ষ পর্হুছিবার নিমিত্ত পাড়ে জড় হইল ও কোলাহল করিতে লাগিল। নভোমন্ডলে বিষণ্ণ শশী জ্যোৎস্না দানে ছিল অকৃপণ। এক অতি উৎসাহী জলে নামিয়া জল হইতে খন্ড চন্দ্র তুলিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিল সত্য সত্যই বিজ্ঞাপনের ময়েশ্চারাইজার ও ল্যানোলিন যুক্ত সাবান পাওয়া যায় কিনা। সেই সাবান সংগ্রহকারিণী মুহূর্তে তাহার করতলে জল তলদেশ হইতে তুলিয়া আনা সাবান রহিয়াছে দেখিয়া উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল।

তীরে দন্ডায়মান জনতা উল্লসিত কণ্ঠে শ্রবণ করিয়া হর্ষের কারণ জানিতে আগাইয়া আসিতেই দেখিল সেই রক্তমাংসের রমণী পুত্তলিকাবৎ। স্থির। তাহার হস্ত - পদ - বদন - গন্ডদেশ - বক্ষ --- সমুদয় অঙ্গই সাবানে পরিণত হইয়াছে। শক্ত সাবান। সাবানে নির্মিত মনুষ্যমূর্তি।

এরূপ ঘটনা বিভিন্ন জলাশয়ে একই সঙ্গে ঘটিল।

পঞ্চায়েত প্রধান ইহার পশ্চাতে সি আই এ, না আই এস আই জানিবার নিমিত্ত চামচাকে পুনরায় যৎপরোনাস্তি কটু-কাটব্য পূর্বক ধমক-ধামক দিলেন।

বহুজাতিকের প্রতিনিধি আসিয়া শক্ত সাবানে পরিণত রমণী শরীর সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। ইহার নিমিত্ত তাহারা কিছু মূল্য ধরিয়া দিয়াছিল সাবানে পরিণত পরিবারের মানুষজনের হস্তে। বলাবাহুল্য, পঞ্চায়েত প্রধান, তাঁহার চামচা ও তস্য চামচা অবশ্যই এ বাবদ পরিমাণ মতোই দস্তুরি পাইয়াছিল।

ছায়া গণ্ডার

সাধন চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা, মানে মহাত্মা গান্ধী। এখানে তাঁর ছাই ফেলা হয়েছিল। ভস্ম। পূণ্য-পবিত্র দেহাবশেষ গঙ্গার জলে সমাহিত হয়েছিল তাঁর হত্যার পরে-পরেই। হত্যাকারী বেঁচে আছে, হত্যাকারী মারা গেছে - দু'মতই সমান সরব। কিন্তু পূণ্যময় দেশনেতার স্মৃতিতে গঙ্গা পাড়ের এই মনোরম ঘাটটি বৃক্ষ, বন, নির্জনতা ও একটি অনড়-অচল সময়খণ্ডকে বুকে বয়ে, ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় নতুন প্রজন্মকে বিদায় জানায়। সাতটার পর এখানে বসে থাকার নিয়ম নেই। প্রতিদিনই। পাহারাদারদের ছোট্ট চৌকিটা থেকে দুটো লাঠিধারী সেপাই জানান দিয়ে ঘুরে ঘুরে—উঠুন! উঠুন!

তখনি লক্কাপায়রাদের খেয়াল পড়ে ঘড়ির কথা। সত্যিই সাতটার কাঁটা ছুটে চলেছে। সিপাইদের হাঁক, বাঁধানো রাস্তা, নির্জন বাগান, ফুলের কেয়ারি, ওপাশের বিস্তীর্ণ নির্জনভূমির আলো-অন্ধকার ছড়ায়। নদীর ওপরে ভেপার লাইটগুলো জ্বলে; ছোট ছোট ঢেউয়ের মালায় প্রতিফলন ঘটিয়ে রাতের বুকে বিপুল জলস্রোত কোন রহস্যে চলে যায় কে জানে। গাছের জটলা থেকে তখন হুশহাশ দু'একটি বাদুড় দৃষ্টি লাভ করে অন্যত্র চলে যায়। এরপর ঘাটের আলোগুলো সারা রাত জেগে থাকবে শুধু নদীর দূর কোনো অংশের মানুষের কাছে কৌতুহল হয়ে। ঐ-যে! তাই না? সেই ঘাট!

দূর অংশের মানুষটি যদি উড়ে এসে এখানে হাজির হয়, দেখতে পেত সারা রাত ফলকগুলো নির্জনে জেগে আছে, যেখানে উৎকীর্ণ আছে পূণ্যস্মৃতির কথা, উন্মোচনের নাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মুখোমুখি হলে হু হু ত্যাগ, পবিত্র কর্তব্যের একটি অজানা রেশ বুকের গভীরে রিনরিন্ বাজতে থাকে।

সম্প্রতি সেপাইদের হাতে খেটো লাঠির বদলে কাঠের বন্দুক উঠেছে। আজকের ডিউটিতে ছিল পুরুষ ও একজন মহিলা সেপাই। দু'জনই রুটিন মাফিক জানান দিতে এসে সামান্য দূরে নির্জনভূমিতে টহল দিয়ে একটি মেহগনি গাছের আড়াল থেকে ছেলে মেয়ে দুটিকে ধরে ফেলল। ওরা প্রকাশ্য প্রকৃতিতে ভালোবাসা করছিল।

সাধারণত এতদূর টহলের দরকার হয়না। আজ ফুলের কেয়ারির পাশে দাঁড়িয়ে, ফিরে যাবার মুখে পাহারাদার দুজন দূরে একটা মোটর সাইকেলের ভুতুড়ে ছায়ায় সন্দেহবিদ্ধ হয়ে নেমে আসতেই এই কাণ্ড! পার্টনারকে দাঁড়াতে বলে, পুরুষ সেপাইটি সোজা চলে আসে।

বছর কয়েক আগেও রাত দশটা পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতার স্মৃতিময় ঘাটটি দেশের মানুষের কাছে উন্মুক্ত ছিল। দশবছর আগেও, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে কত মানুষ প্রতিদিনের একঘেয়েমি কাটিয়ে গেছে। কত আলোচনা হয়েছে কত সূক্ষ্ম-স্থূল বিষয় নিয়ে।

এখন ঘাটের সামনেই বসেছে পাহারার চৌকি এবং সময় কমে সন্ধে সাতটায় এসে দাঁড়িয়েছে। নানা সাবধানতা নিয়েও সেপাইয়ের অভিজ্ঞতা বিশেষ মধুর নয়। তেমন জটিল ব্যাপার না হলে দশ-বিশ টাকার রফাতে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত থাকবার আইন বলবৎ থাকে কঠোরভাবে।

আজকের ঘটনাটা ঈষৎ জটিল। ছেলেটি অর্ধোলঙ্গ পোষাকে উঠেই পুলিশটাকে মারল ঠাটিয়ে চড়।

মজা? শালা আওয়াজ দিতে পাল্লি না?

মেয়েটিও স্মার্টলি উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে বলে—শকুন! দেবো চোখ গেলে। দেখছিস না বোতাম লাগাচ্ছি?

লজ্জা করেনা, এটা নোংরামির জায়গা? পুলিশটা গালে হাত বোলাল।

ছেলেটি দৃঢ় কণ্ঠে বলে—নোংরামি দেখাস না আর!.... মাসে কত কামাস? নে, কিছু রাখ! কেন উটকো ঝামেলা পাকাচ্ছ বাবা!

চড়-খাওয়া পুলিশটার মর্যাদা ভীষণ আহত। পোশাকের অপমান, রাষ্ট্রের মর্যাদা খাটো হওয়া, উপরন্তু পুরুষ হিসেবে আঁতে তীব্র ঘা। সে ব্যাপরটা টাকায় রফা করল না।

ভিন্ন পরিস্থিতিতে ৫০ বা ১০০ টাকার নোটে এগুলো মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু এখন পুলিশটা বুক পকেট হাতড়ে হঠাৎ দু-দুটো বিপদ সংকেত বাজাতে, গোটা দুই অতিরিক্ত সেপাই স্পটে হাজির।

ফাঁকে ছেলে ও মেয়েটি পোশাকে ভদ্রস্থ হয়ে নিয়েছে। কিন্তু সেপাইরা খুব কম আলোর জন্য চেহারা দুটো স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারছিল না।

অতিরিক্ত সেপাইদের একজন 'কি হয়েছে রে মোহন?' বলতেই মোহন হুকুম দিল —গাড়িটাকে তোরা আটক কর। এবং বাঘের ক্রোধে থাবা মেরে পেছনের কলার খামচে খিঁচে ধরতেই ছেলেটা বলে—জামা ছাড় শালা! কোথায় যেতে হবে বল!

তখন মোহন পেছন থেকে মোক্ষম একটি রদ্দা ঝাড়ল।

শুয়োরের বাচ্চা, ফোর্সের গায়ে হাত?

ছেলেটা দাঁত চিবিয়ে ঝাড়টা হজম করল। তারপরে কলার টানেই হাঁটতে থাকে। ছোট চৌকির আলোতে যখন দাঁড়াল, সেপাইরা রীতিমত বিস্মিত। টকটকে ফর্সা ছেলেটির দামি জিন্‌স—এর প্যান্ট-জামা, আকর্ষণীয় একটি হাতঘড়ি, নিটোল চাঁচা গাল, নীল গোড়াগুলো জেগে আছে এবং পাতলা ও লালচে ঠোঁট। চোখজোড়া ভীষণ ভদ্র ও সুন্দর। বুকপকেটে মোবাইলের মাথাটি জেগে আছে। বয়স বাইশ-তেইশের মতো।

চৌকির অফিসারটি বলে বসুন!

কাঁধ ঝাকিয়ে ছেলেটি চেয়ারটি টেনে সপ্রভ বসে পড়ল।

দেখলে তো ভদ্র ঘরের বলে মনে হচ্ছে? ...সঙ্গেরটি কে?

এবার অফিসারের আঙ্গুল ধরে সবাই মেয়েটির দিকে মুখ ফেরায়।

এতক্ষণ মেয়ে পুলিশের মোটা শরীতে আড়াল পড়ে ছিল।

ছেলেটির মতো মেয়েটিকে খুব পরিশালিত ঠেকছিল না। রোগা, শ্যামবর্ণা, দেহে খুবই মামুলি ধরণের সিল্কের শাড়ি। চটিতে ভেজা কাদার চিহ্ন। তবে চোখ জোড়া ভীষণ উজ্জ্বল। মেয়েটি আস্তে বলে—বাথরুমটা? জিজ্ঞেস করেছিল মেয়ে পুলিশকে, তাই গার্ড দিয়ে সে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

কে হয় আপনার?

ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

অফিসারটি বলে -শুনুন, আপনার মতো স্মার্ট ছেলে বহু দেখেছি। আমার ফোর্সের গায়ে হাত উঠিয়েছেন, জানেন কি শাস্তি এর?

ছেলেটি চুপ করে থাকে।

ফের অফিসারটি দেখেতো ভদ্র শিক্ষিত মনে হচ্ছে?

ধন্যবাদ!

ধন্যবাদ দিচ্ছেন? কেন?

আমি কি সেলফোনটা ব্যবহার করতে পারি?

দেখি!

ছেলেটি যন্ত্রটা তুলে দিতেই অফিসার তাকায়—কোথায় করবেন?

বাড়িতে!

অফিসার এবার ছোট্ট বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু অনুমানের চেষ্টা করে।

ছেলেটি আস্তে বলে — মিছিমিছি ঝামেলা করছেন। কোনো ফায়দা হবে না বরং আলোচনায় বসি আমরা।

আপনারা শিক্ষত ছেলে। কেন যে শরীরে বিপদ ডেকে আনেন!

আমি ফোর্থ ইয়ার মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। বিপদ শেখাবেন না আমায়।

বেশ! কেস দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ছেলেটি এবার ঈষৎ ঘাবড়ায়, কিন্তু মচকায় না। মেয়েটি এর মধ্যে ফিরে এসেছে। অফিসার মেয়ে সেপাইকে বলে — মল্লিকা, ওকে জেরা করো।

মল্লিকা বলে — স্যার, বলছে ওরা সহপাঠী!

কী ডন বাবু? অফিসার চোখ নাচায়।

ডন সুন্দর চোখ তুলে বলে—যা বলার থানায় বলব। আপনার নামটি? ঠিক ঠিক ডেসিগনেশন?

অফিসার খানিক চুপ। তারপর থেমে থেমে কেটে কেটে উত্তর দিল। তারপর নাটকীয় ভঙ্গীতে গলা নামিয়ে বলে—বড় কানেকশন-এর গরমে মেজাজ নিচ্ছেন? আমার ফোর্সের গায়ে হাত দিলেন কেন?

ও আমাদের প্রাইভেসি-তে ঢুকল কেন?

অফিসার মেজাজ হারিয়ে ফেলে— প্রাই-ভে-সি? লজ্জা করেনা? এ-ঘাটের কী ঐতিহ্য জানেন?

কী অপরাধ করলাম?.... ঐতিহ্য থাকতে বাধা দিয়েছে কে?

আপনার লজ্জা হওয়া দরকার।

মোটেই না।... এটাতো ট্যুরিস্ট স্পট-ও বটে। ...একটু লিবার্টি না পেলে তেল পুড়িয়ে আসব কেন? স্রেফ হাওয়া খেতে?

মেয়েটি বলে— প্লিজ ডন! কেন কথা বাড়াচ্ছ এর সঙ্গে? ...উনি পাঠিয়ে দিক থানায় কেস্।

ডন এবার অফিসারের চোখে চোখ রেখে বলে— বাইকটা কিন্তু আপনার হেফাজতে। ডকুমেন্ট দিন।

অফিসার অনেকক্ষণ বসে রইল। একবার শুধু বলল— ফোন করবেন বলেছিলেন? বাড়িতে?... আপনার বাবার পেশা?

এ্যাডভোকেট।..... হাইকোর্টে!

অফিসার কেস লেখার ডটকলমটা টেবিলে খানিক ফেলা-তোলা করল। ফের বলে— আচ্ছা, রুচিতে বাধলনা আপনাদের? ...ঘাটটা কার স্মৃতি ভালো করেই জানেন।

ডন মুখ বাঁকিয়ে —জ্ঞান বন্ধ করুন। এই করেই গ্যাছে দেশটা! স্মৃতি-টিতি কি? কিসে কী হয় শেখাবেন না আমাদের!

বে-শ! আইনের পথেই চলুক সব... ঘোষ কি বলো?

মোহন ঘোষ হল সেই চড়খাওয়া পাহারাদারটা। ভীষণ গজরাচ্ছিল। হঠাৎ ডন উঠে তার কাঁধে হাত দিয়ে আড়ালে টেনে এনে বলে —ভাই, যা হবার হয়ে গেছে। বলেই ৫০০ টাকার একটি গান্ধীমূর্তি গুঁজে দিয়ে বলে— কোনও পুণ্যি-পরিস্থিতি তোমায় দেখবে না...এই কাগজটাই দেখবে ভাই...সব শালাই সুযোগ পেলে ফূর্তি করে!

ঘোষ নরম অথচ অভিমানী গলায় বলে ওঠে — যা কিছু করুন, আড়াল কত্তে পারেন না? চোখের সামনে? চাকরিটাতো কত্তে হবে!

ডন বলে—থানায় পাঠালে বুঝত অফিসার, আমি কে। একঘন্টায় বেরিয়ে আসতাম।

ঘোষ তখন বলে — ফের এদিকে এলে আগে একটু বলবেন...ভালো ব্যবস্থা করে দেব।

দেখা যাক।

ডন এবার অফিসারের সামনে ফের চেয়ারে এসে বসল।

চালান দেবেন, না চলে যাব স্যার?

অফিসারটি চুপ করে থাকে।

ডন তখন গলাটি আরও ভাসিয়ে দিয়ে বলল — স্যার, দেশটা কি আপনারই শুধু? রুচির ঠেকা আপনি একাই কাঁধে চাপিয়েছেন?

মানে?

এই তো বেশ হাল্কা ডিউটিতে রং বেরং-এর ছেলে মেয়ে দেখছেন। ফ্রেস অক্সিজেন পাচ্ছেন। বদলি হয়ে সোঁদরবনের বাঘের ডাক শুনলে বউ-ছেলেমেয়েদের ভালো লাগবে?

হঠাৎ অফিসারটি ফেটে পড়ল— থ্রেট দিচ্ছেন? সেই থেকে চোখ নাচাচ্ছেন? পাবলিক প্লেসে অশ্লীলতা... ঘোষ, ঘোষ, এরা থানায় চালান যাবে।

অবিকৃত ডন বলে — যেখানে খুশি আপনার...।

হঠাৎ মোবাইল টিপে সে কথা বলল এবং ডন শেষ সতর্কবাণী ছোঁড়ে অফিসারটির প্রতি।

অফিসারটি তখন দেয়াল-পিঠ ঠেকিয়ে, ফোনে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলে, ও প্রান্ত থেকে উপদেশ এল ছোটখাট ব্যাপার উপেক্ষা করতে। তোলাবাজ, অপহরণ প্রভৃতির চাপে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, তখন এইসব-এর কোনো মানে হয়না। অফিসারটি তখন দ্বিধায়। কী করবে?

আপনি আমার ছেলের বয়সী। ...কী যে করেন!

অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে নদীর ওপাড় থেকে। অফিসার অনেক চিন্তার পর দেখল মসলিন ফিকে জ্যোৎস্নায় রেণু রেণু ভস্মের কণা ঝরছে চারদিকে। কোনো বাধা নেই কোথাও। অদ্ভুত লিবার্টি! এই ভস্ম ও লিবার্টির জ্যান্ত চিহ্ন হিসেবে চৌকির বাইরে তখন মোটরসাইকেলটি মাটিতে বেঁটে গণ্ডারের ছায়া মেলে চুপচাপ ঠেকানো হয়ে আছে।

তিতলি

স্বপ্না গুপ্ত

মিসেস মালবিকা রায় ইউ এস এ-র সিলিকন ভ্যালিতে এক কমপিউটার হার্ডওয়ার কোম্পানিতে কাজ করেন। গেল দশ বছর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। সম্প্রতি গ্রিনকার্ড হোলডার। মালবিকা সুজাতার পুরনো বন্ধু। দেশে বেড়াতে আসে যখন বন্ধুর সাথে বেশ কয়েকটা দিন কাটিয়ে যায়।

চায়ের টেবিলে দুইবন্ধুর আলোচনা র কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পেনিসিলভেনিয়ার এক পাবলিক স্কুল। এক ছাত্রের গুলি চালানোর রোমহর্ষক ঘটনা। সুজাতা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলে - -- কি নেই ওই দেশটায়! তবু শান্তি নেই। আশ্চর্য। পিস্তল রাখাটা ব্যান্ড করে দিলেই তো পারে। কি রকম ভায়োলেন্স! ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মালবিকা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে ---- বুমেরাং। একেই বলে বুমেরাং, বুঝলি। জীবনটাকে ওরা শুধু দ্যাখে বিজনেস 'পয়েন্ট অফ ভিউ' থেকে। আর্মস্ এ্যামুনিশ্যানের বিজনেসে একটা লবি কাজ করে। ওরা ব্যানড করতে দিলে তো? তোরা ভাল আছিস। অনেক ভাল। আমি তো দেশে ফিরে আসতে এক পায়ে খাঁড়া। ডলি, মলি আর ওর বাবা-ওরা ও দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না।

বন্ধুর কথা শুনে সুজাতার মুখে এক ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে বন্ধুর দিকে পী-নাট মাখানো ব্রেডটা এগিয়ে দিয়ে বলে --- পৃথিবীটা হঠাৎই কেমন ছোট হয়ে এসেছে মালা। ও দেশের ঝোড়ো হাওয়া এ দেশের পুরনো বিশ্বাস, রীতি-নীতি সব ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। মাল্টি-চ্যানেলের এই যুগে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ এ নিয়ে বিস্তর কন্‌ফিউশন দ্যাখা দিয়েছে। ভালমন্দর সীমারেখা দ্রুত মুছে যাচ্ছে। এখন সব কিছু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যায়। কাল তিতলি আসছে। নিজের চোখে দেখিস আমি যা বললাম তা সত্যি কি না। তিতলি সুজাতার একমাত্র মেয়ে। ব্রিলিয়ান্ট। মণিপালে ডাক্তারী পড়ছে। ইনটার্নী। সমানে হাত পা ছুঁড়ছে পাশ করে ইউ এস এ যাবার জন্যে। আমাকে কতবার বলেছে তোকে লিখতে। মালবিকা হেসে বলে ---- তা তোর কি ইচ্ছে শুনি? সুজাতা ম্লান হেসে বলে ---- আমার ইচ্ছেকে কে পাত্তা দেবে? একটু থেমে সুজাতা বলে, কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। নিল না। মণিপাল থেকে বিদেশে যাবার সুযোগ বেশী। ইউ এস এ যাবার হুজুগে মেতেছে। আমার পালা শুধু দেখে যাওয়া। ওর বাবা বেঁচে থাকলে ....। সুজাতা দম নেয়। অবাক হই ভেবে, মায়ের কথা একবারও ভেবে দ্যাখে না! মা একা থাকবে কি করে, একবার ভেবে দেখেছিস - বলেছিলাম একদিন। কি উত্তর দিল, জানিস? বলল, ও সব সেন্টিমেন্টের আমার কাছে কোনও ভ্যালু নেই মা। তুমি কি চাও না আমি আরও উন্নতি করি? বলার মত কিছু একটা এ্যাচিভ করি? এরপর আমি আর কোনওদিন এ

ব্যাপারে কোনও কথা বলিনি। মালবিকা চেয়ে থাকে বন্ধুর মুখের দিকে।

---- তোর সময় কাটাবার সমস্যা কি? তানপুরা নিয়ে বসলেই তো হল। তুই তো তখন অন্য জগতের মানুষ।

সুজাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ---- খুকু যেদিন চলে গেল পড়তে সেদিন অনুভব করলাম আমি বড্ড একা। এখন আর আগের মত রেওয়াজ করতে বসা হয় না। কিছুই ঠিক ভাল লাগে না। উঠে দাঁড়িয়ে মালবিকা বন্ধুর হাতে হাত রেখে বলে, আশ্চর্য তোর আর আমার অদ্ভুত মিল রে। মলি, ডলি আর ওর বাবা যে অন্য জগতের মানুষ। সেন্টিমেন্টস, ইমোশান-এর বালাই নেই। তুই আমার বন্ধু, তোর কাছে কিছুই লুকোব না। ওদের দৌড়ে আমি ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়েছি সুজাতা। তোকে আসল কথাটা বলি শোন --- মাঝে মাঝে ভাবি, আমি আর ওদের কাছে ফিরে যাব না। আমি আমার দেশী সংস্কারী মনটাকে কিছুতেই ঝাঁড়পোঁছ করে ও দেশের রঙ-এ রাঙাতে পারি নি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে রে সুজাতা। টেবিলে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে মালবিকা বলতে শুরু করে --- আমার ফুলের মত সুন্দর ডলি যেন কোথায় হারিয়ে গেল দিনে দিনে। সে ডলি আর নেই। তুই কল্পনাও করতে পারবি না, আমি কি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি। ডলি ওর আমেরিকান বন্ধুদের সাথে পাবে যায়, ডেটিং করে আর ......। মালবিকার উদ্গত কান্নায় গলার স্বর বুঁজে আসে। সুজাতা এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে। মলিও যে ওর দিদির মতই পুরোপুরি পাল্টে যাবে আমি সেও বিলক্ষণ জানি। সুজাতা। আমি বুঝি, ওরা একটা ক্রাইসিস-এ ভোগে। দোষ তো আমাদেরই সুজাতা। প্রদীপন এ দেশে কি খারাপটা ছিল? কি দেয় নি সরকার ওকে? কাঁচা শেকড় উপড়ে নিয়ে গেলাম চারাগাছগুলোকে। মনে পড়ে প্রথম প্রথম কেমন থম্ মেরে গিয়েছিল ওরা। ভেতরে ভেতরে কি পরিমাণ ওদের ভাঙ্গন মূক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল তা এখন টের পাচ্ছি রে। প্রথম দিকে আমি চাকরি করব না বলে জিদ করেছিলাম। কিন্তু কখন যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে যোগ দিলাম। প্রথম প্রথম কড়কড়ে ডলার গুণতে গুণতে হিসেব চলত এক ডলারে কত টাকা। ডলি, মলি প্রথম প্রথম স্কুলে যেতে চাইত না। চেনা জগৎটাকে হারিয়ে ওরা যেন মনের পাখা গুটিয়ে কেমন গুম্ মেরে বসে থাকত। আমার বরের মানসিকতায় অবশ্যি দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ও যেন ভেতরে ভেতরে অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ডলি-মলিও একদিন উঠে দাঁড়াল। সেই শুরু। তারপর থেকে আমার শুধু দেখার পালা। ওরা আর থামে নি। একবারও পেছনে ফিরে বলে না --- মা আমাদের দেরাদুনের ওল্ড সার্ভে রোডের বাড়ির বাগানে নিশ্চয় এখন লিচু হয়েছে, আম হয়েছে। প্রথম প্রথম প্রবাসের দিনগুলো এসব মেদুর স্মৃতিভারে নুইয়ে থাকত। সদ্য ওপড়ানো গাছের মত। সুজাতা! বিশ্বাস কর, দুই মেয়ের মা আমি। মনটা ক্রমশ পাথর হয়ে গেছে। কোনরকম পিছুটান অনুভব করছি না। মলি, ডলি, ওদের বাবা অবিশ্যি চিঠি দিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছে। কিন্তু কিসের টানে ফিরে যাব? আমার প্রয়োজন ওদের ফুরিয়ে ফুরিয়ে গেছে। ওদের অনেক কিছুই আজ আমি মেনে নিতে পারি নি। 'বাধা দেব না' প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে পারি নি। অশান্তি। চেঁচামেচি। ওরা যে আমায় মিস্‌ফিট্ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না সুজাতা। আমার কিরম ভয়

ভয় করে। রাতের পর রাত ভাল করে ঘুম হয় না।

সুজাতা উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুর গা ঘেঁষে দাঁড়ায় --- চল তানপুরা নিয়ে বসি। তোর যন্ত্রণা আমি বুঝছি মালা।

মালবিকা শিশুর মত আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ---- আহ্‌! গান শোনাবি? কতদিন শুনিনি .....। দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে। সুজাতা রাগ 'মারু বেহাগ' ধরেছিল। কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করে সে যেন কোনওমতে টেনে চলেছে। তানপুরা রেখে সুজাতা বলে --- গান আমার শুকিয়ে গেছে রে মালা। আর ভাল লাগছে না। খালি ভাবি তোর মত আমিও যদি মেয়ের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারি? ----- দূর তোকে দেখছি আমার কথা বলে ভুল করেছি। তিতলি ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে। ডলি মলির সাথে ওর তুলনা হয় নাকি?

সুজাতা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলে ---- আছে। মিল আছে, এক জায়গায় ওরা সব সমান। ওরা সবাই স্বার্থপর। সেল্ফ সেন্টারড। কারও জন্যে স্বার্থ ত্যাগ করার কথা ওরা ভাবতে পারে না। তিতলি কি জানে না, তার বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর আমি কত একা? বোঝালাম কলকাতায় পড়াশোনা কর। এখানে ভাল অফার পেয়েও মণিপাল ছেড়ে এল না। বলল কলকাতার সাথে মণিপালের কি তুলনা হয়? ফার্স্ট-ইয়ারে পুজোয় ভাল দুখানা শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। আমার সব আকুতি সরিয়ে রেখে সে কি বলল জানিস? কেন কিনতে গেলে এত দামি শাড়ি? আমি এখন শাড়ি পরি না। মোস্ট আন-কমফারটেবল ড্রেস। প্লীজ মা, শাড়ি-ফাড়ি আমায় পড়তে বোলো না। ওর কি মনে আছে ছেলেবেলায় সরস্বতী পূজোয় আমার ময়ূরকণ্ঠি লুধিয়ানা সিল্কের শাড়িটার জন্যে কি আবদারটাই না করত! মা শাড়ি পরব, শাড়ি পরিয়ে দাও। পেছনে পেছনে ঘুরত সকাল থেকে। মালা তুই বড় ভাল সময় এসেছিস রে। ও দেশের সব অভিজ্ঞতার কথা তিতলিকে খুলে বলিস, যদি তাতে ওর মন ফেরানো যায়।

মালবিকা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। বোঝে সুজাতা ওর কাউনসেলিং চায়।

ওদের ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আর স্বার্থের কথা যদি বলিস, তুই আমি কি নিজের ইচ্ছে, নিজের ভাল লাগা ওদের ওপর চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থ দেখছি না? আসলে কি জানিস সুজাতা, পুরোটাই স্বার্থের খেলা। যাক্‌, ও সব কথা। ওই গানটা শোনা। কি যেন --- 'ঠুমক চলত রামচন্দ্র, বাজত .....।' ---- বাহ্‌ তোর হুবহু মনে আছে দেখছি। সুজাতা হেসে বলে।

মনে থাকবে না? সেবার দিল্লীতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল স্কুল কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলি। মালবিকা স্মৃতিচারণায় ডুবে যেতে চায়। দেরাদুনের সেই খেয়ালী পাহাড়ী নদী। মুসৌরী উপত্যকা থেকে নেমে এসেছে। পাড় ঘেঁষে দু-বন্ধু ছোটবেলায় কত হেঁটেছে আর গান শুনেছে ....। সুজাতা গানটা ধরল। তানপুরার স্বরগুলোয় বাতাসটা যেন হাল্কা হতে শুরু করে।

রাতে দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে আছে। ক'টা দিন কি আনন্দে যে কাটল। সুজাতা অনেকদিন ধরেই কথাটা জিজ্ঞেস করবে করবে ভাবছিল। অবশেষে প্রশ্নটা করল --- মালা, তুই কি সত্যিই আমেরিকায়

ফিরে যেতে চাস না? তোর সংসার, স্বামী, মেয়েরা ......? মালবিকা উত্তর দেয় --- আমি কিছুতেই মন শক্ত করতে পারছি না সুজাতা। আমি জানি, আমি যদি ফিরে যাই, আমারও একদিন এডিথের মত অবস্থা হবে। বেচারি এডিথ্। ওর তো যাবার কোনও জায়গা ছিল না, তাই পড়ে পড়ে ছেলেমেয়ের কাছে মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে হত। তারপর ওর জায়গা হয়েছিল ডেট্রয়েটের মেন্টাল এ্যাসাইলামে। সুজাতা বিশ্বাস কর, ডলি, মলি যেরকম উদ্ধত হয়ে উঠেছে, ওরাও এডিথের ছেলে মেয়ের মত আমায় মেন্টাল এ্যাসাইলামে কোনওদিন পৌঁছে দেবে। তোর কাছে লুকোব না, মা-বাবা-ভাইরা আমার এদেশে থেকে যাবার ব্যাপারটা নিছক পাগলামি বলে মনে করে। যদিও আমি কারও গলগ্রহ হব না। বায়োকেমিস্ট্রিতে কিছু একটা ..... সুজাতার স্বরে এবার দৃঢ়তা ফুটে ওঠে ---

তুই চাকরি করিস। দরকার হলে আলাদা থাকবি।

একা থাকা অত সোজা নারে। আমি বুঝতে পারছি যেমন করে হোক মুখ বুজে ওদের সমাজে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে। একলা থাকার মানসিক দৃঢ়তা আমার নেই। ফিরে যেতে হবে। সুজাতা, দেখি আর একবার শেষ চেষ্টা করে খাপখাওয়াতে পারি কি না।

তিতলির আসার দিন আজ। সুজাতা নিজেই থলি হাতে বাজার করতে গেল। মালবিকাও সঙ্গ নিল। দুই বন্ধুতে মিলে তিতলির পছন্দের নানা ডিশ তৈরি করল। হোস্টেলের রান্না খেয়ে খেয়ে বোধহয় জিভে কড়া পড়েছে। তিতলি যেন সত্যিই তিতলি। সুজাতা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। সেই গোলগাল মেয়েটার কি হাল হয়েছে।

---- ডায়টিং করে স্লিম্ হয়েছি মা। নো রাইস। স্রেফ দু'খানা রুটি, ডাল, স্যালাড্। ব্যাস, আর কিছু খাব না মা। ফ্রুট জুস চলবে।

মালবিকা হেসে বলে তিতলি, মা আর আমি বাজার করেছি। কত কি রান্না করেছে তোর মা। তুই না খেলে মায়ের কষ্ট হবে।

----- আন্টি, আই হ্যাভ্ টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড টু শেড আউট ফ্যাট্। মা আমায় এখানে ওভার ইটিং করিয়ে বস্তা বানিয়ে দিয়েছিল।

দু-একদিন খেলে কিছু হবে না। অ্যান্টি কি মনে করবে! সুজাতার স্বরে আদেশের ভঙ্গী ফুটে ওঠে। তিতলি পাল্টা উত্তর দেয় --- অ্যান্টি কিছু মনে করবে না। আন্টিকে জিজ্ঞেস কর ---- ডলি, মলিও নিশ্চয়ই ডায়টিং করে। প্লীজ মা আমায় ফোর্স কোরো না।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। এক্সকিউজ মী! তিতলি নিজের ঘরে চলে যায়। খানিক পর ও ঘর থেকে ভেসে আসে 'মিস্টার জোন্স, ...মিস্টার জোন্স' গানটা। দুই বন্ধু মিলে গল্প করতে করতে খেতে থাকে। বেশিটাই অবশ্যি দেরাদুনকে ঘিরে ছোটবেলার গল্প।

---- নিজের চোখেই তো দেখলি মা-মাসির সেন্টিমেন্টের কোন মূল্যই নেই ওর কাছে। মালবিকা প্রতিটি রান্নার সুখ্যাতি করে চলেছে। কতদিন পর শুক্তো খাচ্ছি। আহ্। ঠিক মায়ের হাতের গন্ধ যেন।

চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে মালবিকা। সুজাতা মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে। তিতলি আসাতে বাড়ির স্বরলিপি পাল্টে গেছে। গুচ্ছের পপ্ মিউজিকের ক্যাসেট ছড়ানো তিতলির ঘরে। মালবিকা তিতলিকে খুঁটিয়ে দ্যাখে। দ্যাখে তার কার্যকলাপ। পপগানের তালে তালে মাথা নাড়ায়, পা দুলছে। 'কুছ পরোয়া নহি' ভাব ফুটে ওঠে ওর হাবে ভাবে। সুজাতার তানপুরাটা ঘরের কোণে সযত্নে রাখা। ওটাও যেন স্থবির। একটা বিশেষ সময় যেন তিতলির মধ্যে মূর্ত। অ্যান্টি! ডলি মলি খুব ভাল নাচে, তাই না? মালবিকা হেসে বলে হ্যাঁ, ওই তোমার মতই নাচে।

গানের সাথে হাত পা নড়ছে তিতলির। সুজাতা ও ঘর থেকে বন্ধুকে ডাক দেয়। মালা! একটা ভাল সিরিয়াল হচ্ছে, দেখবি আয়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সিরিয়াল শুরু হল। বন্ধ দরজার ওপার থেকে অজয় চক্রবর্তীর উদাত্ত কণ্ঠ ভেসে আসছে। সুজাতা উঠে গিয়ে তিতলিকে গান ধীরে করতে বলে। একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ে তার চোখেমুখে। আজ সিরিয়ালের ১১২ পর্বঃ মনের ঝড় নিয়ে জানবাজারের রাণী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের কুঠি বাড়িতে ছোট ভট্টাচার্যের সঙ্গ অভিলাষে।

আগামী শুক্রবার মালবিকা দেরাদুনে মা-বাবার কাছে চলে যাবে। ওদের সাথে দেখা করে ফিরে যাবে আমেরিকায়। সেদিন রাতেই মালবিকা ক্যালকাটা ফিভারে আক্রান্ত হয়। সুজাতা আর তিতলি মিলে কোনরকমে সামাল দেয় সে রাতটা। পরদিন বিকেল হতেই জ্বর ১০৪''-র ওপর উঠল। সমানে বরফ জলের পট্টি দিতে হচ্ছে। তার পরদিন রাত বারোটা। তিতলি মাকে আশ্বস্ত করে --- তুমি শুতে যাও। আমি রাত একটার ওষুধটা খাইয়ে দেব। টেম্পারেচারও দেখব। তিতলির বরাবরই মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে পড়াশোনা করার অভ্যেস। আন্টির মাথায় এখন জল পট্টি দিচ্ছে আর হাতে আছে মিলসনবুন্‌স। আন্টির কাতরানির স্বরে তিতলি বই রেখে থার্মোমিটার বগলে গুঁজে দেয়। থার্মোফ্লাস্ক থেকে বরফের কুচি বাটিতে নিয়ে জলপট্টি দিতে থাকে। থার্মোমিটারে পারদের অবস্থান দেখে তিতলি একটুখানি বিচলিত হয়ে পড়ে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে। পাশের ঘরে মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্তির প্রলেপে ঢাকা মুখখানি। মাকে ডাকলে ঘাবড়ে যাবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। একটুও দেরি না করে, সে আন্টির গায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে গাউনের বোতাম খুলে দেয়। বরফ জল মাথায় ঢালতে শুরু করে। জ্বরের ঘোরে মালবিকার হুঁশ নেই। দেহখানা নেতিয়ে পড়েছে। সেফ্‌রান ক্যাপসুল জলেগুলে একটু একটু করে চামচ দিয়ে খাইয়ে দেয়। তারপর সমানে জলপট্টি দিতে থাকে কপালে। আধঘন্টার মধ্যে রোগী চোখ মেলে তাকায়। তিতলি ঝুঁকে পড়ে বলে ---- আন্টি আর য়্যু অল রাইট? রোগীর চোখের কোণ বেয়ে কোন এক অজানা কারণে জল গড়িয়ে পড়ছে। রোগী কি যেন বিড়বিড় করে বলতে চেষ্টা করে। তিতলির হাতখানা মুঠিতে বাঁধা পড়ে।

সুজাতার ভোরে ওঠার অভ্যেস অনেকদিনের। সেই ছোটবেলায় 'গলা সাধার' জন্যে বাবা উঠিয়ে দিত। ঘুম ভাঙ্গার পর এক বিরল দৃশ্য চোখে পড়ে, তার তিতলির হাতটা মালবিকার হাতে। তিতলি খাটের পাশে বসে আছে। তার মাথাটা ঢলে পড়েছে মালবিকার বুকের খুব কাছে। বুকের ভিতর জমাট

কিছু হয়ত উথলে পড়তে চাইছে। রাতজাগা তিতলি চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ। আজ এই মুহূর্তে সুজাতা যেন নতুন করে আবিষ্কার করল তার তিতলিকে। এই কি সেই মেয়ে যে মা'কে একলা ফেলে মণিপালে ডাক্তারি পড়তে যাবার জন্য জিদ ধরেছিল? মায়ের কোনও সেন্টিমেন্টেরই যার কাছে মূল্য নেই। সুজাতা আলতো করে তিতলির কপালে হাত রেখে বলে -- তিতলি যাও ভাল করে খাটে শোও গিয়ে। ওঠো মা। তিতলি ধড়মড়িয়ে উঠে হাত ঘড়িটা দেখে। ওহ্ সরি। পাঁচটার ওষুধটা দিতে হবে। তিতলির স্বরে মালবিকা চোখ মেলে। আজ ক'দিন পর তার মুখে হাসি ফোটে। দু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে এক রাশ স্নেহ। আমি ভাল হয়ে গেছি তিতলি। তুমি আমায় ভাল করে তুলেছ। একটু রেস্ট নাও গিয়ে, যাও মা। মালবিকাকে উঠে বসতে সাহায্য করে মা-মেয়ে মিলে। মালা সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলে, "সুজাতা। কাল রাতে একটা কিছু হয়ে যেতে পারত। বারবার একটা মুখ ঝুঁকে পড়ছিল আমার মুখের ওপর। ছোটবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল। ঠিক সেই কষ্ট। সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা। সেদিন মায়ের মুখটা ঝাপসা হয়ে আসছিল। কাল অন্য এক মুখ। বিস্তর মিল। তিতলিকে বুঝতে পারলাম। ও আমার সব ধারণা মুছে দিয়েছে। সুজাতা, ডলি-মলি তিতলিকে চেনা হয়ত সহজ নয় রে। সময়ের হাত ধরে ওদের চিনতে হয়। মালবিকার চোখে এক অদ্ভুত শান্তির আবিলতা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেমে বলে, সুজাতা একটা কথা রাখবি?

-- কি কথা?

-- এখন শরীরটা বেশ ভাল লাগছে। একটু গান শোনাবি?

ঘরের কোণ থেকে ভাঁজ করা তিব্বতী কার্পেটটা বের করে সুজাতা পেতে বসে। বাঃ এই তো চাই। আজ থেকে আবার রেওয়াজ শুরু কর সুজাতা। তিতলিকে নিয়ে তোর কোনও চিন্তা নেই। আমি স্টেটসে ফিরে গিয়ে প্রদীপনের সঙ্গে তিতলির ব্যাপারে কথা বলব। স্পনসরশিপের মনে হয় খুব অসুবিধে হবে না। আর আমি তো রয়েছি।

সুজাতা অনেকদিন পর টানা দু-ঘন্টা গান গেয়েছিল। ও ঘরে তিতলি তখন ঘুমজড়ানো চোখে হয়ত মায়ের গানের কলিগুলো কানে ধরার চেষ্টা করছে। সুজাতা গাইছে -- ফয়েজ খাঁ সাহেবের নিজস্ব একটা বন্দিশ। গানের মুর্চ্ছনায় মালবিকার কেমন ঘোর ঘোর লাগে। সেই একইরকম দানাদার তান, যেমন গাইত বিয়ের আগে ওল্ড সার্ভে রোডের বাড়িতে। আগ্রা ঘরাণার সমস্ত বৈশিষ্ট্য যেন জড়ো হয়েছে সুজাতার তানে, লয়ে। জ্যোৎস্নাময় রাতে শান্ত সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ ভেঙে নতুন ঢেউ তৈরী করে, ওরা তীর বরাবর ছুটেও আসে। সবটুকুই কেমন এক স্নিগ্ধতায় ভরা থাকে, না হলে ঘোরের মধ্যে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। ততক্ষণে ওঘরে তিতলি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। একটা সাতরঙা প্রজাপতি শান্ত হয়ে বসে আছে বুনো ফুলে হলুদ রেণু গায়ে মেখে।

সুখ

অসিতকৃষ্ণ দে

ধর্মদাস অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতেই শিখা একগুচ্ছ কাগজ মেলে ধরে তার সামনে। ভ্রু যুগল কুঁচকে ওঠে ধর্মদাসের। বৌকে বলে, 'কী এগুলো?'

—দেখলেই বুঝতে পারবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ছেলে এগুলো নিয়ে এসেছে। বলেছে 'মা, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বোলো। আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই কোথাও না কোথাও ভর্তি হয়েছে। এই সপ্তাহেই যা করার করতে হবে।' হ্যাঁ গো, বাপ্পা বলছিল এটা না শিখলে না-কি বর্তমানে চাকরী পাওয়া খুব...।

ধর্মদাস হাতের ব্যাগটা যথাস্থানে রেখে কাগজগুলোয় দৃষ্টি বুলোতে থাকে। বিভিন্ন কম্প্যুটার ট্রেনিং সেন্টারের লিফ্‌লেট। একটি করে কাগজে চোক বোলায় আর টাকা অঙ্ক দেখে চমকে ওঠে। কম্প্যুটারের এইসব কোর্স সম্পর্কে তার নিজের কোন জ্ঞান নেই, তবে কাগজগুলো নেড়েচেড়ে বুঝতে পারে এক একটি কোর্স করতে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজারের ধাক্কা। তাদের সময় চাকরীতে ঢুকতে এসবের কোন প্রয়োজন ছিল না। টাইপ বা স্টেনোগ্রাফি শিখলে মোটামুটি চলে যেত। খরচ খুব একটা বেশি ছিল না। এখন দিন বদলেছে, প্রায় সব অফিসেই কম্প্যুটার বসেছে। ফলে কম্প্যুটার জানা লোকের চাহিদাও...।

তার ভাবনার মাঝেই টিউশ্যানি সেরে বাপ্পা ঘরে ঢুকে ধর্মদাসের সামনে এসে দাঁড়ায়। 'বাবা, কাগজগুলো দেখেছো?

— হ্যাঁ। ভালভাবে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

— আমি সব খোঁজ খবর নিয়েছি। আজ কলেজে একজন প্রফেসরের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। হলুদ রঙের যে কাগজটা, ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হব। ওদের কোর্স কেন্দ্রীয় সরকার এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকারের এ্যাপ্রুভড্। পাস করলে প্লেসমেন্ট-এর সুযোগ আছে। তবে সিট সংখ্যা খুবই সীমিত তাই ভর্তির আগে ওরা একটা টেস্ট নেয়। এতে যারা উত্তীর্ণ হয় তারাই ভর্তি হতে পারবে।

—তাহলে তো তোমাকে টেস্টের জন্য তৈরি হতে হবে।

—এই টেস্ট পরীক্ষায় বসতে কোন টাকা পয়সা লাগে না। তাই তোমাদের না জানিয়েই আমি পরীক্ষায় বসেছিলাম এবং উত্তীর্ণ হয়েছি। ভর্তির জন্য ওরা আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে। এরমধ্যে যা করার করতে না পারলে...

—-কত টাকা দিতে হবে?

এককালীন মাত্র বিশ হাজার টাকা। এছাড়া আর কোন খরচ নেই।

'বি-ই-শ হাজার! এতটাকা একসঙ্গে...' ধর্মদাসের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। বাবার অবস্থার কথা বাপ্পা জানে। তাই করুণ মুখে বলে, 'এতদূর এগিয়ে শেষে ভর্তি হতে পারব না?'

ছেলের মুখাবয়ব দেখে কেমন যেন মায়া হয় ধর্মদাসের। আগুপিছু না ভেবে তাই বলে, 'নিশ্চয়ই

ভর্তি হবে। তবে এতগুলো টাকার ব্যাপার আমাকে একটু সময় দে, দেখছি কী করা যায়।'

বাপ্পা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই চায়ের কাপ হাতে শিখার প্রবেশ। স্বামীর প্রতি চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, ' কী গো ছেলের ভর্তির ব্যাপারে কী ঠিক করলে? কোনদিন আমাদের বাপ্পা সেরকম কিছু আবদার করেনি। টিউশ্যানি করে নিজের কলেজের খরচটাও...। এখন সামান্য কটা টাকার জন্য যদি...।

স্ত্রীর কথায় মনেমনে চমকে ওঠে ধর্মদাস। বিশ হাজার টাকা সামান্য! বলে কী ভদ্রমহিলা। কেরানীর চাকরী করে...

শিখা আবার বলেতে শুরু করে --- 'দেখ ছেলের জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। হায়ার সেকেন্ডারীতে চার-পাঁচটা করে মাষ্টার ছিল ওর বন্ধুদের। সেই তুলনায় মাত্র দুটো কোচিং সম্বল করে বাপ্পা...

ধর্মদাস কী জবাব দেবে এসব কথার? সে কী জানে না, ছেলের পড়াশুনার জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন ছিল তা সে করতে পারেনি। কেন, কিজন্য পারেনি এসব বিচার বিশ্লেষণ করতে বসলে কোনদিনই সমস্যার সমাধান হবে না। কত মানুষই তো কতকিছু করতে পারেনা, এ নিয়ে তর্ক তুলে কী লাভ। অযথা কথা না বাড়িয়ে তাই সে অফিসের জামা-প্যান্ট ছেড়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। ছেলের কম্প্যুটার কোর্সে ভর্তির ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে। এতগুলো টাকা সে জোগাড় করবে কী ভাবে? অফিস কো-অপারেটিভ থেকে বড়জোর হাজার পাঁচেক টাকা লোন পেতে পারে। দুটো ব্যাঙ্কে সেভিংস এ্যাকাউন্ট আছে বটে কিন্তু জমার পরিমাণ খুবই হতাশাব্যঞ্জক আর ধারই বা চাইবে কার কাছে? যদি পাওয়াও যায়, মাসে মাসে কিস্তি পরিশোধের পরিমান খুব একটা কম হবে না। সেক্ষেত্রে আবার সংসার চালানো...। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার সন্দীপের কথা মনে আসে। একই অফিসে কাজ করে দুজনে। তার চেয়ে বছর ছয়েকের জুনিয়র। খুব করিৎকর্মা এবং চৌখস। প্রায়শই তার উদ্দেশ্যে বলে, 'সত্যি, তুমি মাইরি দেখালে ধর্মদাসদা! তোমায় কী বলে যে সম্বোধন করব? তুমি শালা একটা আস্ত...। লোকে সেধে টাকা দিতে চাইছে আর সে টাকা তুমি নেবে না বলে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে রয়েচ। কেন-না? তুমি সৎ। স্বর্গে গিয়ে বাতি জ্বালাবে বলে...। এদিকে বৌ-ছেলে- মেয়ে আমোদ আহ্লাদ ভুলে কষ্টে...। অথচ তাদের কষ্ট করার কোনই দরকার নেই। আরে বাবা, বর্তমানে ওসব সততা-ফততার কোন মূল্য নেই। এ যুগে টাকাই সব। যার টাকা আছে সে সব কিছু কিনতে পারবে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে। তোমার যখন বাড়তি টাকা কামাবার সুযোগ রয়েছে, তখন কেন তুমি...

—কী যে বলিস সন্দীপ, টাকা থাকলেই সব পাওয়া যায়?

—আলবৎ পাওয়া যায়। টাকার জোরে খুনের আসামী পর্যন্ত খালাস হয়ে যাচ্ছে। অন্য কিছু তো...। এই যে আমাদের অফিসের রামদা গত বছর রিটায়ার করল, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সৎভাবে থেকে কী পেল বল? মাত্র তিনলাখ টাকা। বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে এখনো দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পর ওর হাতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে? আবার দ্যাখ ঐ একই সঙ্গে

রিটায়ার করে সুবীর দত্ত কী মহাসুখে জীবন কাটাচ্ছে। নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়তে হয়। কেউ...। আরে বাবা, তুমি তো জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কারুর থেকে কিছু ছিনিয়ে নিচ্ছ না, তোমার বুদ্ধি এবং মেহনতের দাম নিচ্ছ। কোন পার্টি যদি খুশি হয়ে তোমায়...

—কিন্তু আত্মমর্যাদা বলেও তো একটা কথা আছে নাকি?

—আরে ছোঃ, আত্মমর্যাদা! ওসব অভিধানের বিষয় বুঝলে। তেমনি টাকা রোজগারের ক্ষেত্রেও সৎ পথ-অসৎ পথ এসব কোন... টাকা টাকাই। এর কোন রং নেই এজন্যই বলা হয় Money Money Money, Sweeter than Honey. অবশ্য তোমাকে এসব কথা বলা বৃথা, তোমার মনে কোন দাগ কাটবে না। —পাগলেও নিজের ভাল বোঝে আর তুমি...। এই যে বৌদি উঠতে বসতে গঞ্জনা দিচ্ছে, আর দেবে না-ই বা কেন? নুন আনতে যদি প্রতি মাসেই পান্তা ফুরিয়ে যায়, কোন বৌ আর...। মাস মাইনে ছাড়াও যদি তার হাতে এক্সট্রা কিছু তুলে দিতে পারতে দেখতে বাড়িতে কেমন ট্রিটমেন্ট পাচ্ছ, বৌদি কেমন আহ্লাদিত...

'তুই এবার থাম তো, তখন থেকে বকবক করে চলেছিস। সকলের বৌ-ই কী তোর বৌ-এর মত না-কি? আমার বউ ওরকম নয়।' ধমকে সন্দীপকে থামিয়ে দিয়েছিল সে।

সন্দীপ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলেছিল, 'টাকার ব্যাপারে সব মেয়েই সমান বুঝলে। কেউ মুখে প্রকাশ করে কেউ করে না। আর শুধু মেয়েরা কেন, তোমার মত কিছু নির্বোধ ছাড়া সকলেই বোধহয়...। সকলেই সুখ চায়।'

সন্দীপের কথা শুনে এবার রক্ত চড়ে যায় ধর্মদাসের মাথায়। রেগে গিয়ে বলে, 'দ্যাখ সন্দীপ, আমার বয়সটা তোর চেয়ে বেশ কয়েক বছর বেশি। আমারও কম দেখা নই। চেনা-পরিচিত কত জনকেই তো দেখলাম। কেউ মোটর ভিহিকেলস্-এ, কেউ সেলস্ ট্যাক্স, কেউ ইনকাম ট্যাক্স কেউ বা অন্যত্র কাজ করত। মাস মাইনের বাইরে সুযোগ থাকায় ঘুষ খেয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করেছে। কিন্তু সংসারে তাদের অনেকেরই চরম অশান্তি-বিশৃঙ্খলা। কারো ছেলে মদ খেয়ে টাকা ওড়াচ্ছে, এদিক ওদিক গিয়ে ফুর্তি করে... আবার কারো মেয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে কোন মস্তানের সঙ্গে... তারপর দু-তিন মাস যেতে না যেতেই বিয়ে ভেঙে আবার...। একে তুই সুখ বলবি না-কি, আমাদের অফিসের মানব রায়, বিশ্বজিৎ বোস এদের জীবন ধারাকে তুই সুখ বলবি: টাকার পেছনে না ছুটে হয়ত এরা ছেলে-বৌ-এর সব সাধ পূর্ণ করতে পারেনি, সংসার অভাব অনটনে জর্জরিত কিন্তু শান্তির বাতাবরণ বলতে যা বোঝায় তা এদের জীবনকে অন্যভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ওদের ছেলে-মেয়েরা কত ভাল। যদি কোনদিন এদের বাড়িতে যাস তো দেখবি এই কন্টগুলিই হচ্ছে প্রকৃত সুখের স্তম্ভ। যেভাবেই হোক বাড়তি টাকা রোজগার করে হয়ত বাহ্যিক সুখ কেনা যায় তাতে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না।

তার কথা শুনে সন্দীপ বলে, 'ঠিক আছে বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। আর কোন কথা তোমাকে বলব না। তুমি বসে থাক দাঁতে দাঁত চেপে।' সন্দীপ তখনকার মত চলে গেলেও ধর্মদাস জানে আবার আগামী কাল কিম্বা দু-দিন বাদে এসে সেই একই টেপ ওর কানের কাছে বাজাতে থাকবে। তাকে

নিজেদের দলে যতক্ষণ না অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে ততদিন ওদের ঠিক...। তাই নানা ভাবে প্রলোভন, প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সন্দীপ মানুষটা খুব ভাল, পরপোকারী।

চান সেরে কলঘর থেকে বেরিয়েই বাপ্পার একেবারে মুখোমুখি ধর্মদাস। —'বাবা, কম্প্যুটার কোর্সে ভর্তির টাকাটা দেবে তো?' বাবার অবস্থার কথা ছেলে জানে। এজন্য বোধহয় সে...। বাপ্পার বিষন্ন মুখ দেখে কেমন যেন মায়া হয় ধর্মদাসের। তাই তাকে উজ্জীবিত করার জন্য আগুপিছু না ভেবেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে টাকার চিন্তাটা তার মাথার মধ্যে আবার জাঁকিয়ে বসে। মনে মনে উপায় অন্বেষণের চেষ্টা চালাতে থাকে সে।

গতকাল সারারাত ভেবেও কোন কুল কিনারা না করতে না পারায় অফিসে কাজে মন বসাতে পারে না ধর্মদাস। চুপচাপ মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। সন্দীপের নজর এড়ায়না ব্যাপারটা। মুখে যাই বলুক না কেন, মনেমনে সে বেশ সমীহ করে ধর্মদাসকে গুটি গুটি পয়ে এগিয়ে এসে ধর্মদাসের টেবিলের বিপরীত চেয়ারে বসে বলে, 'কী ব্যাপার গুরু, তোমার মত কাজের পোকা এমন হাত গুটিয়ে বসে? বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু...।

—হুঁ, না মানে...

তাকে আমতা আমতা করতে দেখে সন্দীপ বলে, 'ঠিক আছে, বলতে মন না চাইলে বোলো না।'

—না, না সেরকম কিছু নয়। আসলে একটা সমস্যায়...

—আরে বাবা, একটু ঝেড়ে কাশ না, যদি সুরাহা করতে পারি।

—আমার কিছু টাকার দরকার। বিশ হাজার। ছেলেটাকে কথা দিয়েছি কম্প্যুটার কোর্সে ভর্তি করে দেব বলে।

—ছোঃ, এটা একটা সমস্যা হল? বিশেষ করে তুমি যে চেয়ারে বসে আছ! ছেলে কম্পুট্যার শিখবে এতো খুব ভালো কথা। আজকাল শুধু গ্র্যাজুয়েট হয়ে কোন লাভ নেই। এ সিদ্ধান্ত কার, তোমার না ছেলের?

—ছেলের।

—বাঃ, খুব বুদ্ধিমান ছেলে তোমার। বাস্তব বোঝে। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার কোন কথাই তুমি কানে নিলে না। তা যদি নিতে ছেলের শিক্ষার জন্য এত চিন্তায় পড়তে হত না। মাস দুয়েক আগে এক সাপ্লায়ার সম্পর্কে তোমাকে একটা ছোট রিকোয়েস্ট করলাম। কোন পাত্তাই দিলে না। কাজটা করে দিলে তোমার কিছু প্রাপ্তিযোগ হত, সেইসঙ্গে আমারও কিছু ...। যাক এবার কী একটা কথা শুনবে? যদি শোনো তো তোমার ছেলের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। বিনিময়ে একটা উপকার তোমায় চোখবুজে করে দিতে হবে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার আয়ত্তাধীন। বল রাজি আছ? গাঁইগুঁই করলে চলবে না।

—আমায় কী করতে হবে না জানলে কেমন করে বলব?

—তা আমি এক্ষুনি বলব না। আগে তোমার ছেলের ভর্তির ব্যবস্থা, তারপর...। তোমার আমার চুক্তি তাহলে ফাইনাল তো? পরে কোন ওজোর আপত্তি শুনবো না। তাহলে কিন্তু...

ধর্মদাসের চোখের সামনে ছেলের করুণ মুখটা ভেসে ওঠে। কথা দিয়েও যদি কথা রাখতে না পারে, তাহলে ছেলের মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। মনে মনে ভাবে এটুকু সাহায্য তাকে করতেই হবে। যুক্তি তর্কে না গিয়ে তাই ঘাড় নেড়ে সন্দীপের কথায় সায় দেয় সে।

বলির হাঁড়িকাঠে তাকে মাথা গলাতে দেখে সন্দীপের উচ্ছ্বাস চাপা থাকে না। উৎফুল্লকণ্ঠে বলে, 'এই তো পুরুষ মানুষের মত...। তোমায় আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। তোমার ছেলের ভর্তির সব দায়িত্ব আমার। আগামীকাল সকালেই তুমি ছেলেকে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে চলে আসতে বলবে। এখন চলি। অনেক কাজ আছে।' মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় সন্দীপ।

পরদিন বাপ্পাকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে আসে ধর্মদাস। তারপর সন্দীপ এলে তার সঙ্গে ছেলের...। কিছুক্ষণ বাদেই বাপ্পাকে নিয়ে সন্দীপ অফিস থেকে বেরিয়ে যায়। ভয়ে ধর্মদাসের মন সিঁটিয়ে ওঠে। দু'দিন বাদে সন্দীপ কী প্রস্তাব দেবে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না তার। এ নিয়ে নতুন এক চিন্তা মাথায় পাক খেতে শুরু করে তার।

ঘন্টা তিনেক বাদে সন্দীপ একাকী ফিরে এসে ধর্মদাসর সামনে দাঁড়ায়। সন্দীপ হাসতে হাসতে বলে, 'তোমার ছেলে এতক্ষনে বাড়িতে পৌঁছে গেছে। বলল—'বাবাকে চিন্তা করতে বারণ কোরো কাকু। আমি ঠিক বাড়িতে পৌঁছে যাব। আসলে কম্প্যুটার কোর্সে ভর্তি হয়ে তোমার ছেলে আনন্দে...।'

সন্দীপ চলে যেতে মনে মনে তারিফ না করে পারে না ধর্মদাস। সত্যিই এলেম আছে বটে লোকটার। যে টাকার চিন্তায় সে কিনা গতকাল সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি, সন্দীপ এত সহজে তার ...। পরক্ষণেই সন্দীপের সঙ্গে তার চুক্তির কথা মনে আসায় সে...। এখন পেছিয়ে আসার কোন পথ নেই। মনেমনে ভাবে উত্তরাধিকার-কে সুখ দেবার জন্য এখন সে পোকায় কাটা নষ্ট মানুষ। যে আত্মমর্যাদা নিয়ে গর্বে মাথা উঁচু করে এতদিন হাঁটতো, তার ধুলায়...। কে তাকে নষ্ট করল? সন্দীপ! কোন বইতে যেন পড়েছিল—প্রত্যেক মানুষেরই পতনের বীজ নিহিত থাকে তার নিজেরই ভেতরে। সে না চাইলে বাইরের কোন শক্তি কখনোই অধঃপাতে পাঠাতে পারে না। ঠিকই। বাপ্পা হয়ত কোনদিন জানতেও পারবে না কোন পরিস্থিতিতে ছেলের ভবিষ্যতের জন্য একজন বাবা তার আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে...।

দারোয়ানের ডাকে চমক ভাঙে ধর্মদাসের। তাকিয়ে দ্যাখে অফিস ছুটি হয়ে গেছে, চারিদিক ভোঁ-ভোঁ। চেয়ার ছেড়ে উঠে অফিসের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। কখন যে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে নিজের মনে এমন তন্ময় ছিল যে জানতেও পারেনি। রাস্তায় ছোট ছোট খানাখন্দ থাকায় চলমান গাড়ির চাকা সেখানে পড়ে কাদা ছিটকোতে থাকে। মনে মনে ভাবে যে আত্মমর্যাদা তার গর্ব ছিল, সেখানেই যখন...... পোষাক বাঁচিয়ে আর কী লাভ?

তার চারপাশে প্রবল গর্জনে ছুটে চলেছে বাস, মিনি, ট্যাক্সি। সেইসঙ্গে হনহনিয়ে হেঁটে চলেছে মানুষের স্রোত। বিশ্বায়নের যুগে সকলেই ব্যস্ত সুখের অন্বেষণে। কেউ নিজের জন্য, কেউ বা পরিবারের...। সে পথ যেমনই হোক না কেন! দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দিশেহারা ধর্মদাস চলমান মানুষের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। তাকেও এখন...। ❑

পদযাত্রা

বীরেন শাসমল

দরজাটা বন্ধ করে দাও–বাবা।

এই তো ত'দের কাম! অন্ধ মানুষটার যে ভিতরে আরেকটা চোখ আছে, তা ত'রা বুঝিস না। দু[illegible] ছেলি--বাপেরে অন্ধ করি রেখি দ্যায়!

ওই চোখ রেখেই বা কি–না রেখেই বা কি! তুমি কি দেখ–তোমার ওই ছোট্টু তোমার জমিতে আগাছার চাষ করতিছে?

একটা প্রবাদে কইছিল না--দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি/সইত্য বলে আমি তবে কোন পথে ঢুকি? সেই লালগঞ্জ থেকি হেঁটি আসতিছে–কম দিন ত' হইল না। ত' পেছনপানে হেঁইটে এসে কী লাভ? ত'রা ত' একটাও লালগঞ্জ করতি পারলিনা।

তোমায় লালগঞ্জের ভূতে পেয়েচে। আমি আসতিছি। দরজাটা বন্ধ ক'রে দে যাচ্ছি।

কেউ এসি ধাক্কালে খুলবোনা। দিনকাল খারাপ।

এত রেতে যাস কোথা?

যাচ্ছি কোথাও।

আমারে নে যা না! আমার সে সেই যাওনের কথা মনে পড়ে–বুধাখালী, চন্দনপিঁড়ি–তো রেতের বেলা যেখন গজেন মালি আসতো–চুপি চুপি

--থামবা? শুন–কেউ তোমারে এসি কিছু জিগ্যাস করলি কিছু বলবনা। বলবা, কোথায় যেছি তুমি জাননা। (ঘর থেকে বেরোয় বড় ছেলে হরিপদ)

দরজাটা খুলে দাও বাবা।

কেরে–ছোট্টু? কোথায় ছিলিরে এতদিন? নাওয়া নাই খাওয়া নাই–ঘর সংসার ছাড়া?

তাড়াতাড়ি খোল। সময় নাই।

(কাঁপা কাঁপা হাতে) দরজা খুলনের যে জোর নাই আমার। সব যে কালে খেয়েছে।

(দরজা খোলে মহিম হালদার)

(ঘরে ঢোকে ছোটছেলে নিরাপদ)

দরজাটা বন্ধ কর। খুলি রেখিছ কেন? আহ্! মরবা নাকি?

আমার দুইট্যা জওয়ান ছেলি থাকতি আমারে মাব কে?

এখন কেউ কারুকে বাঁচাতি পারে না। আহ! দেশলাই জ্বালাও কেন?

আমার ছোট্ট ছেলিটার মুখটা একবার আমায় দ্যাখতে দিবিনা?

তোমার তো চোখ নাই। দ্যাখ্‌বা কী করি?

আছে রে–ভিতরে আরেকটা চোখ আছে। দ্যাখতে পাই তুই কোথা যাস।

কোথা যাই–? অ্যাঁ! আমি কি মুখে চুষিকাঠি নে আছি! কোথা যাই সব-খবর তুমার রাখতি হবে। চোখ নাই তবু এ্যাত্তবড় চোখ!

হাঃ! য্যাখন সবে চলতে শিখেছিলি, ত্যাখন একদিন রাস্তায় ছেড়ি দে দেখি - তুই কাঁটাঝোপের

দিকি হেঁটে যাচ্ছিস – ত্যাখন এক ঝট্‌কায় তোরে টেনি নে আসি। পায়ে কাঁটা ফুটেছে – দাঁত দে' তুলে দেছি – আজ হাত বাড়ালে ব্যথা করে। সে ঝট্‌কায় জোরও নাই। সেই ত্যাখন–লালগঞ্জের পথে এক ঝট্‌কায় গজেন মালির মাথাটা সরায়ে এনিছ। বন্দুকের গুলি তর নাগাল পায়নে–

মেলা কথা ফুঁকোনা তো বাপ্! পায়ের তলায় শিকড় নাই — সে হয় গাছ! এবার আমরা আসছি — তুমাদের পা ফেলার মাটি লে খুব।

তুই ঠিক কস। পায়ের তলাটা কেমন আল্‌গা আল্‌গা ঠেকে।

সে পাও নাই — সে মাটিও নাই। আর জেবনে লালগঞ্জই যাওয়া হবে নে! (হঠাৎ উৎকর্ণ। কান খাড়া করে)

কিসির শব্দ হয় রে ? কার পায়ের আওয়াজ শুনি ? (বেরিয়ে গেছে)

(দরজা খোলার শব্দ।)

আরে এত রেতে আবার দরজা খুলিস ক্যান?

দরজাটা বন্ধ করে দাও বাবা! কেউ শুধোলে বলবা — আমি ঘরে ফিরি নাই।

আমারে তুমি দ্যাখ নাই। একটা কথাও য্যান তুমার মুখ থে না বারায়।

এত রেতে যাস কোথা?

আহ্ ! চুপ!

(উঠে দরজা বন্ধ করে)

হাঃ! একজনায় কয় দরজা বন্ধ রাখ — আরেকজনায় কয় খু্ইল্যে রাখ।

আমি এক হইছি কাক ভুষুন্ডি — বইস্যে বইস্যে দেখতে থাকি এই যাইতে আসা। এ ঘরে আর মাইন্‌ষে থাকে! এর বাঁধন আল্‌গা হইয়া গেসে।

(দরজায় ধাক্কা)

কে —?

চুপ!

অ! হরি?

(উঠে দরজা খুলে দ্যায়)

(ঢুকে) দরজাটা বন্ধ করি দাও।

ত'রা নিজেরাই বন্ধ করস — আবার নিজেরাই খুলস। আমি এ খেলায় নাই বাবা।

বুঢ়া মানুষটারে দিয়া ত'রা এ কী কাম করাইতে লাগস— আমার শরীর চলেনা, হাতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা — বুকের ভেতর যন্তরণা —

অ তুমার অনেক দিনের যন্তরণা — অ কুন ওষুধেই কাম হইব না।

(বাইরে পায়ের শব্দ। হরিপদর কান খাড়া। সে দরজায় কান পাতে)

পায়ের শব্দ হইল মনে হতিছে! নিরু আইলি নাকি?

(হরিপদ বাপের কাছে চলে আসে) এই বাপ, নিরু আইছিল এ্যার মধ্যে? (সে হাপাঁয়)

(বাপকে ঝাঁকায়) এই বাপ — নিরু আইছিল?

আঃ! ত'রা কী করস রে বাপ। নিজির বাপকে ধরি এভাবে ঝাঁকন দিতিছ?

চুপ করি আছ কেন? দালালি করতিছ?

কী কইলি? অ-রে অ হরি— আজ এ্যাতদিন ধরি ত'দের ঘর পাহারা দিতাসি, আমি না এ দরজা

বড্ড ভ্যারিরে বাপ। ভাঙতেও পারবিনে—

নিরাপদ হরিপদ কেউই এখেনে থাকে না!

তুমি একবার দরজা খুলে বেরোও — তোমার ওই আগাছাটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও—

বলেছি না — ওরা কেউ এখেনে থাকে না!

তুমি একবার দরজা খুলে বেরোও — তোমার ওই আগাছাটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও, এখনও বলছি —

আমি একবারই বেরুব। বেরিয়ে লালগঞ্জ যাবো। ভোর হোক। অন্ধকারে যাবো না।

মহিম হালদার ভোরবেলায় এই শহরের পথে এসেছিল। এসেছিল ভ্যানরিক্সায় চড়ে। সে ছিল আগাগোড়া নতুন কাপড়ে ঢাকা। কিন্তু মাঝপথে হরিপদ এবং নিরাপদরা, তাদের দলের লোকেরা, তাকে ছিনতাই এবং পাল্টা ছিনতাই করে। শেষ পর্যন্ত সে নগররক্ষকের হাতে পড়ে। তারা মহিম হালদারকে উদ্ধার করে এবং হাসপাতালের একটি লাল রং- এর ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়।

সংবাদে প্রকাশ তার অর্ধদগ্ধ বাড়িটি নিয়ে হরিপদ এবং নিরাপদ দিনরাত মারামারি ক'রে যাচ্ছে। কেই জানে না, আগামীকাল সে বাড়িটা কার দখলে থাকবে।

থাকলি ত'দের ঘরের চালে খড় থাকত না — দেয়ালের মাটি ধুইয়ে যেত — ত'রা আমার দুই ছেলে-দুই খুঁটি। দুই খুঁটি ত'রা দু'দুদিকে হেলে যাস — আমি ত' মুর্ধুনী — মাঝের মেরুদন্ড — আমি না থাকলি ত'দের এই ঘরগেরস্তি পাতালে ঢুকত — আরে ঘর বাড়ি সাফ সুতরা রাখতি হয়— চাষার য্যামন জমিনে শিক্‌ড়ি বাকড়ি ঘাস ঘেসুলা সোফা করতি হয় ত'দের বাসস্থানও তেম্‌নে -- তবেই না বাসস্থান। ত'রা দুইজনে দিনরাত এই ঘরটারে আ-ঘর রেখি কোথায় যে ঘুরস — দুইজনে দুইজনকে দ্যাখতে পারস না — আর আমারে ক'স দালাল? শোন্ — সেই লালগঞ্জের সময়েতে আমরা জোতদার পুলিসের চরকে বলতাম দালাল। তুই আমারে ওই কথা বলে গালি দিলি — নিজের বাপকে?

এই থামো তো। ওই এক লালগঞ্জ — লালগঞ্জ! যত্তসব পাগলের কান্ড!

(বাইরে এবার জোর পায়ের শব্দ। কথাবার্তার টুকরো শব্দ। দেশলাই জ্বালার শব্দ।)

কে কোথায় আগুন জ্বালে রে?

ওহ্! এই এক হয়েছে — কোথায় কে যায়, কে কী করে সব খবর তার চাই। বুঝস না কেন -- ঘরে আছি যে। ঘরে আছি যে। ঘরে আগুন লাগলে গেরস্তের চিন্তা হবে নে?

(আবার শব্দ। এবার জোরে, দ্রুতপায়ে চলে আসা, দৌড়নোর। মহিম হালদার আকুল হয়ে আলো জ্বালতে যায়। লম্ফের কাছে যেতে হরিপদ এক ঝটকায় লম্ফ সরিয়ে নেয়।)

আলো জ্বালবা না।

ত'রা সব অন্ধকারে থাকবি?

থাকব।

ত'দের অন্ধকারে রেইখ্যে আমি মরি কেম্‌নে?

অনেকদিন ত' মরব মরব করছ — মরেছো একবারও?

ত্যামন করি মরতি পারি কই রে! যদি একবার লালগঞ্জ যেতি যেতি মরতি পারতাম।!

(বাইরে অনেক লোকের পায়ের শব্দ। হরিপদ তড়াক করে ওঠে। বাইরে বেরিয়ে যায়)

দরজাটা বন্ধ করে দাও — (তার আদেশ ঘন, গভীর এবং ভয়ার্ত)

দরাজ খোল।

(রাত খান খান হয়। গাছ গাছালি কাঁপে। ঘর বাড়ি দেওয়াল তৈজসপত্র ইতিহাসের বই মানুষের বুক কাঁপে। গুলির শব্দ হয় কোথাও।)

দ্যাখ দিনি — এ বুঢ়া এ ঘরটারে কেম্‌নে রাখে!

দরজা খোল।

(বৃদ্ধ মহিম হালদার আর উঠতে পারেনা। তার শক্তিতে কুলোয় না। শুয়ে শুয়ে বলেঃ)

তোমরা কারা?

(বাইরে অধৈর্য চিৎকার। ''দরজা খোল'')

এ দরজা আর খোলবেনা।

দরজা খোল বলছি —

কাকে চাই?

নিরাপদকে চাই আমাদের।

ও এখেনে আছে ও। কোথায় লুকিয়ে রেখেছো ওকে? আমাদের হাতে তুলে দাও, নইলে দরজা ভেঙে ঢুকবো।

স্বপ্নের মধুমিতা

কুমারেশ সেনগুপ্ত

মধুমিতাকে দেখার পর থেকেই অরণ্যশ্যামের যেন মনে হয় তার মাথার মধ্যে কেমন যেন এক রিন্ রিন্ শব্দ হয়। বুকের মধ্যে কে যেন ফিস্ ফাস্ করে কথা বলে। সে বুঝতে পারে এ তার এক রকম রোগ। এ রোগ সাতাশের সঙ্গীহীনতার রোগ। সে বুঝতে পারে মধুমিতা তার বুকের মধ্যে নিঃশব্দে গেড়ে বসেছে। অথচ ----

মধুমিতার সাথে তার ক'দিনেরই বা পরিচয়। মাত্র দু দিনের। পরিমলের বিয়েতে এসেছিল মফঃসল শহরের থেকে। সুন্দর ছিম্ছাম্ মেয়ে। টানাটানা বড় বড় সুন্দর দুটি চোখ। পাত্লা গোলাপী দুটি ওষ্ঠ। কপালে কাঁচ টিপ, কিছু নয়। তবু যেন অরণ্যশ্যামের মনে হয় অনেককিছু। সে বুঝতে পারে, তার এ অসুখ তার জাগরনে একরকম আবার নিদ্রায় অন্যরকম। অর্থাৎ স্বপ্নরোগ। সে সেই স্বপ্ন নিয়েই সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, যদি তার দু চোখ ভরে শুধু ঘুম আর ঘুম থাকে। যদি সেই ঘুমের ভিতর থাকে সে আর মধুমিতা।

একটা ছুটন্ত ট্রেন। তার একটা ছোট্ট কামরা। তার মধ্যে শুধুমাত্র তারা দুজন মুখোমুখি বসে। সে আর মধুমিতা। খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে ঢুকছে হাওয়া। বাইরে হাল্কা ফাগুনের জ্যোৎস্নার আলো। যেন সব স্বপ্নময়। আর মধুমিতার ঘন কালো পাত্লা চুলগুলি বার বার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। যেমন হয় কোনো সঙ্গমরতা রমনীর। সেই অবাধ্য চুল অরণ্যশ্যাম বারবার ঠিক করে দেয়। অদ্ভুত এক রমনীয় গন্ধ সেই চুলের ভিতর এসে অরণ্যশ্যামের মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সেখান থেকে শিরা উপশিরা বেয়ে সমস্ত শরীর। সে শুধু মধুমিতার চোখের দিকে তাকায়। যেন ঠিক ভিখারীর মত। সেই দৃষ্টি যেন মধুমিতা বুঝতে পারে। সে একটু হাসে। শব্দহীন হাসি। ঐ হাসি যেন বলতে চায় - 'এখন কিছুই নয়। এ সময় এভাবে খেলা ভাঙ্গতে নেই।' আর ঐ মুহূর্তে যেন মধুমিতা আরো সুন্দরী হয়ে ওঠে। যেন ঠিক জ্যোৎস্না সুন্দরী। আঃ কি সুন্দর। এই সব ব্যাপার। অরণ্যশ্যামের যেন ইচ্ছা করে এই সময় মধুমিতাকে তার দুই করতলের উপর তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চেটে চেটে খেয়ে ফেলে।

হঠাৎ ট্রেনটা একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। ছোট্ট নিরালা স্টেশনে। কোনো গ্রাম অথবা বহু প্রাচীন অবহেলিত আধাশহরও হতে পারে। মধুমিতা ধীরে ধীরে কামরা থেকে নেমে যায়। অরণ্যশ্যাম কিছুই বলতে পারে না। যেন সে বোবা শিশু। মধুমিতা। প্লাটফর্ম। তারপর গেটের বাইরে। ধীরে ধীরে মধুমিতা যেন কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়। ফাল্গুনের হাওয়া, জ্যোৎস্নার আলো সব যেন মধুমিতা নিয়ে গেল। অসহ্য ভয়ংকর গুমোট অন্ধকার।

ট্রেনটা আবার ছুটে চলেছে। গভীর গুহার ভিতর দিয়ে যেন। গুহা পার হয়ে একটা বিরাট পাহাড়। পাহাড়ের পাশে বিরাট খাদ। ট্রেনটা যেন এবার উড়ে যাচ্ছে . . .উড়ে যাচ্ছে . . . মহাশূন্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে । কত উঁচু . . . । একটা বিশাল ঈগলের সাথে যেন ট্রেনটা ধাক্কা খেল। সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সেই ভয়ংকর গম্ভীর খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে . . . পড়ে যাচ্ছে . . . ।

হঠাৎই এভাবেই অরণ্যশ্যামের ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। তার সমস্ত শরীর দিয়ে ঝরতে থাকে ঘাম। সে চারধার একবার দেখে নেয়। নাঃ সে কোনো খাদে পড়ে যায়নি। সে তার প্রিয় বিছানাতেই শুয়ে আছে। সে বুঝতে পারে, আসলে সে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। হাত দুটো ছিল তার বুকের ওপর। ঘুমের ঘোরে বুকের উপর থেকে হাত দুটো সরে যেতেই সে স্বপ্নে ঐ রকম বহু উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে, আবার খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে দেখেছিল। আর মধুমিতা যেন এক অলৌকিক বিশুদ্ধ রক্তপাত।

সে আর স্বপ্নের কথা ভাবলো না। ভাবলেই তার মধুমিতার জন্য মন খারাপ করে। সে শুয়ে শুয়েই জানালার বাইরের দিকে তাকাল। অনেক বেলা হয়ে গেছে। এ সময় তার একটু শুয়ে শুয়ে চা খেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কে তাকে দেবে! সে ভীষণ নির্জন। বাবার মৃত্যুর পর সে বড় একা। মা'কে তার মনে নেই। অরণ্যশ্যাম ভাবে এ সময় যদি তার কাছে মধুমিতা থাকতো, তবে নিশ্চয়ই সে তাকে এক কাপ চা করে খাওয়াতো।

অরণ্যশ্যাম ভাবতে থাকে - মধুমিতা অনেক ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে। স্নানের নানাবিধ সরঞ্জাম নিয়ে গেছে বাথরুমে। রাতের সমস্ত ক্লেদ ধুয়ে মুছে ঝরঝরে হয়ে আবার সে ফিরে আসে। তার শাড়ির খস্ খস্ শব্দ, চুড়ির রিন্ রিন্ আওয়াজ, মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সংগীতের পরিচিত সুরের রেশ, যেন অদ্ভুত সকাল সকাল পরিবেশ। তারপর সব মিলিয়ে এক সূক্ষ্ম প্রসাধনীর গন্ধ। অর্থাৎ এখন মধুমিতা দীর্ঘ লম্বা দর্পণযুক্ত ড্রেসিং টেবিলের সামনে। প্রথমে সে সুন্দর করে চুল আচড়ায়, বড় করে সিন্দুরের টিপ পরে। টিপ পরতে পরতে সে অভিমানের সুরে বলে - তোমাকে রোজ বলি, এক কৌটো ভালো সিন্দুর এনো, তোমার আর সে কথা কিছুতেই মনে থাকে না। অরণ্যশ্যাম ঘাপ্‌টি মেরে বিছানায় পড়ে থাকে। মধুমিতা যেন সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে বলে - 'বাঃ বা কি ঘুম ঘুমাতে পারে মানুষটা।'

একটু পরেই সুইচের কুট্ করে একটা শব্দ। অর্থাৎ মধুমিতা এখন ইলেকট্রিক হিটার জ্বালালো। মধুমিতা ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। কাপ-ডিস চামচের খট্‌খট্ শব্দ। তারপর!

মধুমিতা ক্রমশঃই এগিয়ে আসে তার বিছানার কাছে। হাতে তার গরম চায়ের কাপ। কাপটা মাথার কাছে রাখা ছোট্টো টুলটার উপর রাখে। তারপর?

না, তারপর আর ভাবা যায় না।

নাঃ আর এভাবে শুয়ে থাকা যায় না। অরণ্যশাম উঠে বসে। বালিশের তলা থেকে সিগারেটের

প্যাকেট বার করে। একটা সিগারেট ধরায়। এক বুক ধোঁয়া টানে। জানালা দিবস ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া একফালি রোদ্দুরের মধ্যে ধোঁয়াগুলো আবার ছড়িয়ে দেয়। ধোঁয়া গুলো বন্ধ জায়গা থেকে মুক্তি পেয়ে কিলবিল করে নেচে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে মহাশূন্যের বুকে যায় মিলিয়ে। অরণ্যশ্যাম আবার ধোঁয়া টানে আবার ছাড়ে। এ যেন এক অদ্ভুত মজার খেলা। সে একই সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়ার চঞ্চলতা ও ঘুম ঘুম মৃত্যু মৃত্যু খেলা দেখলো। তার যেন মনে হয়, সে হঠাৎ বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে বুঝতে পারে এ খেলাই জীবনের সত্যিকারের খেলা। এ খেলা প্রত্যেককেই খেলে খেলে যেতে হবে। মানুষ একদিন না একদিন তার বদ্ধভূমি থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছিটকে যাবে। নরম হাঁসেদের মত পাবে চঞ্চলতা, পাবে উষ্ণতা। তারপর গ্রামীণ সন্ধ্যার মত ঘুম ঘুম খেলা খেলে ডুবে যাবে সেই গম্ভীর ঘুমের ভিতর। তারপর একসময় প্রাচীন নক্ষত্রের মত সবাই লীন হয়ে যাবে। যাবে সে, যাবে মধুমিতা। যেমন গিয়েছে হাজার হাজার জানা অজানা প্রেমিক প্রেমিকা। সে বুঝতে পারে - পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানব-মানবী প্রেমিক প্রেমিকা। প্রত্যেক পুরুষেরই আছে একটি করে নিজস্ব রমনী। প্রত্যেক রমনীরই আছে একটি করে একান্ত পুরুষ। সেই পুরুষ, সেই রমনী থাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে। তাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। তাকে সূক্ষ্য থেকে সূক্ষ্যতম অনুভূতির দ্বারাই অনুভব করা যায়। যৌনতাই সব নয়। স্পর্শই সব নয়। যার উর্দ্ধে আছে এক বিশুদ্ধ অলৌকিক রক্তপাত। তাকেই বলে প্রেম, ভালবাসা। মানুষ এরই খোঁজে বার বার পৃথিবীতে আসে, যায়। তারপর একদিন চঞ্চল ঘুম ঘুম, মৃত্যু মৃত্যু খেলা খেলে সবাই লীন হয়ে যায়।

হঠাৎ বন্ধ ঘরের দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় অরণ্যশামের চিন্তা। পাশের ফ্ল্যাটের বিনয় মিত্তিরের গলার ব্যাস্ত স্বর শোনা যায়,- 'শ্যামবাবু, শ্যামবাবু শিগ্‌গিরি উঠুন।'

অরণ্যশ্যাম তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়। বলে -'কি ব্যাপার'? মিত্তির ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলেন - 'পুলিশ, পুলিশ আসছে।'

অরণ্যশ্যাম থমকে যায়। বলে - 'পুলিশ আসছে মানে !'' - হাঁ হাঁ পুলিশ আসছে' ঐ সে এক তলার নরেন গুপ্তর মেয়ে পিকলু, ও আজ ভোরে গলায় দড়ি দিয়েছে।'

'- সে কি ! কেন?'

কি সব প্রেম টেম ব্যাপার শুনলাম। মেয়েটি কাকে যেন ভালোবাসতো। সে আবার কি সব করে টরে মেয়েটার ....

অরণ্যশ্যাম বুঝতে পারে মিত্তির কি বলতে চাইছে। তার কানে আর মিত্তিরের বাকী কথাগুলো যায় না। শুধু তার চোখের উপর ভেসে ওঠে পিকলুর সুন্দর শান্ত মুখটা। বুকের ভিতরটা কেমন যেন তার সুর সুর করে ওঠে। চোখ দুটো ভরে আসে জলে।

' - একটু বসুন।' বলেই অরণ্যশ্যাম মিত্তিরের সামনে চলে যায় বাথরুমের দিকে। দু চোখ থেকে তার ঝড় ঝড় করে ঝড়ে পড়ে তরল পারদের মত কিছু অশ্রু। আর সেই অশ্রুর ভিতর থেকে সে যেন দেখতে পায়, পিকলুর ঝুলন্ত মুখটা ক্রমশঃই তার দিকে এগিয়ে আসছে।

অরণ্যশ্যাম ভয়ে চিৎকার করে ওঠে - 'আ:', তারপরেই সে দুহাতে চোখ ঢেকে বাথরুমের মেঝেতে বসে পড়ে।

অরণ্যশ্যামের চিৎকারটা বিনয় মিত্তিরের কানে যেতেই সে চমকে ওঠে। কি হলো! ও ভাবে চীৎকার করে উঠল কেন! মিত্তির তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজার কাছে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে কান রেখে বুঝবার চেষ্টা করে ভিতরে কি হয়েছে। না: কোনো শব্দ নেই আর। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বিনয় মিত্তির ডাকে, - 'শ্যামবাবু, শ্যামবাবু কি হয়েছে? অমন ভাবে চীৎকার করে উঠলেন কেন?'

বিনয় মিত্তিরের ডাকে অরণ্যশ্যাম একটু সাহস পায়। সে ধীরে ধীরে চোখ থেকে হাত সরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে চোখ খোলে। না: সেই ঝলন্ত মুখটা আর সে দেখতে পাচ্ছে না। মাথার সেই রিন্ রিন্ শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না। অরণ্যশ্যাম বুঝতে পারে এ তার মনের ভুল। মৃত্যুকে সে ভীষণ ভয় পায়।

ওপাশ থেকে অবার মিত্তিরের ডাক শোনা যায় '-- শ্যামবাবু, শ্যামবাবু, সাড়া দিন। কি হয়েছে আপনার!' অরণ্যশ্যাম তার জন্য মনে মনে লজ্জা পায়। ছি: ছি: ও ঘরে মিত্তির বসে, সে কি ভাবলো। অরণ্যশ্যাম নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয় -'কিছু নয়। বসুন আসছি।'

' -- ও:। বলেই মিত্তির দরজার কাছ থেকে সরে এসে আবার যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে।

একটু পরেই অরণ্যশ্যাম চোখে মুখে জল দিয়ে এ ঘরে ফিরে আসে। ওকে দেখে মিত্তির শুধায় - 'ওভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন কেন?'

অরণ্যশ্যাম মৃদু হাসে। বলে -- 'ও কিছু নয়'। যাক্ চা খাবেন?'

' -- তা পেলে মন্দ হয় না।'

' -- তবে একটু বসুন আমি চা তৈরী করে আনি।' মিত্তির হাসে। বলে -- 'এইজন্য বলি মশাই বিয়ে করুন এসব কাজ কি পুরুষ মানুষদের মানায়। যাক্ আপনাকে আর পরিশ্রম করতে হবে না। আমি আমার ঘরেই বলে আসছি।'

অরণ্যশ্যাম বাধা দিতে যায় - 'আরে না না এতে আমার কোনো পরিশ্রমই হবে না।'

'-- থামুন তো।' বলেই মিত্তির ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অরণ্যশ্যাম জানে বিনয় মিত্তির খুব সেন্টিমেন্টাল মানুষ। তাই সে আর বাধা দেয় না।

মিত্তির সুখী মানুষ। বয়সে সে অরণ্যশ্যামের থেকে অন্তত: সাত আট বছরের বড় হবে। কাজ করে ফেয়ারলি প্লেসে। ভালো মাইনে পায়। ঘুষও পায় প্রচুর। ঘরে এক মেয়ে দীপা আর স্ত্রী বীণা। সুখী পরিবার। ভদ্রলোক বউয়ের বাধ্য। দীপা ক্লাস নাইনে পড়ে। গানও শেখে। মিত্তির মাঝে মধ্যে বউ মেয়ে নিয়ে দূরে বেড়াতে যায়।

মিত্তির চলে যেতেই অরণ্যশ্যামের মাথার মধ্যে আবার সেই রিন্ রিন্ শব্দটা যেন শুরু হয়। বুকের মধ্যে কে যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে। অরণ্যশ্যাম বুঝবার চেষ্টা করে সেই কথাগুলো। কিন্তু কিছুতেই সে বুঝতে পারে না। সে নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করে। ঘরের চারধার একবার তাকায়। দেখতে

দেখতে তার দৃষ্টি ঘুরে যায় ড্রেসিং টেবিলের আয়নার উপর। আর তখনই সে ভয়ংকরভাবে চমকে ওঠে। ও কি! আয়নার বুকে যেন সে দেখতে পায় পিক্‌লুর ঝুলন্ত মুখটা তির তির করে কাঁপছে। পিক্‌লুর চোখ দুটি দিয়ে যেন অজস্র দু:খ ঝরে পড়ছে। ঠোঁট দুটি নেড়ে কি যেন বলছে। অরণ্যশ্যাম শুনবার চেষ্টা করে -- হাঁ ঐ-তো, পিকলু যেন তাকে বলছে, -- 'অরণ্যশ্যাম, দেখ আমায় দেখ। আমি ভালবাসার জন্য মৃত্যুকে বরণ করলাম। শুধুমাত্র ভালবাসার জন্য। তুমিও আমার মত ভালোবাসার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো।'

অরণ্যশ্যাম ফিস্ ফিস্ করে বলে ওঠে --'আমি কাকে ভালোবাসি!'

--'কেন আমাকে। তোমার মনে নেই, সেই গত বছর অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলেছিলে -'পিক্‌লু আমি তোমায় ভালোবাসি।' সেই রাত্রে আমি তোমার ফ্ল্যাটে তোমার বিছানায় রাত কাটিয়েছিলাম। অবশ্য তার পরও বহু রাত তোমার সাথে কাটিয়েছি। তবু সেই পুজোর মহাষ্টমীর রাতই ছিল আমাদের প্রথম দিন।'

--'ভুলে যাও সে কথা। ভুলে যাও। আমি তোমায় চাইনি, ভালোবাসিনি। আমার শরীর শুধুমাত্র তোমার শরীরটুকুই চেয়েছিল। তোমার আত্মাকে নয়।'

--'প্রকৃত আত্মাকে কেউ কখনো দেখতেও পায় না। আত্মাকে কেউ ভালোওবাসে না। সবই ঐ শরীর ঘিরে। আর শরীরকে পরিচালনা প্রকৃত আত্মাকে কেউ কখনো দেখতেও পায় না। আত্মাকে কেউ ভালোওবাসে না। সবই ঐ শরীর ঘিরে। আর শরীরকে পরিচালনা করে মন। মনকে চালায় আত্মা। সুতরাং সেদিন তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে। অন্তত: সেই মুহূর্তের জন্য হলেও তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে।'

অরণ্যশ্যাম একটু ভেবে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে -- 'কিন্তু সেই মুহূর্ত আর এই মুহূর্ত তো এক নয়। আর তাছাড়া তুমি আমার কাছ থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়েছো। ভালোবাসা কখনো বেচা-কেনার পসরা হতে পারে না।'

'হ্যাঁ সবই সত্য। কিন্তু সে নেওয়ার মধ্যে তো কোনো বিনিময় ছিল না। ছিল এক নিটোল প্রেমের আব্দার। ভালোবাসা, শরীর এসবের বিনিময়ে তো নয়। আপনজন প্রিয়জনদের কাছেই তো মানুষ হাত পাতে। তুমি তো ছিলে আমার একান্ত আপনজন, প্রিয়জন। আমার সুখ দু:খ, হাসি কান্না, স্বপ্ন দু:স্বপ্ন সবই তো তোমাকে ঘিরেই ছিল। তাই তো তোমার কাছে থেকে আমি সহজভাবে টাকা পয়সা, তোমার দেওয়া উপহার নিতে পেরেছিলাম। আমার আত্মা, আমার মন যে তোমায় ভালোবেসেছিল অরণ্যশ্যাম।

-- 'কিন্তু তুমি গলায় দড়ি দিলে কেন?'

-- 'ঐ যে বললাম ভালোবাসার জন্য।'

-- 'তার মানে আমার জন্য!'

-- 'শ্যাম আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছিলাম। আমাদের সন্তান কর্ণের মত ঐ সমাজে বেঁচে থাকুক এ আমি চাই নি। সে তো আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা তাকে কি আমি ছোট করতে

পারি! পারি না। পারি না তোমাকেও ছোট করতে। তাই তো নিঃশব্দে মৃত্যুকেই বেছে নিলাম। Please অরণ্যশ্যাম চলে এসো, চলে এসো। এখানে আমি তোমায় নতুন করে ভালোবাসবো। আরো আরো আরো গভীর করে ভালোবাসবো। Please অরণ্যশ্যাম চলে এসো, চলে এসো। তোমার ঐ সিলিং-এর হুকে দড়ি বাঁধো। একটা ফাঁস করে সেই ফাঁসটা মাথা দিয়ে গলায় পরে শরীরটা শূন্যের উপর ঝুলিয়ে দাও। তারপরেই তুমি আমার কাছে চলে আসবে।'

অরণ্যশ্যাম ভয়তে ঘামতে থাকে। বুক জিভ তার শুকিয়ে আসে। সে কোনোরকমে বলে -- 'না আমি মধুমিতাকে ভালোবাসি। আমি বাঁচতে চাই।'

এবার যেন পিকলু মৃদু হাসে। জিজ্ঞাসা করে --'মধুমিতা কে?'

--'মধুমিতা আমার বন্ধু পরিমলের শালী। সে খুব সুন্দরী।'

পিকলু যেন খিল খিল করে হেসে ওঠে। শুধায় -- '-- সে কি আমার থেকেও সুন্দরী! সে দিন রাতে কিন্তু তুমি আমার শরীরটাকে চটকাতে চটকাতে বলেছিলে -'আমার চেয়ে ভালো সুন্দরী মেয়ে হয় না।''

--'ঐ সময় ওরকম কথা বলতে হয়।'

--'কেন বলতে হয়?'

--'না হলে তুমি উৎসাহ পেতে না। আমার কাছে তোমার লজ্জা ভাঙ্গতো না,ভয় ভাঙ্গতো না। সে কথা তুমি ভুলে যাও। আমি তোমায় ভালোবাসি না। Please তুমি চলে যাও। আমার ভীষণ মাথার যন্ত্রনা করছে।'

--'আমি মধুমিতাকে হত্যা করবো। তুমি আমার। তুমি মধুমিতার হতে পারো না। তুমি চলে এসো।

অরণ্যশ্যাম চীৎকার করে ওঠে -- না-না।' তারপরেই সে দুহাতে চোখ বন্ধ করে বসে পড়ে।

আর ঠিক সেই সময় মিত্তির এসে ঘরে ঢোকে। হাতে তার দু কাপ গরম চা। অরণ্যশ্যামের চীৎকার শুনে সেও থমকে যায়। ওকি! শ্যামবাবু ও ভাবে দুহাতে মুখ চোখ বন্ধ করে বসে পড়লেন কেন?

মিত্তির তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ দুটো টেবিলের উপর রেখে অরণ্যশ্যামের কাছে এগিয়ি গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে ডাকে- শ্যামবাবু, কি হয়েছে?

অরণ্যশ্যাম চমকে ওঠে --'কে?'-- বলেই সে চোখ থেকে হাত সপিয়ে নিয়ে ফিরে তাকায়। --'ও: আপনি।'

মিত্তির জিজ্ঞাসা করে --'ও ভাবে চীৎকার করে উঠলেন কেন? কি হয়েছে? আপনার চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীর খারাপ করছে নাকি?

-- ' ইস্ এই ঠান্ডার মধ্যেও আপনি কি মারাত্মক ভাবে ঘেমে গেছেন। আপনি একটু শুয়ি পড়ুন আমি ফ্যানটা চালিয়ে দিই। -' কথাগুলো বলেই মিত্তির তাড়াতাড়ি সুইজ অন্ করে ফ্যানটা চালিয়ে দেয়।

অরণ্যশ্যাম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে -'আপনি ব্যাস্ত হবেন না। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। চা এনেছেন?'

-- 'হ্যাঁ। এই যে।' বলেই মিত্তির টেবিলের উপর থেকে একটা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে অরণ্যশ্যামের দিকে এগিয়ে দেয়।

কাপটা হাতে নিয়ে অরণ্যশ্যাম চেয়ারে গিয়ে বসে। মিত্তিরকে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, -'বসুন।'

মিত্তির চেয়ারে বসতে বসতে বলে, --'আপনার কি হয়েছে?'

অরণ্যশ্যাম খুব ধীরে ধীরে উত্তর দেয় -- তা তো জানি না। মিত্তির অবাক হয়। সে কিছুক্ষণ অরণ্যশ্যামের মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে এক সময় জিজ্ঞাসা করে --'ও ভাবে চীৎকার করে বসে পড়লেন কেন?'

অরণ্যশ্যাম খুব ভয়ে ভয়ে বলে --'ও এসেছিল।'

'-- কে এসেছিল!'

'-- পিকলু।'

মিত্তির অবাক হয়। বলে, - পিকলু! সে তো ভোর রাতে মারা গেছে!

অরণ্যশ্যাম বুঝতে পারে নিজের ভুলটা। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে --'না না পিকলু না মধুমিতা।'

'-- মধুমিতা? সে আবার কে?'

'-- না না মধুমিতা না। পিকলু। না না পিকলু না মধুমিতা।

পিকলু, মধুমিতা, মধুমিতা, পিকলু -' কথাগুলো বলতে বলতে অরণ্যশ্যাম অসহায়ের মত কেঁদে ওঠে। --'জানি না মিঃ মিত্তির আমি জানিনা কে এসেছিল। Please আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

মিত্তির অবাক হয়ে যায়। সে কিছুক্ষণ অরণ্যশ্যামের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে -- আপনি চা-টা খেয়ে শুয়ে পড়ুন শ্যামবাবু। একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন। মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্লান্ত।

অরণ্যশ্যাম ধীরে মুখ তোলে। তার চোখ দুটি লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি যেন ঘোলাটে ভাব। সে খুব ধীরে ধীরে বলে, - আমি সত্যিই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

মিত্তির বলে, -- আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমারই ভুল হয়েছে। পিকলুর খবরটা আপনাকে দিয়ে। আসলে মৃত্যুকে আপনি ভয় পান।

অরণ্যশ্যাম মাথা নেড়ে বলে, --'হ্যাঁ। আমার মাও তো গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।'

'-- আমি দুঃখিত শ্যামবাবু। আপনি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন।'

-- হ্যাঁ, আমি একটু ঘুমাবো। -- কথাটা বলেই অরণ্যশ্যাম খাটের কাছে এগিয়ে যায়।

'-- হ্যাঁ ঘুমান। আজ আর রান্না বান্নার ঝামেলায় যাবেন না। আমার ঘর থেকেই আপনার খাবার পাঠিয়ে দেব। আমি এখন আসি। '- বলেই মিত্তির ধীরে ধীরে চিন্তিত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

নেতা যেভাবে তৈরী হয়

সনৎ বসু

নাড়ুগোপাল চক্রবর্তী রেল সুরক্ষা বাহিনীর কনষ্টেবল। ঢ্যাঙ্গা রোগা গড়ন। চ্যাপ্টা গোল মুখে সুপুরির মত কুৎকুতে দুই-চোখ। নাকটা ঈষৎ বাঁদিকে চাপা। ফরসা মুখময় কালো গুড়ি গুড়ি বসন্তের দাগ।

নাড়ুর আদি বাড়ি কালনা।সেখানকার শশিমুখী বালিকা বিদ্যালয়ে ভূগোলের দিদিমণি নাড়ুর বৌ শিউলি। জীবিকা সূত্রে বছরের ন'টা মাস তাকে কালনাতেই থাকতে হয়। দুই মেয়ে নিয়ে নাড়ু থাকে কলকাতায়।

এ পাড়ায় নাড়ুকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। মিথ্যেবাদী, চিটিংবাজ। তার উপর মেয়েছেলের দোষ। বাড়ির কাজের লোক তাই বেশিদিন টেকে না। তবে নাড়ু জব্দ হয়েছিল বুবুনের মার কাছে। ঘর মোছার সময় নাড়ু পেছন দিক থেকে গায়ে হাত দেওয়ায় বুবুনের মা চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করেছিল। ক্লাবের ছেলেরা এসে সবার সামনে 'থ্রেট' করে গিয়ছিল। কিন্তু কথায় আছে না 'স্বভাব যায় না ম'লে'। এরপরও নাড়ুর কুকীর্তির কথা শোনা গেছে নানা সময়।

রেলপুলিশের সামান্য এক কনষ্টেবল হলেও নাড়ু বাড়ি বানিয়েছে দেখার মত। হাজার স্কোয়ার ফুট কভারড এরিয়ার সম্পূর্ণ দোতালা বাড়ি। নিচের তলা ভাড়া দেওয়া।

নানান দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও নাড়ু ব্যবহারে কিন্তু বড়দের দাদা এবং ছোটদের ভাই ছাড়া কথা নেই। পার্টির চাঁদা। পূজোর চাঁদা, ফাংসানের চাঁদা ওয়ান ডে ফুটবল ম্যাচের জন্য চাঁদা—নাড়ু কোনদিন কাউকে খালি হাতে ফেরায় না।

কিন্তু বাড়ির কাজের রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, ওয়ারিং করার লোক, ইটবালি সাপ্লায়ারদের সে টাকার জন্য চরকির মত ঘোরায়। এই পাওনা গণ্ডা নিয়ে কয়েকবার হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। পুলিশের লোক বলে কথা।

পার্টির স্থানীয় নেতা লাল্টু ঘোষের সঙ্গে নাড়ুর খুব খাতির। লাল্টুদাকে দেখলে নাড়ু পারলে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। পার্টির সুখ্যাতি করতে থাকে সমানে। লাল্টু বললেই পার্টির মিটিং এ যায়। নেতাদের বক্তৃতা শোনে। দুবার ব্রিগেড ময়দানেও গেছে।

নাড়ুকে তাই নিজেদের সমর্থক বলেই ভাবে লাল্টু ঘোষ। রাস্তায় দেখা হলেই আলাপ করে।

—কি কমরেড, কেমন আছেন?

—এই দাদা আপনাদের কল্যাণে ভালোই আছি। আপনি?

—ভালো। শুনুন, ছেলেরা যাবে বন্যাত্রাণে সাহায্য তুলতে। একটু দেখবেন।

—ও আপনাকে বলতে হবে না। গ্রাম বাংলার এত বড় বন্যা হল। কেন্দ্র কিছুই দিল না! এ একটা বিচার হল দাদা?

নাড়ুর কথা শুনে লালটু ঘোষ খুশি। সত্যিই লোকটার দরদ আছে পার্টির প্রতি। এরকম লোককে কাজে লাগাতে হবে।

সুযোগ ও এসে যায়। স্থানীয় নাগরিক কমিটির সদস্য হবার জন্যর নাড়ুর নামটি সুপারিশ করা হয়!

পার্টির লোক তার সম্মতি নিতে এলে নাড়ু বেঁকে বসে। রাজনৈতিক ব্যাপার ভেবে কিছুতেই সম্মতি দেয়না। পার্টির লোক যতই বোঝায় নাগরিক কমিটি কোন রাজনৈতিক প্লাটফরম নয়। নাড়ু ঘাড় বেঁকিয়েই থাকে। সরকারী কর্মীর দোহাই দিয়ে সম্মতি পত্রে সই করেনা। ফলে তার নামটি বাদ দিতে বাধ্য হয় পার্টি।

সুকুমারের মুদি দোকান পাড়ার মধ্যে। সকুমারের জামাইবাবু রাজ্য পুলিশে কাজ করে। পোস্টিং হাওড়া থানায়, জামাইবাবু মারফৎ একটি গোপন খবর আসে সকুমারের কাছে। সুকুমারের মাধ্যমে তা চালান হয়ে যায় ক্লাবের বাবলু আর মন্টুর কাছে।

শালিমার ওয়ার্ডেনাইট ডিউটি ছিল নাড়ুর। রাত আড়াইটে। ওয়াগনের দরজা ভেঙ্গে চিনি পাচার হচ্ছিল লরিতে। একটু দুরে দাঁড়িয়ে দালালের কাছ থেকে মোটা টাকা ঘুষ নেবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় নাড়ু। একটু এদিক ওদিক হলে টহলদার রাজ্য পুলিশের গুলিতে প্রাণটাও চলে যেতো।

যথারীতি নাড়ু ও তার সঙ্গী তিন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ যায় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে। চাকরী বাঁচাবার জন্য নাড়ু মরিয়া হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই সময় তার সঙ্গে মোলাকাৎ হয় হরিদাস শাস্ত্রীর। ভেরুয়া দলের হাওড়া জেলা সভাপতি। রেলের উচুঁদরের নেতা। নাড়ু ভেরুয়া দলে যোগ দেয়। অন্যরা চাকরি খোয়ালেও নাড়ু র চাকরি বেঁচে যায়। তার বদলি হয় চিৎপুর ইয়ার্ডে।

সেদিন ক্লাবের রাস্তায় নাড়ুকে পাকড়াও করে মন্টু।

— আরে নাড়ুদা যে, একদম দেখাই যায় না।

— ভীষন ব্যস্ত আছি ভাই।

— শুনলাম আপনি নাকি ওয়াগন থেকে মাল পাচার করেছেন?

— কে ? কে বলল তোমাকে? মুহূর্তে চোখমুখ পাল্টে যায় নাড়ু র।

— কে যেন বলছিল ......। মন্টু মাথা চুলকায়।

— আচ্ছা চলি, পরে কথা হবে। সাইকেল চালিয়ে হন হন করে চলে যায় নাড়ু।

ইতিমধ্যে পৌরসভা নির্বাচন এসে যায়। নির্বাচনে ভেরুয়া দলের সঙ্গে ঘেঁটুফুলের দলের জোট হয়। স্থানীয় পৌরসভার পচিঁশ নম্বর ওয়ার্ডে ভেরুয়া দলের প্রার্থীর হয়ে প্রকাশ্যে প্রচারে নামে নাড়ু।

পাড়ার লোক, ক্লাবের ছেলে, পার্টির নেতা — সবাই অবাক। যে লোক সরকারী কর্মচারী হবার দোহাই দিয়ে নাগরিক কমিটির সদস্য হতে রাজী হয়নি, যে লোক পার্টির সভা সমিতিতে বহুবার উপস্থিত থেকেছে, হঠাৎ কী এমন ঘটল যে সে রাতারাতি ভেরুয়া দলের মত একটা ধর্মান্ধ দলে যোগ দিল।

যাই হোক। ভোট হল যথারীতি। ভেরুয়া দলের প্রার্থী বিপুল ব্যবধানে হার হল। কিন্তু নাড়ু মোটেও হতাশ হল না। দ্বিগুণ উৎসাহে নেমে পড়ল সংগঠন গড়ার কাজে

বছর না ঘুরতেই নাড়ু হয়ে গেল ভেরুয়া দলের উত্তর শহরতলীর সভাপতি। দল গড়ার যথেচ্ছ অর্থ সাহায্য আসতে লাগল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

এ অঞ্চলে কোন শক্তিই ছিল না ভেরুয়া দলের। দিনরাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে একজন দুজন করে সদস্য আসতে থাকে দলে। টাকার প্রলোভন দেখিয়ে আশেপাশের ক্লাবের কিছু ছেলেকেও গোপনে হাত করে ফেলে।

যে নাড়ুগোপালকে কোনদিন পাত্তা দিত না পাড়ার লোক, তার বাড়িতে এখন দিনরাত লোকজনের আনাগোনা। প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠক। আলোচনা। মাঝে মাঝে দলের গাড়ি আসে তাকে নিয়ে যেতে। কখনো গাড়ির কনভয় নিয়ে নেতারা আসে তার দোতলার ঘরে বৈঠক করতে। বেশ একটা সমীহ জাগানো ব্যাপার।

নাড়ুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ান্ত মন থেকে মেনে নিতে পারে না নরেশ পাল। নরেশ আর নাড়ু দুই বন্ধু একই দিনে যোগ দিয়েছিল ভেরুয়া দলে। নরেশকে ভোটেও প্রার্থী করে ছিল দল। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই। দলে নরেশের তেমন গুরুত্ব নেই। নাড়ু ও তার জন্য কোথাও তদ্বির করেনি। উল্টে নরেশ যাতে কোন কমিটিতে ঢুকতে না পারে তলে তলে সেই ব্যাবস্থা করে।

সব বুঝেও নরেশের কিছু করার থাকে না।

দলে যোগ দেবার দু-বছরের মধ্যে নাড়ুর দোতলা বাড়ি তিনতলা হল। দলের পতাকার রঙে বাইরের দেওয়াল স্নোসেম করা হল। ভেতরে মার্বেল, প্যারিস, প্লাস্টিক, অ্যাকোয়া-গার্ড-এলাহি ব্যাপার।

সাধারন কর্মীদের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করল। একটা সামান্য রেলের কনষ্টেবল এত টাকা পায় কোথায়? নরেশ এই সুযোগটাই খুঁজছিল। কানে কানে প্রচার করল দলের টাকা মেরে তিনতলা করেছে নাড়ু।

কিন্তু প্রচারটা দলের উপরতলা পর্যন্ত পোঁছোবার সুযোগই পেল না। কারণ ততদিনে জেলা থেকে রাজ্য নেতাদের সঙ্গেও সম্পর্ক পাকা করে ফেলেছে নাড়ু। তার সাংগঠনিক দক্ষতার কথা দলেও স্বীকৃত।

নাড়ুর ব্যাপার স্যাপার দেখে ক্লাবের ছেলেদের চোখও ছানাবড়া।

— হারামীটা যে সত্যি সত্যিই নেতা বনে গেল রে গোবিন্দ। বাবলু হাসতে হাসতে বলে।

— এটাই তো এখনকার রেওয়াজ গুরু। যে যত বড় চোর, সে তত বড় নেতা। গোবিন্দও হাসতে হাসতে কথাটা ফিরিয়ে দেয়।

— আমরা জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। ফালতু বাপের পয়সায় এম.কম.পাশ করলাম। বাবলু আপশোষ করে।

— কি করে পারবি? তোর যে সামান্য হলেও মান ইজ্জত বলে কিছু আছে। এ শালার যে দুকান কাটা। নইলে আজকের দিনে কেউ ভেরুয়া দল করে? গোবিন্দ বোঝাবার চেষ্টা করে।'

নেতা যেভাবে তৈরী হয়

নাড়ু এখন সত্যি সত্যিই দলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। পকেটে মোবাইল, চারপাশে সব সময় দু-পাঁচজন দলের লোক। সম্প্রতি হিন্দুধর্মের উপর তার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বক্তব্য ঘিরে যথেষ্ট বির্তক তুলেছে বামপন্থীরা।

ইদানিং এক মহিলাকে সর্বক্ষণ নাড়ুর সঙ্গে দেখা যায়। ভদ্রমহিলা দেখতে সুশ্রী, বয়সও খুব বেশী নয়। নরেশের কাছ থেকে জানা যায় মহিলার নাম সর্বাণী ঘোষ। দলের জেলা মহিলা শাখার সহ সম্পাদিকা। ভদ্রমহিলা ডিভোর্সি হওয়ার কোন পিছুটান নেই। তাই সংগঠনের কাজে চাপে সর্বাণীকে নাকি প্রায় দিনই নাড়ুর বাড়ি রাত কাটাতে হয়।

মেয়েদের মারফৎ বিপদের খবর পেয়ে কালনা থেকে ছুটে আসে শিউলি। মহিলাকে বাড়ি আসতে নিষেধ করে। মহিলা তা মানতে না চাওয়ায় শিউলি ঝাঁটা হাতে তেড়ে যায়। নাড়ু বাধা দিতে এগিয়ে আসে। স্ত্রীকে সামলাতে না পেরে বেপরোয়া পেটায়। মার খেয়ে 'বাবাগো' 'মাগো' বলে চিল চিৎকার জুড়ে দেয় শিউলি।

সন্ধেরাতেই নাড়ুর বাড়ি ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে যায়।

— ও নাড়ুদা, কি হচ্ছে ভেতরে? বাইরে আসুন। ক্লাব সেক্রেটারী সুশোভন গলা সপ্তমে তুলে ডাকে।

কোন সাড়া মেলে না বাড়ির ভেতর থেকে। আবার শোনা যায় মার ধরের শব্দ। সঙ্গে মেয়েলি কণ্ঠে আর্তনাদ। নিচে দাঁড়ানো যুবকেরা ক্ষেপে ওঠে। পাচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়তে চায়। সুশোভনেরও গলা চড়ে।

— কি হল, ও নাড়ুদা? বাইরে আসুন, নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। তিন চারবার ডাকার পর দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় নাড়ু।

— কি ব্যাপার ভাই? এত লোকজন কেন?

— নীচে আসুন, কথা আছে? সুশোভনের সংযত গলা।

— কি কথা? আমি এখন ব্যস্ত পরে এসো ভাই।

— ব্যস্ত মানে তো ঘরের মধ্যে নিজের বৌকে ঠ্যাঙানো। আমরা কি, ঘাসে মুখ দিয়ে আছি? তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। মন্টু এবার ধৈর্য হারায়।

— আমার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। নাড়ুর ঠান্ডা উত্তর।

— তাহলে আমাদের আসতে দিন। এভাবে তো পাড়ার ভিতর চলতে পারে না মন্টুর কথার ঝাঁঝ কমে না।

— কাল এসো, আমাকে এক্ষুণি জরুরী একটা মিটিং এ যেতে হবে।

মিটিং না ছাই, এখন ঐ ডাইনিকে নিয়ে অন্য কোথাও যাবে রাত কাটাতে। নেতা হয়েছে। যার নিজের চরিত্রের ঠিক নেই। সে যাবে দেশের ভালো করতে। ভন্ডামী আর কাকে বলে?

শিউলির কণ্ঠ নিসৃত আগুনের ছ্যাকায় নাড়ুর ভেতরের বারুদ আবার উস্‌কে ওঠে। সপাটে এক থাপ্পড় আছড়ে পড়ে শিউলির মুখে।

'উঃ মা' বলে শিউলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিচে।

বাইরে অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ে। অপেক্ষমান যুবকদের মুহূর্তের নীরবতা। তারপরই মার শালাকে বলে চিৎকার করতে করতে বাড়ির ভেতর ঢোকে যুবকের দল।

দরজা খুলে বাধা দিতে এসে উন্মত্ত যুবকদের সামনে পড়ে নাড়ু। বেমক্কা কিল চড় লাথি তাকে রক্তাক্ত করে সিঁড়ির কোণে অর্ধমৃত অবস্থায় রেখে দিয়ে যায়।

নাড়ুকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় নার্সিং হোমে। দলের তরফ থেকে থানায় এফ.আই.আর হয়।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ ভ্যান ঢোকে পাড়ায়। তার আগেই অবশ্য দলবল নিয়ে হাজির ভেরুয়া দলের ছোটবড় মাঝারি নানা মাপের নেতারা। পাড়ার লোকও তখন রাস্তায়। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। পাড়ার পনের ষোলটি ছেলেকে থানায় ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

ঘন্টা না পেরোতেই রাজনৈতিক রং নিয়ে নেয় ঘটনাটা। রীতিমতন পথসভা করে ভেরুয়া দলের পক্ষ থেকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নাড়ুকে মারার অভিযোগ আনা হয়। ঘেঁটুফুলের দলের নেতারাও এই অভিযোগকে সর্মথন করে পথ অবরোধ শুরু করে।

একটি নোংরা পারিবারিক বিরোধকে রাজনৈতিক রঙ চড়ানোর ঘৃণ্য অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বামপন্থীরাও প্রচার আন্দোলনে সামিল হয়।

ঘোলা জলে মাছ ধরার সুবর্ণ সুযোগটা বাগে পেয়ে নাড়ুকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে মাঠে নেমে পড়ে নরেশ।

নরেশকে সঙ্গে নিয়ে শিউলি একে একে উচ্চতর নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে। লিখিত অভিযোগ জানায়। স্বামীর নারী সঙ্গের কয়েকটি আপত্তিকর ফটো প্রমান স্বরূপ পেশ করে । হাজার চেষ্টা করেও এবার আর নাড়ু নিজেকে বাঁচাতে পারে না। বিষয়টির সত্য উদঘাটনের জন্য দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরী হয় দলের পক্ষ থেকে।

এক মাসের মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এবং তাতে নাড়ু দোষী সাব্যস্ত হয়। শাস্তি স্বরূপ দলের সমস্ত নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারিত হয় নাড়ু।

দলের এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে নাড়ুও আসরে নামে। শেষমেষ শৃঙ্খলাভঙ্গ করার জন্য নাড়ু দল থেকে বিতাড়িত হয়।

কিন্তু নাড়ুও সব কিছু মুখ বুঁজে মেনে নেবার পাত্র নয়। নেতৃত্বকে শিক্ষা দিতে সে গোপনে যোগাযোগ করে ঘেঁটু ফুল দলের জবরদস্ত নেতা সত্য পাহাড়ীর সঙ্গে। দু তিনটি বৈঠকের পরই নাড়ু ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে।

সপ্তাহ পার না হতেই নাড়ু সর্বাণীসহ নিজের তিনশো অনুগামীদের নিয়ে ঘেঁটুফুলের দলে যোগ দেয়। এবং কী আশ্চর্য। মাস না ফুরোতেই নতুন দলের অন্যতম সম্পাদকের পদ পেয়ে যায় নাড়ু। নতুন পদের মর্য্যাদা রাখতে নাড়ুও নিজেকে উজাড় করে দেবার শপথ নেয়।

ফলতঃ ঘর থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয় শিউলি। মেয়েরা বাবার এই অ-ায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করায় তাদেরও মায়ের সঙ্গী হতে বলা হয়।

নাড়ুগোপাল চক্রবর্তী এখন বহাল তবিয়তে আছেন। মদ, মেয়েছেলে, তহবিল তছরূপ কিছুই তার বন্ধ হয়নি। সম্প্রতি তাকে নিজ দায়িত্বের সঙ্গে দলীয় মুখপাত্রের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সে কারণে দবুদর্শনের পর্দায় প্রায়ই তার শ্রীমুখটি দেখতে পাওয়া যায়।

রথীন স্যার

সুনীতি মালাকার

লেভেল ক্রসিংয়ের মরছে ধরা লম্বা পাইপটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ওপরে উঠতেই রূপনগর চৌমাথা ব্যস্ত হয়ে উঠল। থেমে থাকা গাড়ি, রিক্সা, ভ্যান আর সাইকেলের রেল লাইন পার হওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রূপনগর লেভেল ক্রসিংয়ের মোড়েই দাঁড়িয়েছিল সুবীর। সুবীরকে ঘিরে নাসির, কমল, তাপসরাও। অনন্ত'র দোকান থেকে দুটো ডাবল হাফ চা নিয়ে, চুমুক দিতে দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মন্ত্রীত্ব পাবে কি পাবে না এই নিয়ে তুমুল তর্ক করছিল। এমন সময়ে সুবীরের কোমরে রিভলবারের মত করে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সি এল আই গ্লাসে ভেসে উঠল সম্রাটের নাম্বার।

—কি হল?

—কি হল মানে? তুমি, সুবীরদা, রূপনগরের বহু যুদ্ধের নায়ক, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নয়নের মনি, আর তুমি কিনা জিজ্ঞেস করছ, কি হল?

—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করছি — ভ্যানতারা না করে যা বলার বলে ফেল...

—তার মানে তুমি কিছুই খবর রাখ না।

—রাখি না। মাল্লু পাওয়া যাবে না এমন কোন খবর রেখে লাভ কি?

—লাভ? আছে দাদা, লাভ আছে — খবর রাখলে মাল্লুর রাস্তাও তো পেয়ে যেতে পার।

—ঠিক বলছিল?

—আলবৎ। গিয়ে দ্যাখোই না, আজই ম্যানেজিং কমিটি আর হেড মাস্টার ওই টিচার রথীন সেনকে স্কুলে ডেকেছে। আজই ওর হাতে চেকটা তুলে দেবে...

ঠিক আছে বুঝলাম। বুড্ডার কপাল তাহলে খুলল... সুবীর মোবাইল ফোনটা খাপে ঢোকাতে নাসিরকে বলল, তোর স্কুটারে স্টার্ট লাগা। রূপনগর স্কুলে যাবো। স্কুলে যখন পৌঁছালো ওরা দুজন, তখন সদ্য ডব্লিউ. বি. সি. এস পাশ করা স্কুলের সম্পাদক মশাই আবেক-তাড়িত কণ্ঠে বলে চলেছেন, আজ, আমাদের কাছে একটা ঐতিহাসিক দিন। আমরা শেষ পর্যন্ত রথীন স্যারকে পেনশন দিতে পেরেছি। এক যুগ আগে রথীন স্যার এই স্কুলের ছাত্র পড়ানোর কাজ শেষ করে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা পারিনি ওঁকে ওর বিধিবদ্ধ পাওনা, পেনশন পাইয়ে দিতে। তবু মন্দের ভালো, শেষ পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে আজ রথীন স্যার পেনশন পেলেন...

কথা শেষ হতে না হতেই স্কুলের অন্তত তিরিশজন শিক্ষক হাততালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেন। তারপর স্কুলের হেড মাষ্টার বিষ্ণুবাবু একটা প্লাস্টিক খামে মুড়ে একটা চেক তুলে দিলেন রথীন স্যারের হাতে। রথীনস্যার বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীরটাকে কোনোমতে টেনে তুলে সোজা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। পেছন থেকে একজন শিক্ষক বলে উঠলেন, দাদা, চেকটা একটু সবাইকে দেখান। রথীন স্যার স্কুল ছাত্রের মত হাতটা উপরের দিকে তুলে চেকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগলেন। আবার

রথীন স্যার

হাততালিতে স্কুলের ঘুলঘুলিতে বসে থাকা পায়রারা ভয় পেয়ে পাখা ঝাপটাতে শুরু করল। রথীন স্যার বসে পড়লেন। ওঁর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। হেডমাস্টার মশাই বিষ্ণুবাবু এগিয়ে এলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। খুবই নরম গলায় অনুরোধ করলেন, মাস্টারমশাই চা খেয়ে যাবেন কিন্তু.... সুবীর আর নাসির দরোজার বাইরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে সবটাই দেখল। দেখতে দেখতে মনে হল, সংসারহীন, এই বৃদ্ধ রথীন স্যার টাকা নিয়ে কি করবেন? ঘর নেই, সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই, সমাজ নেই লোকটার। একসময় ছাত্র পড়াতেন। অবসরের পর পেটের তাগিদে, অসুস্থ শরীর নিয়ে রূপনগর স্টেশনের প্লাটফরমে ঠাঁই নিয়েছিলেন। শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক, অনেকটা পাগলের মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত রথীন স্যার টাকা দিয়ে কি করবেন। আচ্ছা কত টাকার চেক ওটা? বিড়বিড় করে নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখলো সুবীর। করিডোর দিয়ে বেরোতে গিয়ে হেড মাস্টার বিষ্ণুবাবু সুবীরের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন। হাসলেন। সুবীর জিজ্ঞেস করল স্যার, কত টাকার চেক দিলেন স্যারকে? এক লাখ টাকার চেক আপাতত। পরে আরও তিন লাখ পাবেন। বলতে বলতে চলে গেলেন বিষ্ণুবাবু।

রথীন স্যার স্কুল গেট পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালেন। ঘামছেন। বুকের কাছটা খচখচ করছে। অনেক পুরানো ঠিকানা লেখা কাগজ সমেত একলাখ টাকার একটা চেক কি অসম্ভব উত্তাপ ছড়াচ্ছে। লাঠিটা শক্ত করে চেপে ধরলেন তিয়াত্তর বছরের রথীন স্যার। স্কুল চত্বর ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। খোলা আকাশের দিকে মুখ তুললেন। মেঘ ভাঙা রোদ্দুর থৈ থৈ করছে চারদিকে। আজ একি আলোর ঝলকানি! অদ্ভুত আবেগে স্পন্ডলাইসিসে আক্রান্ত ঘাড়টা সোজা করতে চেষ্টা করলেন। স্কুলের সামনে ছাতিম গাছের তলায়, চায়ের দোকানে বসে একটা বিড়ি ধরালেন। জল খেলেন। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রথীন স্যার একটু আনমনা হয়ে পড়লেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে একদিন তৃণার সঙ্গে অনিন্দ্যের মেলামেশা নিয়ে তর্ক হয়েছিল। তৃণা ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল অনিন্দ্যের সঙ্গে। আর কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখেনি তৃণা। দারুণ কষ্ট পেয়েছিল রথীন। কষ্ট পেতে পেতে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়া ছেড়ে দেয়। শুধু নিজের ঘরের লাইব্রেরীতে বসে বসে তৃণার কথা ভাবত। টুকরো টুকরো ছবি। তৃণার কথা ভাবতে ভাবতেই একদিন ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল। নাহ্, তৃণার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। নাহ্, তৃণার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ঘর ছেড়ে, নদী পেরিয়ে এই রূপনগরে একটা মাটির ঘরে এসে উঠেছি রাজ প্রাসাদের মত বাড়ির স্মৃতি পিছনে ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরা ছাত্রদের একজন হয়েও নিজেই অজ্ঞাতবাসে চলে এসেছিল। শুরু হয়েছিল ছাত্রপড়ানো। তারও অনেকদিন পরে রূপনগরের হাইস্কুলে বিজ্ঞান পড়ানোর চাকরি নিয়েছিল।

বিজ্ঞান পড়াতেন, অঙ্ক করাতেন রথীন স্যার-কিন্তু আশ্চর্য্য কি অনর্গল ভাবেই রোমিও জুলিয়েট থেকে ডায়ালগ বলতেন...। অনেককাল আগেকার কথা সেসব। কতকাল? নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন রথীন স্যার। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তো হবেই, স্মৃতির দরিয়ায় ভেসেই চললেন রথীন স্যার....

পূর্ববাংলা থেকে তখনও মানুষজন আসছিল। রূপনগরের ষ্টেশনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বসতি। জনসংখ্যা বাড়ছিল। রূপনগর স্কুলের ছাত্রও বাড়ছিল। ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছিলেন রথীন স্যার। সকাল

সন্ধ্যে ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ানো। দুপুরে স্কুল। আর একটু বেশি রাতে গমগমে গলায় শেক্সপিয়র আবৃত্তি করেই দিন চলে যাচ্ছিল রথীন স্যারের। কোনো অভিযোগ ছিল না। বেতন পান আর না পান ছাত্রদের পড়িয়ে ভুলে থাকতেন নিজের অতীত, ভালবাসা, স্বপ্ন। --- এইসব সাত পাঁচ ভাবছিলেন রথীন স্যার। ঠিক এই সময়ে একটা ম্যাটাডর ৪০৭ ট্রাক এসে থামল ওই ছাতিম গাছ তলায়। হৈ হৈ করে উঠল সম্রাটের দল। ওই তো, ওই তো স্যার! লাফিয়ে নামল ছেলেরা। সবুজ আবির উড়িয়ে দিল। একটা ব্যাটারি সেট মাইক্রোফোনে দিয়ে চিৎকার করতে লাগল সম্রাট। বন্ধুগণ, আজ আমরা আনন্দিত। রথীন স্যারকে সরকার পেনশন দিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা ছাত্রপরিষদ কর্মীরা স্যারের পেনশনের জন্য ধর্ণায় বসেছিলাম। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর অবরোধ করেছিলাম। জেলে গিয়েছিলাম। আমাদের বক্তব্য একজন শিক্ষক চাকরি থেকে অবসর পাওয়ার বারো বছর পরেও কেন পেনশন পাবেন না? কই রাজ্য সরকারের কর্মীদের তো এ হাল হয় না। আমাদের ভাবতে লজ্জা লাগে --- একজন শিক্ষামন্ত্রী, একজন শিক্ষাসচিব, একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক বা হেডমাষ্টার---সবাই তো একদিন শিক্ষকের কাছে পড়েছেন। শিক্ষা নিয়েছেন। অথচ মাষ্টারমশাই অবসর নিলে তাঁর পেনশন নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই। শিক্ষককে তাই শেষ বয়সে অনাহারে মরতে হচ্ছে। চালচুলোহীন ভাবে ষ্টেশনে থাকতে হচ্ছে। আমরা খুশি, অন্তত একজন রথীন স্যারের কাছে সরকার মাথা নিচু করেছে। ছাত্রপরিষদ নেতাকে ঘিরে দাঁড়ানো কর্মীরা ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে কোমরটাকে ভেঙে, পপ আর ভাঙরার মিশেল ঘটিয়ে চিৎকার করছে--- রথীন স্যার যুগ যুগ জিও, রথীন স্যার যুগ যুগ জিও। রথীন স্যার তো অবাক। কথা বলতে পারছে না। চোখের কোণে পিঁচুটি পেরিয়ে নেমে আসছে শুধু জল।

ইতিমধ্যে সম্রাটের দলের সঙ্গে মিশে গেছে সুবীর আর নাসিরও। সম্রাট, রথীন স্যারের দিকে এগিয়ে এলো। সঙ্গে সুবীর ও নাসীর। পিছনে যুগ যুগ জিও শ্লোগানও চলতে থাকল। সম্রাটই শুরু করল, স্যার চলুন আপনার অপরিস্কার মুখটা একটু সাফ সুতরো করে নেবেন। আজ আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা দেব। সুবীর আর নাসিরও বলল চলুন স্যার। আপনাকে এভাবে মানায় না।

চুল দাড়ি কাটিয়ে সম্রাটের দেওয়া ধুতি পাঞ্জাবি জুতো পরে মাষ্টার মশাই রিকসায় চাপলেন। পিছনে ছাত্রপরিষদ কর্মীরা শ্লোগান শ্লোগানে রূপনগরের মাটি কাঁপিয়ে দিল।

রূপনগর ষ্টেশনে তিনরঙা কাপড় দিয়ে মোড়া ষ্টেজ বানিয়ে রথীন স্যারকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। ফুলের মালাও পরানো হল। রজনীগন্ধার গন্ধেও একদা সিনেমার নায়কের মত রূপবান রথীন স্যারের চোখের কোণের জল বাঁধ মানল না।

নতুন বেশে ফিরে এলেন রথীন স্যার। সেই রূপনগরের ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের ভাঙাচোরা একটা বেঞ্চিতে। নতুন জামা জুতো পরেই শুয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙলো যখন তখন বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

গঙ্গার পাড়ে এই সময় রূপনগর অন্যরকম হয়ে ওঠে। স্টেশন চত্বরে রঙের মেলা শুরু হয়। অদ্ভুত মায়াময় লাগে তখন রূপনগর। এই বিকেলেই প্রতিদিন কেয়া রথীন স্যারের কাছে টিফিন নিয়ে আসে। রথীনদাদুর সঙ্গে খানিক গল্প করে চলে যায় সুবীরের জন্যে। সুবীরও মাঝেমাঝে তাই আসে।

এদিন একসঙ্গে এলো দুজনে। কেঁয়া রথীন স্যারকে নুতন পোষাকে দেখে খুশি হল। নিজের হাতে একটা পেয়ারা কেটে দিল। সুবীর কথা শুরু করল। স্যার, এতগুলো টাকা দিয়ে কি করবেন; আপনি তো আবার লোকের দুঃখ শুনলেই টাকা পয়সা দিয়ে দেন। আমাকে দেবেন?

রথীন স্যার চুপ করে থাকেন।

-- কেয়া ধমক দেয়, কি যে বল না... দাদুর টাকা তুমি নেবে কেন?

- আমি নেব কেন? স্যারকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব।

-- আগে নাও তো...

-- নেবই তো। এখন আর কিছুতেই স্যারকে এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না।

-- এতকাল কোথায় ছিলে?

— বাহ, তোমার বাবার মাস্টারমশাই। তোমরাও তো পারতে স্যারকে বাড়ি নিয়ে যেতে...

— পারিনি···দাদু যেতে চায়নি।

---- এবার আমিই নিয়ে যাব।

-- কোথায় রাখবে? তোমার বাড়িতে?

-- বাড়িতে রাখব কীভাবে। ওই তো অতটুকু বাড়ি। ঘরও নেই।

— তবে?

— আমার পার্টি অফিসটা তো ফাঁকাই থাকে। সেখানে রাখব। রথীন স্যার শুনছিলেন সব কিছু। পার্টির অফিসের কথা উঠতেই বললেন, থাক থাক। আমি কোন পার্টি অফিসে যাব না। তোমরা এখন যাও তো.... সুবীর আর কেয়া চলে যেতে যেতে তর্ক জুড়ে দিল।

— আচ্ছা কেয়া তুমি আমার সব প্ল্যানকে এভাবে আক্রমণ কর কেন?

— আক্রমণ কোথায়? তুমি আজ হঠাৎ আশ্রয়দাতা হয়ে উঠলে। এতকাল তোমার চোখ পড়েনি একজন শিক্ষক যে কিনা তোমার দাদা-কাকাদের পড়িয়েছেন ... সেই মানুষটা রোদে, জলে, ঠাণ্ডায় বছরের পর বছর পড়ে আছে—কেউ দেখার নেই...আর আজ তুমি বলছ ওকে নিয়ে যাবে। কেন ঐ টাকার জন্য?

—কি যা তা বকছ?

—যা তা নয়—ওটাই ঠিক...

—দ্যাখো সব কথারই খারাপ মানে করতে নেই...

—খারাপ মানে করতে নেই মানে? তুমি যা খুশি করবে আর তা মেনে নেব? সুবীর ওকে থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেয়া থামলো না। সুবীর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, নো প্রবলেম। নো প্রবলেম। একটা সুজুকি সামুরাই আমার চাই। তাই টাকাও চাই। তারপর কেয়ার দিকে ঘুরে, খপ করে কেয়ার হাতটা চেপে ধরল। কেয়া কতদিন ভেবেছি তোমাকে আমার বাইকের পিছনে চাপিয়ে অনেক দূর চলে যাব... কিন্তু নানা ছল্লিবল্লি করেও বাইকটা কিনে উঠতে পারিনি।

রথীন স্যার পেনশন পেয়েও তাঁর ঠিকানা বদলালেন না। পেনশনের টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে রূপনগর

ষ্টেশনে কাগজ পুরে তোষক তৈরি করে সারা দিন, সারারাত কাটিয়ে দেন। রূপনগরের ষ্টেশন মাষ্টার বিব্রত হলেন। স্থানীয় শাসক দলের অন্যতম নেতাও একদিন এসে বলে গেলেন, এবার আপনি এখান থেকে দয়া করে চলে যান। রথীন স্যার কারোর কোন কথার উত্তর দেন না। চুপ করে থাকেন। অপেক্ষা করেন, কবে আরও তিন লাখ টাকা পাবেন— আর ভাবেন, টাকা পেলে স্কুলের ছেলেদের জন্য একটা টেক্সট বুক লাইব্রেরি করে দেবেন। এক লাখ টাকা দিয়ে। আর বাকি দুলাখ টাকা দিয়ে একটা বাৎসরিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। গণিত, বিজ্ঞানে এলাকার সেরা ছাত্রদের জন্য।

রোজ সন্ধ্যে বেলায় দু'তিন জন অচেনা মুখের ছেলেরা আসে ওঁর কাছে। গল্প করে। চা এনে দেয়। জীবনের গল্প শোনে। আর রাত নটা নাগাদ যখন রূপনগর স্টেশন ঝিমুতে থাকে তখন শ্রীচৈতন্য হোটেল থেকে খাবার এনে দেয় রথীন স্যারকে। তারও পরে দশটা নাগাদ ফিরে যায়। ইতিমধ্যে একদিন শোনা যায়, রথীনস্যার বাকি টাকাটাও পেয়েছেন। তখন ওই ছেলেরা একটু বেশি সময় দিতে থাকে। সুবীর আর কেয়াও মাঝে মাঝে গল্প করে। স্বপ্ন দেখায়। একটা ঘরের ছেলেরা আসে গুজগুজ করে স্থানীয় নেতারাও আসে। স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুরোধ করেন। বার বার আসতে থাকেন নেতারা। বার বার চলে যেতে বলেন ষ্টেশন থেকে। কিন্তু রথীন স্যার অনড়। পাথরের মতো। একদিন সন্ধ্যের সময় স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা হম্বিতম্বি করে শাসিয়ে যায় রথীন স্যারকে। তারপর একদিন রাতে রেলপুলিশ তছনছ করে দেয় ওর ষ্টেশনের স্থায়ী ঠিকানা। রথীন স্যার কিছুই বলেন না। শুধু বলেন এখানে থাকি কেন জানো! আমার পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হবে বলে।

তারপর একদিন ভোরের ট্রেন থেকে কাগজের বাণ্ডিল ফেলতে ফেলতে গার্ড সাহেব চমকে উঠলেন। রক্তাক্ত রথীন স্যার, পড়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের এক কোণে। ট্রেন থেকেও বোঝা যায়, একটি গুলিতেই মুখ থুবড়ে পড়েছেন তিনি। চারদিকে থিক থিকে রক্ত মাঝখানে উপুর হয়ে পড়ে আছেন রথীন স্যার।

আনন্দের একটি দিন

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অপদার্থ। অকালকুষ্মাণ্ড। অকর্মার ধাড়ি। বাড়িতে, বাইরে, সংসারে, অফিসে, এই বিশেষণগুলো আনন্দ নিজের সম্পর্কে এত শুনেছে যে, প্রায় অনেকটাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। ছোটবেলায় মা-বাবা বলতেন। এখন বলে বউ। অফিসের বস্ বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে যান বলে ওকে আর ডাকেনই না। সরকারি অফিসে অত বকাঝকা করে সময় এবং মেজাজ নষ্ট কেই বা করে! অকাজের লোক বলে অখ্যাতি আছে বলেই আনন্দ আজেবাজে ধরনের গুরুত্বহীন কাজের বিভাগে পোস্টিং পায়।

তবু অফিস ভাল। বাড়ির দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে একধরনের মুক্তি তো! মা-বাবা গালাগালি দিতেন হয়তো অখেরে আনন্দের ভাল হবে বলে। কিন্তু বউ নানারকম গালি দেয় বিনা প্ররোচনায়, অকারণ—বিশেষ করে যখন সাইক্লিক অর্ডার স্নায়ু-জড়িত মানসিক ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই অসুখটা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাধির প্রকোপ খানিক কমলে বউ যখন সব্বার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চায়, এবং দুর্ব্যবহার করবার অভিঘাতে মরমে মরে পাথর হয়ে থাকে দিনের পর দিন, তখন আনন্দ বোর হয় আরও বেশি। নেহাৎ বাচ্চাটা জন্মে গেল বিয়ের পরপরই, নইলে হয়তো ডিভোর্স-টিভোর্সের কথা ভাবতে হতো। গুরুজন কেউ কেউ আশা দিতেন, বাচ্চাকাচ্চা হলে মনের অসুখ সেরেও যেতে পারে...

যা সারার নয়, তা সারবে কেন! বরং আনন্দই আজকাল নানান মানসিক ডিজঅর্ডারে ভোগে। বাড়িতে সবসময়ে দম চেপে থাকে বলে, ভিড়ের ট্রেনে বা খুব গতির কোনও গাড়িতে উঠলে মনে হয় দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসছে। আনপ্রেডিক্টেবল বউ কখন কী বলে বসল বা করে ফেলল, আবার না জানি কীভাবে অপদস্থ হতে চায়—ভাবনায় মাঝখানে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল প্রায়। দুই কানে ঝিঁঝির ডাকের শব্দ অনবরত। সেসব শুনেটুনে এক কলিগ গালি দিয়েছিলেন, দুঃশালা! খালি বউ বউ ভৌ ভৌ...দুনিয়ায় আর কিছু নেই? মুখোমুখি হন কেন মশাই? অপদার্থ!

বোঝা গেছে, অফিসের সময়টুকু ছাড়া, বউ ঘুমোলে বা সে নিজে ঘুমিয়ে থাকলেই সবচেয়ে ভাল। আনন্দ তাই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে, হাঁটতে হাঁটতে বড় মাঠে চলে যায়। অনেক প্রাতঃভ্রমণকারী বুড়োমানুষ এবং কিছু বাচ্চা ছেলের সঙ্গে আলগা আলাপ হয়েছে, ভালোই লাগে। তারপর বাড়ি ফিরে, দ্রুত স্নান সেরে, আগের রাতের ভাত বা রুটি-তরকারি খেয়ে বেরিয়ে যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—যাতে বউয়ের সান্নিধ্য বেশিসময় সইতে না হয়। অফিস আওয়ার্সের পর কফি হাউস গিয়ে বসাটাও ভাল লাগে। কত মানুষ, কত প্রাণবন্ত কথা। তারপর, রাত আটটা-নটা, যখনই বাড়ি ফিরুক, বাচ্চাকে একটু আদর করতেই দু-চোখ ভেঙে নামে ঘুম। ভালমন্দ কোনও কথা শোনারই অবস্থার থাকে না আনন্দের।

ইনসাবর্ডিনেশান ঘটছে, এমন ধরনের কাজ অফিস-টফিসে কাউকে দিয়ে করাতে গেলে ইউনিয়ান তো রে-রে করে তেড়ে আসবে। আনন্দর সেসবও খারাপ লাগে না কিন্তু। নিজেই ফাইলপত্র কাঁধে করে বগলে র‍্যাক থেকে পাড়ে বলে হাস্যাস্পদ হয়। হাজিরাখাতায় প্রতি মাসে প্রত্যেকের নাম যত্ন করে লিখত বলে, একবার এ ব্যাচমেট-কলিগ বলল, লিখিস কেন? কেউ বলেছে?

—ভাল লাগে, তাই! এত নাম, মানে এতেগুলো মানুষের মুখ...

কলিগ একটু সন্দেহের চোখে চেয়ে থাকল। বলল, আমার জুতোটা একটু ছিঁড়ে গেছে, সেলাই করে দিবি?

—কখনও করিনি। তাই ভাল সেলাই হবে না! হাসতে হাসতে আনন্দ বলে। হাসিমুখেই সে অফিসে সব্বার জন্য পানীয় জল বয়ে আনে মাঝে মঝে প্লাস্টিকের বোতলে, টিউবওয়েল থেকে। কেউ কেউ লজ্জা পায়। কেউ বা হাসাহাসি করে, আড়ালে। কিন্তু হাতের নাগালে ভাল পানীয় জল দেখলে যে কোনও মানুষের মুখে যে উচ্ছ্বলতা, কী সুন্দর যে লাগে তা দেখতে! দুনিয়ায় আনন্দ পাবার জিনিস খুব কমে আসছে। মানুষের হাসিমুখ কী যে দুর্লভ!

এইভাবে, এলেবেলে থেকে খানিক উচ্চস্তরের কিছু কাজই যেন খুঁজে নেয় আনন্দকে। হয়তো কোনও ব্যবসাস্থল বা বাড়ির ঠিকানা খুঁজে দেখে আসতে হবে। অস্তিত্ব- রয়েছে কি না। খাজনা আদায় সংক্রান্ত কাজে কোনও বাড়ির দেওয়ালে নোটিশ লটকে দিয়ে আসতে হবে। বসেরা জানেন, যত সকালই হোক, আনন্দকে পাওয়া যাবে, তাকেই ডাকো! তোল্লাই দিয়ে বস্‌ বলবে অ্যাজ আ রেসপনসিবল অফিসার, আপনি জাস্ট পাশে পাশে থাকবেন, কাজটা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীই করবেন....। কখনও বা জরুরি চিঠি নিয়ে ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য সরকারি দপ্তরে যেতে হয়। রেলে। রাইটার্সে। লালবাজারে। দিব্যি লাগে আনন্দর। মানুষ, মানুষ, কত মানুষ! সামান্য এই চিঠিয়া দেওয়া, একটু-দুটো কথা বিনিময়, কাজটা না থাকলে তো এটুকু হতো না!

ঘরে কথা বলার কেউ নেই, তাই বাইরে দুটো কথা বলে, মানুষের মুখ দেখতে দেখতে আনন্দ শ্বাস ছেড়ে বাঁচে। সরকারি গাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে পারলে, সেদিনটা তো ওর উৎসবের দিন!

আরও খানিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে নিজাম-প্যালেস সন্নিকট এক অফিসে। যাবতীয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যেখানে নথীভুক্ত, সেখানে ফাইল থেকে ডিরেক্টরদের হাল-হকিকৎ-ঠিকানা ও আরও অনেক তথ্য লিখে নিতে হয়। ওখানে আবার ঢুকতে হয় পেনসিল হাতে— কলম দিয়ে লেখা নিষেধ! অনেক সময়ে প্রতিযোগী কোম্পানীর লোকজন নানান ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর হাতে দশ-বিশ টাকা গুঁজে দিয়ে গোপনে, আগে ভাগে ফাইল দাবি করে । কর্মীর মুখ ব্যাজার হয় আনন্দকে দেখলে। নিয়মিত এই সরকারি বাবুটিকে দেখতে দেখতে তার অরুচি ধরে গেছে। পরওয়ানা নিয়ে এলে দশ-বিশ টাকা তো জোটে না। তবু একদিন প্যাঁচ কষে আনন্দকে বলল, অমুক ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না।

—ঠিক আছে, আপনি খুঁজুন না, আমি তো আছি।

আনন্দের একটি দিন

—কতক্ষণ বসে থাকবেন? পার্টিকে ধরে আনতে যদি পারেন...

—সে তো সম্ভব না, তবে আমি আছি। আমার কোনও তাড়া নেই!

লোকটির অরুচিগ্রস্ত মুখ দর্শন থেকে রেহাই পেতে আনন্দ 'একটুঘুরে আসছি' বলে পথে বেরল। উত্তরদিকে ফুটপাথ ধরে উদ্দেশ্যহীন কিছুটা হেঁটে যেতে যেতে, সহসা বেশ একটা আনন্দদায়ক দৃশ্যের মুখোমুখি হলো সে। এতগুলো আনন্দিত হাসিমুখ, সোজা কথা তো নয়! ব্যাপারটা কী?

পথে ঘোরাঘুরি এবং কাগজ পড়ার অভ্যেসে তার মনে হল, তাই তো অনক দিকে অসম্পূর্ণ বিশাল ওই বিল্ডিংটা তো আসলে বড় এক খবর কাগজ কোম্পানির! কাগজটা খুলবে খুলবে, ক'দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। আজই কী খুলে গেল? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না। ফুটপাথের হঠাৎ-হওয়া দোকানে ডিম-পাঁউরুটি-চা-ঘুগনি-বিস্কুট বিকোচ্ছে দারুণ। হরিপদ কেরানি গোছের চেহারা ছাপোষা চেহারার মানুষ থেকে আকবর বাদশার মতন দেখতে কেউ কেউ, দেখলেই মনে হয় অধ্যাপক · লেখক কিংবা বুদ্ধিজীবী— সব্বার সমান হাসিমুখ, একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে কী যে ভাল লাগে!

আনন্দের নেশা আনন্দকে এমনই পেয়ে বসল যে, সে পায়ে পায়ে ঢুকেই পড়ল ভেতরে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। কেউ বাধা দিল না— কি উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছে, জিজ্ঞেস করল না। সব্বাই নিজেদের নিয়েই মশগুল। হাসিমুখের মৃদু জটলা ও আড্ডা দেখা যাচ্ছে কোথাও। অনেকটা জায়গা জুড়ে কাঠের ওপর র‍্যাঁদা — তুরপুন ছোট্ট ঘরে খুব ভিড়। আনন্দ জিজ্ঞেস করেই ফেলল, ওখানে কী হচ্ছে?

— পেমেন্ট দিচ্ছে তো। আপনি নেননি?

ঝনঝন শব্দে একটা খুশির আবেশ বেজে ওঠে আনন্দের মস্তিস্কে। সে কে, কেন এখানে ঘুরছে, যাচাই না করেই অচেনা মানুষটি তাকে সহকর্মী ধরে নিয়েছে। আনন্দের ধর্মই হয়তো এই, সবাইকে আপন করে নিতে মন চায়। এই রাজ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা ভাল না, একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নানান কলকারখানা। চারদিকে লে-অফ, লক-আউট, স্ট্রাইক, বি আই এফ আর, ভি আর এস — এসব বিষণ্ণ শব্দের দূষণ। তার মধ্যে কী সুন্দর এই বিপরীত দৃশ্যটি! একদম উটো কাণ্ড, লোকে যতই সন্দেহ করুক মালিকদের সদিচ্ছা নিয়ে, বন্ধ হয়ে থাকা একটা কোম্পানি খুলছে তো!

ঝনজন করে আনন্দর মনে একটা তথ্য ভেসে উঠল, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় দশ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল এই কোম্পানি খুলবার জন্যে। সাহায্য হয় যাতে। দরকারি চিঠিচাপাটি নানান সরকারি দপ্তরে আনন্দর হাত দিয়েই গিয়েছে। বোধহয় আলগাভাবে ফাইলে 'কনফিডেনশিয়াল' মার্ক করা ছিল। সেজন্যই ওই সংক্রান্ত চিটিগুলো সে বিশেষ মন দিয়ে দেখেছিল— তাই আজ মনে পড়ল। সমুদ্রে সেতুবন্ধনের কাজে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল যে কাঠবেড়ালটা, আনন্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক, তুচ্ছ। তবু, কী যে ভাল লাগছে! জীবিকা নিয়ে এতখানি তৃপ্তি এবং সম্মানবোধ আগে আনন্দের কোনওদিনেও আসেনি।

সম্মানবোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আত্মপ্রত্যয়। আলগাভাবে আনন্দর মাঝে মাঝে মনে হয়, তার কলেজে পড়ার সময়ে কাগজটা বেরত বাগবাজারের পুরোনো একটা বাড়ি থেকে। ওদের বাড়িও খুব দূরে ছিল না। পাঠকের মতামত হিসেবে চিঠি লেখার একটা অভ্যেস তৈরি হয়েছিল ওর। প্রায়ই কলেজ-ফেরৎ, চিঠিগুলো হাতে হাতে চশমা-পরা রোগামতন এক ভদ্রলোকের হাতে গুঁজে দিয়ে, প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যেত সে। পাঁচটি চিঠি দিলে, তিনটি অন্তত ছাপা হতোই। এইভাবে, দু-চারটে ছাড়াটড়াও দিয়েছে, ছাপা হয়েছে।

মায়ের প্রশ্রয় ছিল খানিক, কিন্তু বাবা খুব বিরক্ত হতেন। বলতেন, দুনিয়ার যত অপদার্থ অকর্মণ্য লোক, তারাই কাগজে চিঠি লেখে। বাস্তবে কিছু করতে পারে না বলে। তারা নির্বোধ এবং পল্লবগ্রাহী বলেই দুনিয়ার যাবতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে বেশ একরকম জ্ঞানী-গ্গানী ভাব করে নানান মতামত লেখে! বাবার আরও বিরক্তির কারণ ছিল, ওসব লেখার নেশায় আনন্দ ঠিকমতন লেখাপড়া করলে না বলেই এম এ-তে রেজাল্ট অধ্যাপনার চাকরি পাবার মতন ভাল হলো না। ওদিকে ডব্লু বি সি এস-এও কোয়ালিফাই করতে পারল না। অপদার্থ পুত্রটি কাদের পাল্লায় পড়ে কাদের সঙ্গে না জানি মিশছে!

সেখানেও ভিন্ন রঙ্গ। কফি হাউসে কিছু অর্ধপক্ক - অর্ধসিদ্ধ আঁতেল এবং কিছু তীক্ষ্ণ মেধাবী ছেলেপুলের সঙ্গে যে ভাব হয়েছিল আনন্দের, কাগজে চিঠি লেখালেখি তারা কেউ পছন্দ করত না। কেউ বলত, আরে, কাগজটাগজগুলো এমন কিছু চাকরবাকর পোষে। কেউ বলত, ফের বাণিজ্যিক পত্রিকায় নাম ছাপা হতে দেখলে, কান ধরে বার করে দেব!

সামান্য দু-টারটে ছড়ার জন্য, তা লিখে ছাপানোর জন্য চেনা মানুষের হাসিমুখ দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হবে! মরুক গে যা! অপদার্থ বলে নিজেকে ভাবতে থাকা আনন্দ একবারও তলিয়ে দেখল না, অমন দু-চারটে ছাড়াও যাদের ছাপা হয় না, তারা হিংসে করেও অমন বলতে পারে। সমস্ত উচ্ছ্বাসই ওর নিভে এল ধীর ধীরে। এটুকু মনে পড়ে, কাগজটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবার আগে মান এত নেমে গিয়েছিল যে, ওটা বন্ধ করে ইংরেজি কাগজ রাকা শুরু হলো। এই কাগজে মায়ের আকর্ষণ ছিল শব্দ-ছক, আর ওর ছিল ছড়া-টড়া, চিঠি-ফিঠি। কোনোটাই দরকারি জিনিস নয়। আনন্দর ছোটভাইকে তো অপদার্থ হলে চলবে না! জিকে বাড়ানোর জন্য তার ইংরেজি কাগজ পছন্দ। সামনে নানান পরীক্ষা-টরীক্ষা আছে।

কাগজটা আবার সত্যি সত্যি বেরবে? আবার বিপুল উদ্যমে চিঠিপত্র লেখা শুরু করবে নাকি? অনাস্বাদিক পুলকে আনন্দের গায়ে কাঁটা দেয়। বাবার বয়েস হয়েছে, আর নিশ্চয় বকবেন না। আর নতুন করে আনন্দের জীবনে কিছু তো হওয়ার নেই! স্বাভাবিক হাসিখুশি সুন্দর একটা বউ জোটাতে পারেননি বড় ছেলের জন্য, এই দুঃখে বাবা একটু একটু মরমে মরে থাকেন। নিজে বাবা হয়েছে বলেই আনন্দ বাবার সে অনুভূতিটা টের পায়। বউ কাগজ টাগজ পড়ে না, দেশের বা সমাজের হালচাল নিয়ে মতামত ব্যক্ত করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। দেশের ব্যাপার নিয়ে, কাগজে কাগজে আনন্দই এবার থেকে অনেক কথা বলবে! ভাইও চাকরি পেয়ে গেছে। ইংরেজি কাগজ ছেড়ে এ

কাগজটাই না হয় বাড়িতে রাখা যাবে!

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। মনের ভেতরের মনটা ভাবে। শিল্পপতি খুঁজে নিয়ে একটা কাগজ পুনর্বার প্রকাশ করলেই তো হলো না, চালিয়ে যাবার মনত স্ট্যামিনা রাখা চাই। চাকরি হারিয়ে, আনন্দ দেখেছে, ওদের পাড়ারই একজন আত্মহত্যা করেছে। ছোটখাট দোকান দিয়েছে আরেকজন। ডানলপ বা হিন্দুস্থান কেবলস নয় এই কাগজ কোম্পানি, হাওড়ার গেস্টকিন উইলিয়ামসও নয় যে, ধরাশায়ী হবে যখন, তখন ঘটোৎকচের মতন অনেকগুলো অ্যানসিলিয়ারি ইন্ড্যাস্ট্রি নিয়ে ধরাশায়ী হবে। সামান্য একটা কাগজ। নিষ্কর্মা কিছু কলমজীবীর ভাত-রুটির যোগান আর আনন্দর মতো অপদার্থদের প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া সমাজে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা এর?

কফি হাউসের বন্ধুবান্ধব, বাণিজ্যিক কাগজে লিখলে হ্যাটা করত যারা, তারা বোধহয় ভাবে, কাগজ হাতে থাকা মানে অপার ক্ষমতা, সাহিত্য পুরস্কার-টুরস্কার। আনন্দের ছড়া নিয়ে বিদ্রূপ করার দলবল কোথায় যে হারিয়ে গেল! না কি তারা মনে মনে বিরক্ত হতে হতে বাবার চেয়েও বুড়ো হয়ে গেল? কাউকে কাউকে দেখা যায় বটে। টিভিতে। বড় কাগজরে ছাপানো অক্ষরে। কেউ কেউ পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু ঢাক পেটানোর শব্দে কান পাতা দায়। একেকটা কাগজের ধাত একেকরকম। কেউ একে নিয়ে ঢাক পেটায় তো কেউ ওকে নিয়ে নাচে। টিভির গন্ডা গন্ডা চ্যানেলেরই মতন। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব খুঁজতে খুঁজতে কিছু দেখা হয় না! সব্বাই কথা বলে যাচ্ছে। শুনবে কে?

সে তো গেল একটা দিক। কিন্তু, এত এত টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান, এত বাণিজ্যিক কাগজ— এর আসল উৎস কি কেউ ভাবে? টাকা আছে তো কোম্পানি আছ। বিজ্ঞাপন আছে তো কাগজ আছে। নিয়োগকর্তা আনন্দের ক্ষেত্রে যে, এতগুলো জীবিকা সংশয়ী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর পেছনেও তো সে ই! ভাগ্যিস চিঠিপত্র লেনদেন আনন্দের হাত দিয়েই হয়েছিল! খেলার আড়ালের খেলাগুলো মনে করতেই আনন্দের অল্প হাসি পায়। কোরামিন দিয়ে কাউকে বেশিদিন বাঁচানো যায় না সত্যিই। যেখানে যা বন্ধ হওবার তা হবে, যা খুলবার তা খুলবে। রাজ্য বা কেন্দ্রের সরকার বড়জোর কিছুটা বন্ধুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে পাশে দাঁড়িয়ে।

তবু, এই মুহূর্তে, কাজে বেরিয়ে, বে-খেয়ালে এমন একটা হাসিখুশি জায়গায় এসে পড়ে ভালো লাগছে। আজকের দিনটা ভাল লাগছে, এতো সত্যি! দমবন্ধ করা কী যেন একটা গিঁট সরলভাবে খুলে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। বয়স বাড়ছে বলে, চড়াই-এর সঙ্গে কড়াই কিংবা গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছড়া লিখতে ইচ্ছে করে না আর। অপদার্থ, নির্বোধ বলে ওকে আলোচেনার মধ্যে গণ্য করে না কেউ, তাদের লুকিয়ে, নিত্যদিনের বলে চলা সংবাদস্রোত, জীবনস্রোতের কথাই সে সাতকাহন করে বলবে।

ঘুমহীন মাঝরাতে, দুই কানে তখন ঝিঁঝিপোকার ডাক নিশ্চয় নিশে যাবে অতন্ত্র জীবনকাহিনী উগরে চলা দৈনিক কাগজ নির্মানের শব্দে। একটা কাঠবেড়ালির চেয়েও তুচ্ছ সে, কথা বলবার লোক ঘরে-বাইর কেউ নেই। কাজেই, আনন্দকে তো লিখতে হবেই।

আলোয় ফেরা

রতন শিকদার

শহরের নাম অদিত্যপুর। পাহাড়ের পাদদেশে নিবিড় বনবীথির মধ্যে পুরান-ইতিহাস প্রসিদ্ধ এক অধুনিক শহর। শহরের মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে চলেছে এক তন্বী স্রোতস্বিনী। তার অবিরাম কলস্বরে কম্পন ওঠে নদীতীরে। অজস্র বৃক্ষ-বিটপীতে ছাওয়া আদিত্যপুর যেন কুঞ্জবন। প্রত্যুষ থেকে গোধূলি পর্যন্ত পক্ষীকূলের কূজনে মত্ত থাকে আদিত্যপুর। এমনই এক বৈচিত্র্যময় শহরে গড়ে উঠেছে অতি আধুনিক এক বিদ্যালয়। নাম আদিত্যপুর আবাসিক বিদ্যালয়। প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধনী ব্যক্তিরা তাদের পুত্রদের এই বিদ্যালয়ে পাঠান পড়াশুনা করে মানুষ হতে। তেমনই প্রতি বৎসর উজ্জ্বল মুখের এক একটি ছাত্রদল বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করে এই বিদ্যাশ্রম ত্যাগ করে চলে যায় বৃহত্তম জগতে। ওদের চোখেমুখে কী ভীষণ উজ্জ্বলতা! এ কি কৃতকার্য হয়ে আশ্রম ত্যাগ করার জন্য, নাকি আশ্রম জীবন থেকে মুক্তির আনন্দে? মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলের গ্রামের এক কিশোর ঋত্বিক অন্য সকলের সাথে আশ্রমে নবাগতদের বরণ করতে করতে ভাবে এ সব কথা। তিন বছর আগে সে নিজেও একদিন গ্রাম ছেড়ে এসেছিল এ শহরে। তার গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এক শান্ত নদী। সেই নদীর পাড়েই তাদের বাড়ি। আর ওই বাড়ি থেকে অল্প দূরত্বে অশান্ত সমুদ্র তার নীল জলরাশি নিয়ে দামাল ছেলের মত দাপাদাপি করে অবিরাম।

এই মুহূর্তে ঋত্বিকের মন চলে গিয়েছে সেই গ্রামে। গ্রামের বাড়িতে থাকার সময় কখনও কখনও সৃজন-শীলতার ঘুন পোকাটা তার মনটাকে কুরে কুরে খেত। আর তখনই সে চলে যেত শান্ত নদীটির সাথে একাত্ম হতে। সেখানে থেকে সে দিগন্ত অবধি দৃষ্টি মেলে দিত। সবুজ আবার তার ছবির ফ্রেমে বাঁধা পড়ত একটা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা। পরান মাঝি একলা সে ডিঙ্গি বেয়ে ভেসে চলেছে সমুদ্রের পানে। এ ভাবে কত বিকাল পরম নিঃশব্দে তার অজান্তে হারিয়ে গিয়েছে সন্ধ্যার আঁধারে। তারপর সে অপলক দৃষ্টিতে এক প্রহর অবধি তাকিয়ে থেকেছে নিকষ কালো আকাশের দিকে। সন্ধ্যাতারাটা মাটির থেকে উঠে আকাশের বুকে ছোট্ট শিশুটির মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে যখন অনেকটা পথ চলে গিয়েছে তখন ঋত্বিক শুনতে পেয়েছে তার বাবার ডাক। 'ঋত্বিক, অনেক রাত হয়েছে। এবার বাড়ি ফিরে এসো। আবার কাল তুমি চলে যেও নদীর পাড়ে।'

ঋত্বিক ফিরে গিয়েছে তার পরিচিত চার দেওয়ালের মাঝখানে। পরদিন হয়ত তার মন হয়েছে উত্তাল। সে ছুটে গিয়েছে সমুদ্রের পাড়ে। সারাটা দিন দামাল ছেলের দাপাদাপি দেখে ফিরে গিয়েছে ঘরে। সমুদ্রপাড়ের লাইট হাউসের আলোটা তখন জ্বলজ্বল করে পথ চেনাচ্ছিল দূর সমুদ্রে ভেসে যাওয়া জাহাজগুলোকে। আবার কোনোদিন ঋত্বিক বালিয়াড়ির উপরে শুয়ে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘন্টা। তখনও তার দৃষ্টি দূর সমুদ্রের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নোনা জলের হাওয়ায় তার ঘোর লেগেছে। সে পালতোলা নৌকায় করে পাড়ি দিয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

ঋত্বিকের একটা বাঁশের বাঁশি ছিল। বাঁশিটি তার খুব প্রিয়। তার মন যখন কেমন কেমন করত, উদাস হয়ে যেত, ঋত্বিক তখন বাঁশির মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেত। কত সন্ধ্যা সে বাঁশি বাজিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। আশ্রমে আসবার সময় তার বইপত্র, কাপড়-জামার সাথে ওই বাঁশিটাকেও সে বাক্সে ভরে নিয়ে এসেছিল। ঋত্বিকের বাবা বাঁশি নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ঋত্বিক বলেছিল 'এ বাঁশি আমার সঙ্গী বাবা। তুমি জেনো বাঁশি বাজানোতে আমার পড়ার ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ আমার যখন মন উদাস হবে তোমাদের জন্য আমি তখন বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ পাব।' একদিন বিকালে তার অমন মন উদাস হয়েছিল। সে ছাদে বসে বাঁশিতে ধুন তুলছিল। আশ্রমের নজরদার এসে তার বাঁশি কেড়ে নিল। তাকে ধরে নিয়ে গেল আশ্রম প্রধানের কাছে। তিনি বাঁশিটা দেখিয়ে বলেছিলেন 'এসব বাঁশি তো গ্রামে রাখাল বালকেরা বাজায়। এ বাঁশি তুমি কোথায় পেলে? তুমি নতুন এসেছ তাই জান না। বাঁশি বাজান এখানে নিয়ম বিরুদ্ধ। আশ্রমের অনুশাসন যেন আর কখনও ভঙ্গ না হয়।' বাঁশিটা তিনি রেখে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের কাছে। আজ নতুন বিদ্যার্থীদের চোখে ঋত্বিক দেখে তার ফেলে আসা দিনগুলোর ছবি।

ভাবতে ভাবতে ঋত্বিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আজ তিন বছরের অধিক হয়ে গেল ঋত্বিক এই আদিত্যপুরের আশ্রমিক। কিন্তু অন্য আর সব আশ্রমিকদের মত সেও আদিত্যপুরের প্রাকৃতিক শোভা, পরিবেশের মাধুর্য ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। আশ্রম ভবনের চারপাশে সুউচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে সে পৌঁছাতে পারে না প্রকৃতির কোলে। প্রথম যেদিন সে আদিত্যপুরে আসছিল সেদিনই পথের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সাথে সাথেই তার কাছে হারিয়ে গিয়েছিল সে সৌন্দর্যময় আদিত্যপুর। এক ইট কাঠের জঙ্গলে তার দিন কাটতে লাগল। এক দম বন্ধ হওয়া কঠিন আবহাওয়ায় সে হাঁফিয়ে উঠতে লাগল। তবে তার সৃজনশীল প্রতিভা ইট কাঠের নীচে চাপা পড়ে থাকল না। ইটের নীচে চাপা পড়া ঘাস যেমন তার আসল বর্ণ হারিয়েও বেঁচে থাকে এবং সেই ইটের নিচে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে, ঋত্বিকের সৃজনশীলতা ঠিক সেভাবে প্রকাশ পেয়ে গেল। আর সেটাই হল কাল। আশ্রম প্রধান কঠিন পত্রাঘাতে তার পিতৃদেবকে নির্দেশ করলেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। আশ্রম প্রধান তাকে বললেন, 'আপনার পুত্রটি অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বিষয়ে ওর অতি উৎসাহ আমরা লক্ষ্য করছি। এতে ওর পক্ষে পড়াশুনায় আশানুরূপ ফল লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

আশ্রম প্রধানের অতি রূঢ় বাক্যবর্ষণে ঋত্বিকের পিতৃদেব আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হয়ে গেলেন। পিতাপুত্রের মিলনের ক্ষণটি যেন প্রবল ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত। কিন্তু কোনও ঝড় উঠল না। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ঋত্বিক, তুমি তো জান ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়নই তোমার তপ। তোমাকে অধ্যয়ন করে প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হবে। তোমাকে ঘিরে আমার কত স্বপ্ন। এখানকার শিক্ষা সমাপন করে তোমাকে আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তোমাকে মানুষ হতে হবে।'

আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক নীরব। কিন্তু নিজেকে মনকে সে প্রশ্ন করে, ইট-কাঠের জঙ্গলই কি শিক্ষার একমাত্র স্থান? সে অবাক হয়ে ভাবে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য কি প্রকৃতির কাছ থেকে কোনও পাঠ নেবার নেই? পিতৃদেবের উপদেশের প্রতিবাদ করতে সে কোনও শব্দ উচ্চারণ করে না।

কিন্তু মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে সে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলবে। সে পাঠ গ্রহণ করবে আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, তার চারপাশের পরিবেশে থেকে। স্বাধীনভাবে সে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে। মুক্ত বায়ু তাকে মুক্ত চিন্তার পথ দেখাবে। সে নিজেকে গড়ে তুলবে বাস্তবের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে।

ঋতুচক্রের অবিরাম নিয়মতান্ত্রিক ঘূর্ণন ঘটে চলে। আদিত্যপুরের আকাশে-বাতাসে, বন বীথিতে, নদীতে তার প্রতিফলন চোখে দেখতে না পেলেও ঋত্বিক তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। সাধারণ কীটপতঙ্গ, লতাগুল্মে ঋতু পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু বিশাল প্রাচীরের অন্তরালে দিন যাপনকারী আদিত্যপুরের আবাসিকদের মধ্যে তার প্রকাশ অনুভূত হয় না। এর মধ্যে একজন ব্যতিক্রম— সে ঋত্বিক। ঋত্বিক এ ঋতু পরিবর্তন অনুভব করে আঘ্রাণে। শীতে শেষে পরিযায়ী পাখিদের দেশে ফিরে যাওয়া দেখে সে বুঝতে পারে বসন্ত আসছে। প্রাচীরের ওপার থেকে ভেসে আসে কোকিলের কুহু ডাক। আশ্রমের কোনো অনুশাসন তাকে প্রতিহত করতে পারে না। দিন যায়। তারপর ঈশান কোণে আকাশের বুকে কালো মেঘে ডমরু বাজে। শুরু হয় ঝড়ের সাথে দীর্ঘ বৃক্ষরাজির তান্ডব নৃত্য। প্রবল বর্ষণে তৃষিত ধরার বুক হয় শীতল। ঋত্বিক তার বন্ধুদের নিয়ে উঠে যায় আশ্রমের ছাদে। আঁজলা ভরে গ্রহণ করে প্রথম বর্ষণ। চোখে মুখে তাদের ফুটে ওঠে অনাবিল আনন্দের জলছবি। তারপর বর্ষণ শেষে শেষ সূর্যর আলোকে পূর্ব আকাশে রামধনু সপ্তরঙের শোভা ছড়ায়। সেই শোভা দেখতে দেখতে তারা কখন যেন গান গেয়ে ওঠে আপনমনে। কিন্তু এ আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী হয়। আশ্রমিকদের ওপর নজরদারী করবার দায়িত্ব কার্তিককুমারের। তার নজরে পড়ে আশ্রমিকদের এই আইনবিরুদ্ধ কার্যকলাপ। সে নালিশ জানায় আশ্রম প্রধানের কাছে — আশ্রমিকরা ঋত্বিকের নেতৃত্বে আইন ভঙ্গ করে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বর্ষাবিরণ করছে সঙ্গীতের মাধ্যমে। আশ্রম প্রধান তৎপর হয়ে ওদের বলেছেন এ উদ্ধত স্বভাব সংশোধন করতে। বলেছেন, তোমারা এ আশ্রমের অনুশাসন ভঙ্গ করেছ। অন্য আশ্রমিকরাও যদি তোমাদের অনুকরণ করে, তাহলে তা এ বিদ্যালয়ে সবার পাঠাভ্যাসে বিঘ্ন ঘটবে। শুধু তাই নয়, চাষীদের মত বৃষ্টির জলে ভেজা ভদ্র সন্তানদের শোভনীয় নয়। আর কখনও যেন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।'

সেই মুহূর্তে ঋত্বিক ও তার সাথীরা মূল থেকে বিচ্ছিন্ন বিটপীলতার মত মুহ্যমান। তারা আনত মস্তকে আশ্রম প্রধানের নির্দেশ শিরোধার্য করে ফিরে গিয়েছে স্ব স্ব কক্ষে।

এরকম কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিন অতিবাহিত হচ্ছিল ঋত্বিকদের। প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রমের অভ্যন্তরে কক্ষে কক্ষে সবার অলক্ষ্যে চলে জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার তীব্র যুদ্ধ। সকাল থেকে সন্ধ্যা নানা নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছাত্রদল প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে। নজরদার কার্তিককুমার খুশি। আশ্রম প্রধানও খুশি।

আদিত্যপুর আবাসিক বিদ্যালয়ে বেশ চলছিল সব কিছু। কিছুদিন হল হঠাৎ একটি ঘটনা নজরদার কার্তিককুমারের চিন্তায় কারণ ঘটাল। ছাত্রাবাস সহ সমস্ত আশ্রমে রাত দশটায় আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। বহু কাল ধরে এ নিয়ম চলে আসছে। আলো নিভাবার আগে কয়েক একরব্যাপী আশ্রম চত্বরে টহল

দেয় জেনারেটার অপারেটার সিদ্ধেশ্বর। সমস্ত আশ্রমবাসীকে আগাম জানিয়ে দেওয়া তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিছুক্ষণ পর সে জেনারেটার বন্ধ করে দেয়। সমস্ত এলাকার ওপর অন্ধকার নেমে আসে নিঃশব্দে। আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য বন্ধ করতে হবে তৎক্ষণাৎ। সবাইকে শয্যাগ্রহণ করতে হবে তখনই। ইদানিং অদ্ভুতভাবে এর ব্যতিক্রম ঘটে চলেছে। রাত দশটায় আলো নিভে যাবার পর আশ্রম চত্বরে ভেসে আসে এক মিষ্টি আওয়াজ। কে যেন বাঁশিতে এক অদ্ভুত মধুর সুর তোলে। প্রথম প্রথম কার্তিককুমার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চায় নি। ভেবেছে পাশেই নদী, হয়ত কোনও রসিক নৌকাভ্রমণ করতে করতে বাঁশি বাজাচ্ছে। প্রত্যহ যে এমন ঘটনা ঘটছে তা মনে হয় না কার্তিককুমারের।

সেদিন পূর্ণিমা। রাত দশটায় আশ্রমের সমস্ত আলো নিভে গেল। রূপালী চাঁদের জ্যোৎস্না চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে আশ্রম চত্বরে। কার্তিককুমার তার কক্ষের সম্মুখের প্রাঙ্গণে বসে আছে। ময়ূরপঙ্খী বজরার মত শ্বেতশুভ্র মেঘ ভেসে চলেছে আকাশে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে। কার্তিককুমার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদাস হয়ে যায়। রাত গভীর। কিন্তু ক'প্রহর অতিক্রান্ত তা তার হুঁশ নেই। হঠাৎ বাঁশির আওয়াজে তার সম্বিত ফেরে। সে সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাঁশি বাজছে। প্রথমে একটি তারপর দুটি বাঁশি একসাথে। তারপর তিনটি। তারপর অনেক অনেক বাঁশির ঐকতান। বেজেই চলেছে। কার্তিককুমার বিহ্বল। সে তাকিয়ে আছে আকাশপানে। আকাশের গায়ে ফুটে উঠল অসংখ্য তারা। বাঁশির শব্দে তারারা যেন মিছিল করে নেমে আসছে। ছড়িয়ে পড়ছে, আবাসনের ছাদে, প্রাঙ্গণে। কার্তিককুমার ছুটতে শুরু করল। ও ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল ছাত্রাবাসনের ছাদে, প্রাঙ্গণে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগল। বাঁশির আওয়াজ তীব্র থেকে তীব্রতর। কার্তিককুমার সে শব্দাঘাতে বিধ্বস্ত। চীৎকার করে উঠল, 'তোমরা কারা? কোথায় তোমরা? কেন তোমরা শান্ত রাত্রির নিস্তব্ধতা এভাবে ভঙ্গ করছ? চেতনাহীন কার্তিককুমার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

দোতলায় ছাদ থেকে এক এক করে নেমে আসছে ওরা। ওদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি বাঁশের বাঁশি। এখন ওদের হাঁতের বাঁশি নীরব। একটু আগেও বাঁশির যে ঐকতান ছিল সজীব এখন শুধু অনুরণন চলেছে আদিত্যপুরের আবাসিক বিদ্যালয়ের আকাশে-বাতাসে, অঙ্গনে-উদ্যানে। ওরা সবাই কার্তিককুমারকে ঘিরে চারপাশে দাঁড়িয়ে। ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন আশ্রম প্রধান। কার্তিককুমার চোখ মেলে উঠে বসল। আশ্রম প্রধান ওদের পিছন থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন সবার মাঝখানে। তাঁর মনে হল যেন আগুন জ্বলছে চারধারে। তার উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে সবাই। তিনি নিজেও। তবে আগুন যজ্ঞের আগুন। তাদের দেহ-মন সব যেন অগ্নিতে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে। তাঁর কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে। সেই শুষ্ক কণ্ঠ বজ্র নির্ঘোষ হল। বললেন, 'তোমরা সবাই বাঁশি পেলে কোথায়?'

'ঋত্বিক দিয়েছে।' একসঙ্গে সবাই বলে উঠল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় সে?'

ঋত্বিক সবার পিছনে ছিল। কৌশিক, শৌভনিক, অম্বরীশ, অনিকেত, অনির্বাণ, মল্লার ও ঋতুপর্ণ—সবাই সরে গিয়ে ওকে এগিয়ে আসতে দিল। ঋত্বিকের হাতেও বাঁশি। দৃষ্টি যেন মাটির গভীর পৌঁছে

যাচ্ছে। রাত্রি দ্বি-প্রহরের চাঁদের জ্যোৎস্না তির্যকভাবে বারান্দার এই কোনটিতে এসে পড়ে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আশ্রম প্রধান কিছুক্ষণ আগেও যে উত্তাপ অনুভব করছিলেন এখন তা অন্তর্হিত হয়েছে। পরিবর্তে কোমল জ্যোৎস্নায় তার শুদ্ধ কণ্ঠে এখন আর্দ্রতা। তাঁর ডান হাত দিয়ে ঋত্বিকের পেলব চিবুকখানি তুলে প্রশ্ন করলেন, 'ঋত্বিক, তুমি এদের সকলকে বাঁশি দিয়ছ ?'

— হ্যাঁ। ঋত্বিক আবার তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মাটির দিকে।

— কিন্তু কেন? তোমার বাঁশি বাজেয়াপ্ত করে তোমাকে কি নির্দেশ দিয়েছিলাম একদিন মনে নেই?

ঋত্বিক নিরুত্তর।

— তুমি জান না, তোমরা সবাই বাঁশি বাজিয়ে আশ্রমের শান্তি বিঘ্নিত করছ?

— ওরা বাঁশি বাজিয়ে আনন্দপায়। বাঁশির মধুর আওয়াজে তো কারোর শান্তির ব্যাঘাত হয় না। ওরা যে নিত্য নতুন সুর সৃষ্টি করে।

— কিন্তু এত বাঁশি তুমি কোথায় পেলে?

— আমি তৈরি করেছি।

আশ্রম প্রধান এবার আরও অবাক হয়ে কয়েক মূহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর আবার তাকে প্রশ্ন করলেন, কীভাবে তৈরি করলে এত বাঁশি?

আশ্রম প্রধানের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন এবং বাক্য প্রক্ষেপনে নমনীয়তা লক্ষ্য করে ঋত্বিকের মনে সাহস ফিরে এল। সে ব্যাখ্যা করতে লাগল কেমন করে সে আশ্রমের পরিত্যক্ত ঝুল ঝাড়ার বাঁশের দন্ডগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। দিনের পর দিন যে আবর্জনা আশ্রমে জমে উঠত তা পরিষ্কার করবার জন্য এই ঝুলঝাড়া ব্যবহৃত হত। তারপর এগুলিও এক সময় আবর্জনায় পরিণত হত। এখানেই ঋত্বিকের কৃতিত্ব। সে ওই আবর্জনা থেকেই সৃষ্টি করেছে অপরূপ সুর সৃষ্টিকারী বাঁশের বাঁশি। ঋত্বিক বলল, আমি ঝুলঝাড়ার বাঁশের খণ্ডগুলোকে তুলে নিয়ে এসে কাজে লাগিয়েছি। সেগুলোকে কেটে, ঘরে, ঘযেমেজে, ফুটো করে বাঁশি তৈরি করেছি।

ঋত্বিকের কথা শুনে আশ্রম প্রধান ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে পড়েন। তাঁর মনে জাগে অনেক পুরানো স্মৃতি। তাঁর আশ্রমে কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য অনেক সৃজনশীল প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটতে পারেনি। আশ্রমিকরা স্বাভাবিক নিয়মে বড় হয়ে ওঠে নি। তাই তাদের সত্যিকারের মানবিক ও চারিত্রিক বিকাশ হয়নি। ঋত্বিক ও তার সপ্তসাথী তাঁকে নূতন করে সব কিছু দেখতে শেখাল। আবেগে অভিভূত হয়ে তিনি ঋত্বিককে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বললেন, 'আশ্চর্য প্রতিভা তোমার! তোমার এই সৃজনশীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সত্যিই তুমি বাঁশি বাজাতে এত ভালোবাস! তুমি এদের সবাইকে সত্যিকারের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছ। এই মন্ত্রে ওরা সর্বার্থে সার্থক মানুষ হবে। আশ্রম প্রধান হিসাবে আমি সংশয়হীন চিত্তে ঘোষণা করছি যে প্রতিটি প্রতিশ্রুতিময় আশ্রমিকের সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ যাতে ঘটে আমি তার জন্য সচেষ্ট হব।'

আশ্রম প্রধানের নির্দেশে সিদ্ধেশ্বর আবার জেনারটার চালিয়ে দিল। নিমেষের মধ্যে সমগ্র আশ্রম

চত্বর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বহুদিনের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে মধ্যরাত্রিতে আদিত্যপুরের আশ্রমিকের আবাসে আলোর বন্যা বয়ে গেল।

একটি নিশাচর পক্ষী দূরে কোনও বৃক্ষশাখায় বসে সমস্ত ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করছিল। পক্ষীটি অদ্ভুত এক সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে আবাসনের আকাশ দিয়ে উড়ে গেল।

গভীর গোপন

অশোক রায় চৌধুরী

— আপনার স্বামীর এই রকম মানসিক অবস্থা আজ কতদিন ধরে লক্ষ্য করছেন?

— প্রায় বছরখানেক ধরেই এইরকম অবস্থা লক্ষ্য করছি।

—একবছর আগে ওর কোন রকম অস্বাভাবিকতা ছিল না, তাই না?

— আজ্ঞে না স্যার, দিব্যি হাসিখুশি ফুর্তিবাজ লোক ছিলেন উনি। এখন তো একেবারেই কথাবার্তা বলেন না। সবসময় গুম হয়ে বসে থাকেন। শিপ্রাদেবী বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। — মনে হয় আমার ওপর যেন কিসের অভিমান, ক্রোধ।

ডাঃ সেন এবার প্রশ্ন করলেন— কোনরকম দাম্পত্য কলহ? আই মিন্ কোন কিছু ভুল বোঝাবুঝি বা সন্দেহ?

— আজ্ঞে না ডাক্তারবাবু, তেমন কিছুই-তো ঘটেনি। আমাদের ভালোবেসে বিয়ে। দুজনের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনরকম ঝগড়াঝাটি বা তেমন কোন মনোমালিন্য হয় নি।

কোনরকম অফিসিয়াল্ গণ্ডগোল, আই মিন্ ডিফ্যালকেশন বা ফ্রড এই জাতীয় কিছু?

আজ্ঞে না স্যার, অফিসেও তেমন কিছু ঘটেনি। এই তো কদিন আগেই ওর অফিস থেকে সবাই এসে দেখে গেলেন। তেমন কিছু হলে তো তাঁরা বলতেনেই।

এবার একটু নিচু গায় ডাঃ সেন প্রশ্ন করলেন — আপনাদের কনজুগ্যাল লাইফ সুখী তো? কোন রকম ডিসহার্মোনী বা ডিস্‌পেয়ারিং ফ্যাক্টার কিছু নেই তো?

ইঙ্গিতটা বুঝতে পরে শিপ্রা মাথা নিচু করেই জবাব দিলেন—

আজ্ঞে না, সে সব কিছু নেই, আমরা দাম্পত্য জীবনে দুজনেই সুখী।

ডাঃ সেন যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন তো হবার কথা নয়। আজ সাতাশ বছর তিনি প্র্যাকটিস্ করছেন। বহু বিচিত্র রকম মেন্টাল কেস প্রতিদিনই তার কাছে আসছে। সিজোফ্রেনিয়া, প্যারাফ্রেনিয়া, প্যারানয়েড সাইকোসিস্, ম্যানিক ডিপ্রেশন, নানান ধরণের মানসিক রোগ। কিন্তু কোনটার ক্ষেত্রেই রোগের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করতে তাকে বেগ পেতে হয় নি। কোনরকম রেলিভ্যান্ট ফ্যাক্টার না থাকলে এই রকম একটা ম্যানিক ডিপ্রেশন হওয়া সম্ভব নয়।

ডাঃ সেন জানেন মনরোগীকে কেবল মাত্র ওষুধ খাইয়েই সুস্থ করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না তার কজেটিভ ফ্যাক্টারগুলোকে দূর করা যচ্ছে। সেজিন্য তিনি চিকিৎসার চাইতে বেশী জোর দেন রোগের ইটিয়োলজি বা রোগ উদ্ভবের কারণ খুঁজে বের করার উপব। এবং সেই কারণগুলোকে দূর করে, ওষুধ প্রয়োগ না করেই রোগীকে সারিয়ে তেলেন। এটাই তাঁর বিশেষত্ব।

ডাঃ সেন শিপ্রাদেবীর দিকে একবার তাকালেন। যেন খানিকটা জরিপ করে নিয়ে বললেন—

আপনার ইস্যু কটি?

শিপ্রা জবাব দিলেন — আজ্ঞে, এইটি আমার প্রথম ও একমাত্র সন্তান।

ডাঃ সেন এইবার শিপ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন দৃষ্টির সার্চলাইট ফেললেন। প্রশ্ন করলেন— আপনার স্বামীর এই রকম অ্যাবনর্মালিটি কি আপনার সন্তান পেটে আসবার পরেই শুরু হয়?

ডাঃ সেনের প্রশ্ন শুনে শিপ্রা যেন শক্ খাওয়া মানুষের মত চমকে ওঠে। তাই তো এ দিকটা তো একদম ভেবে দেখেনি সে।

উড়িষ্যার চাঁদিপুর সমুদ্রের সী বীচেই প্রদ্যুম্নর সঙ্গে শিপ্রার প্রথম পরিচয়। সে এক বানানো গল্পের মত। মনে পড়লে আজও শিপ্রার বুকের মধ্যে কাঁপন জেগে ওঠে।

স্কুলের কয়েকজন টিচার মিলে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেরিয়ে পড়েছিল তারা। বালেশ্বর জেলার চাঁদিপুর সমুদ্রের সী-বীচের বিশেষ, নাম-ডাক আছে।

ভ্রমণ বিলাসী, বিশেষ করে সমুদ্র বিলাসীদের কাছে চাঁদিপুর এক অনিবার আকর্ষণ। অমন বালুকাময় সমতল সী-বীচ ভারতে খুব কমই আছে। পাশেই মিলিটারি বেস। উঁচু সবুজ পাড় থেকে দু-তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অগভীর বালুতট। তার উপর দিয়ে ভেসে আসছে গেরুয়া রঙের ঢেউ। কখনো পায়ের পাতা, কখনো বা হাঁটু ছুঁয়ে যাচ্ছে ঢেউ-এর সোহাগ। বালুতীরে লাল-লাল সমুদ্র কাঁকড়াগুলো ছুটোছুটি করে খেলা করছে। ধরতে গেলেই এক ছুটে যে যার গর্তের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে ভেলভেটের মতো এই ছোট্ট প্রাণীগুলো। জোয়ারে সময় বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ঝাউবিছানো তীরের উপর। আবার ভাটার সময় পায়ের পাতাও ভেজেনা। অমন সুন্দর দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে যায়।

হ্যাঁ নেশাই ধরেছিল শিপ্রার। সর্বনাশের নেশা। গাছ-কোমর করে শাড়ি জড়িয়ে নিয়ে ছুটে ছুটতে সে চলে গিয়েছিলো সমুদ্রের অনেক ভিতরে। ক্রমে পায়ের পাতা থেকে হাঁটু, হাঁটু থেকে নিতম্ব এবং একসময় বুক পর্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। একসময় তার মনে হল সঙ্গীসাথীদের কথা। শিপ্রা পিছন ফিরে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না। অনেক দূরে কতগুলো কালো কালো মাথার মত দেখতে পেল সে।

ভয়ে ও আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে পড়ে শিপ্রা। সর্বনাশ! কতদূর চলে এসেছে সে। এখন তো আর ফেরাও যাবে না। জোয়ার আসবার সময় হয়ে গেছে। মিলিটারি বেস থেকে সাইরেন বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিপদ সংকেত। ক্রমে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে শিপ্রার গায়ের ওপর। শিপ্রা হাত-পা নাড়িয়ে চীৎকার করে ডাকতে থাকে তার সঙ্গীদের। কিন্তু অতদূর থেকে বিকট ওই সমুদ্র গর্জনের মধ্যে কিছুই শোনা যায় না। সমুদ্রের সেই গর্জনে তার ক্ষীণকণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যায়।

শিপ্রা সেই প্রবল ঢেউ ভেঙ্গে ছুটতে শুরু করে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ এর ভিতর চলা বড় সহজ কথা নয়। ঢেউ-এ তোড়ে সে কেবল আছড়ে পড়তে থাকে। ক্রমে তার দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে। হাঁটার ক্ষমতাটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। শিপ্রা চোখ বুজে প্রমাদ গোনে। অচৈতন্য হবার আগে বিধবা মা আর বোনের মুখ দুটো মনে পড়ে।

হাঠাৎ দুটো বলিষ্ঠ হাত শিপ্রাকে জল থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। শিপ্রা যেন ঘোরের মধ্যে দেখতে পায় এক অপরূপ পুরুষমূর্তি। শুনতে পায় তার কথা অস্ফুটে— ডোন্ট মাইণ্ড, আপনাকে রেসকিউ করার আর কোন বিকল্প ছিলনা। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। আর একটু দেরী হলে আপনাকে খুঁজেই পাওয়া যেত না।

শিপ্রা বাকশক্তিহীন প্রায় উলঙ্গ দেহটাকে সঁপে দেয় ওই অপরূপ পুরুষটির হাতে।

তীরে যেতেই শিপ্রার সঙ্গীরা হৈ হৈ করে ছুটে আসে। প্রদ্যুম্নকে ধন্যবাদ জানায়। বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ জানায়। দুজনের সেই প্রথম পরিচয়। কৃতজ্ঞতা পরিণত হয় আন্তরিকতায়। এবং আন্তরিকতা পরিণত হয় প্রণয়ে এবং অবশেষে পরিণয়ে।

এই পর্যন্ত এসেই গল্পটাকে আমরা শেষ করে দিতে পারি। ওদের দুজনকে ছেড়ে দিতে পারি সংসারের গড্ডালিকা প্রবাহে। থাকুক না ওরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে। জীবন সমুদ্রে ভেসে যাক ওদের ছোট্ট তরী। কিন্তু না এইখানে শেষ করে দিলে জীবনের এক কঠিন অধ্যায় ঢেকে যাবে অবথিত। জীবন তো ফুলের পাপড়ি বিছানো পথ নয়। মাঝে মাঝে কন্টকসঙ্কুলও। আসুন আমরা দেখি ওরা সেই পথ কেমন করে পার হয়ে যায়।

বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কোন সন্তান না হওয়ায় প্রদ্যুম্ন নিজের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য সে গোপনে প্যাথোলজিষ্ট ডাঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করে। সন্তান না হওয়ার জন্যে তবে কি তার নিজের শারীরিক দুর্বলতাই দায়ী? নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে যদিও সে নিঃসন্দেহ তবুও তার দেহে সন্তান হবার উপযোগী শুক্রকীট আছে কিনা সেটাও জানা একান্ত প্রয়োজন। ডাঃ দত্ত কলেজ জীবনে প্রদ্যুম্নর সহপাঠী ছিলেন সেই সুবাদেই প্রদ্যুম্ন তার কাছে সব খুলে বলল।

ডাঃ দত্ত তার সিমেন অ্যানালিসিস করালেন। সিমেন রিপোর্ট দেখে তিনি প্রদ্যুম্নকে জানালেন যে তার কোনদিন সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি সান্ত্বনা দিলেন প্রদ্যুম্নকে— এটা ভগবানের মার। প্রদ্যুম্নর কোন দোষ নেই। স্পার্মাটুজুয়া তার শরীরে একদম নেই। তিনি প্রদ্যুম্নকে পোষ্যপুত্র নিতে পরামর্শ দিলেন।

প্রদুম্ন ডাঃ দত্তের চেম্বার থেকে অত্যন্ত হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে অফিসে এসেও কাজে মন বসে না। শিপ্রাকে সে কি করে এই দুঃসংবাদটা দেবে। এ কথা জানতে পারলেই শিপ্রার স্বপ্নের স্বর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। জীবনে যে কোনদিন খারাপ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি। খারাপ সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সযত্নে আড়াল করে রেখেছে। আজ কিনা তারই ভাগ্যে ঈশ্বর এই কলঙ্ক লেপন করে দিলেন। সারাদিন ইস্কুলের পাড়ানোর ধকল সামলে শিপ্রা বাড়ি ফেরে। চোখে তার একটা স্বপ্ন— একটা ফুটফুটে সন্তান, প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে সকাল বিকেল দুবেলা। কখনো বা কচি কচি হাত-পা নেড়ে খেলা করছে ধবধবে বিছানোর ওপর। এমন একটা সুন্দর স্বপ্ন প্রদ্যুম্ন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দেবে? না তা হয় না।

গভীর গোপন

সুখবরটা শিপ্রাই তাকে শুনিয়েছিল প্রথম — একটা ভাল খবর দেব মশাই, বলুন কি খাওয়াবেন?

প্রদ্যুম্ন আঁচ করতে পারেনা কি এমন সুখবর? স্কুলে হেডমিস্ট্রেস পদে প্রমোশন, ডি.এ.বৃদ্ধি, আপগ্রেডেশন অনেকগুলি সম্ভাবনা তার মাথার মধ্যে খেলা করতে থাকে। শিপ্রা প্রদ্যুম্নর মাথাটা দুহাতে নিচু করে কানর কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলে— ইউ আর গোয়িং টু বি ফাদার।

-- হোয়াট? একটি আর্তনাদ ফুটে ওঠে প্রদ্যুম্নর মুখে। একটা শক্ খাওয়া মানুষের মত যেন সে স্থবির হয়ে দাঁড়ায়।

—কি হোল, বিশ্বাস হল না বুঝি? যাও এবার গরম গরম ফিশ্ ফ্রাই নিয়ে এসে খাওয়াও তো। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

শিপ্রার মা অচিরেই খবরটা চাউর করে দিলেন চতুর্দিকে। আত্মীয় স্বজন সবাই এক এক করে এসে কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে গেল। একটা চোরের মত নিঃশব্দে দিন কাটাতে লাগল প্রদ্যুম্ন। অফিস যাবার নাম করে এদিক সেদিক উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। একটা ঘোরতর সন্দেহ ফেনিয়ে উঠল তার মনের মধ্যে। তবে কি শিপ্রা? না-না, সে কি করে সম্ভব? এতদিনের চেনা। এত ভালোবাসার সম্পর্ক যার সাথে, কেমন করে সে এমন একটা জঘন্য কাজ করতে পরে? কি করেই বা এমন দ্বি-চারিণী হতে পারে? অনেকগুলো জিজ্ঞসা তার মনের মধ্যে অহরহ আঁকিবুঁকি কেটে চলল। কোন কোন দিন সে শিপ্রার পেছন পেছন অনুসরণ করতে লাগে। কোথায় কোথায় সে যায়। কার কার সঙ্গে মেশে।

শিপ্রাদের ইস্কুলের সেক্রেটারী পরেশ বিশ্বাস দেখতে সুদর্শন এবং বয়সেরও প্রদ্যুম্নর সমান। অর্থ-বিত্তবান। শিপ্রার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক। বস্তুতঃ শিপ্রার প্রমোশনের জন্য তার কৃতিত্বই বেশী ছিল। পরেশবাবু পুশ না করলে এটা কখনই সম্ভব হত না। কারণ শিপ্রার চেয়েও সিনিয়ার কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীকে ডিঙ্গিয়ে কেবল ট্যালেন্ট-এর ভিত্তিকে তাকে প্রমোশন দেয়া হয়। এ নিয়ে কিছুটা সমালোচনার ঝড়ও উঠেছিল। কিন্তু পরেশবাবুর খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থের কাছে সে সব সমালোচনা অল্প কিছুদিনের মদ্যে নতজানু হয়ে পড়ে।

শিপ্রার সঙ্গে পরেশবাবুর মেলামেশা, কতাবার্তা প্রদ্যুম্নর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। ক্রমে সে তার চলাফেরা, মেলামেশার ওপর নজর রাখতে শুরু করে। একটা বিশাল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছায়া ক্রমে তাকে রাহুর মত গ্রাস করতে শুরু করল। কিন্তু তেমন কোন সন্দেহমূলক কোন কিছুই সে খুঁজে পেল না।

শিপ্রার সঙ্গে স্কুলের সেক্রেটারী পরেশবাবুর আগে যেটুকু কথাবর্তা ও মেলামেশা ছিল এখন সে টুকুও দেখতে পেল না সে। প্রদ্যুম্নর নিজের কাছে নিজেকেই নির্বোধ বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না, কেমন করে এটা সম্ভব হল?

কলেজ জীবনে কোথায়, কার কাছে যেন সে একটা কথা শুনেছিল যে, কোন পিতাই নাকি নিশ্চিত করে বলতে পারে না, এটাই তার নিজের সন্তান। সতী-সাধ্বী স্ত্রীই কেবল বলতে পারে তার

সন্তানের পিতা কে? বহুবল্লভা নারী কখনোই বলতে পারে না তার সন্তানটির সঠিক জন্মদাতা কোনজন। প্রদ্যুম্নর মাথার মধ্যে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। ক্রমে সে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে। সংসারে প্রতি এক গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদ্যুম্নর মনের ভিতর শেকড় গাড়ে। নিজের অমন ফুটফুটে সন্তানের দিকে তাকাতেও যেন তার প্রবৃত্তি হয় না।

ডাঃ সেন এর প্রশ্ন শুনে বিদ্যুৎ চমকের মত শিপ্রার মনে পড়ে যায় এক দুর্যোগময় দিনের কথা। অন্ধ এক অতীত তাকে মূহূর্তে গ্রাস করে। বড় দিনের ছুটিতে সেবার স্কুলের সবাই মিলে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদ নবাব প্যালেস দেখতে। ওখানকার এক বাগান বাড়িতে উঠেছিল সবাই। সেখানে বনভোজনের আয়োজন হয়েছিল। হেডমিস্‌ট্রেস ও অন্যান্য সহ-শিক্ষিকারা গিয়েছিলেন শিপ্রার সঙ্গে। স্কুলের সেক্রেটারী পরেশ বিশ্বাসও গিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে। তিনিই তার ট্যুরিস্ট বাসটা দিয়েছিলেন আস-যাওয়ার জন্য। সকাল থেকে ঠাকুর-চাকরেরা রান্নাবান্নার কাজে লেগে গিয়েছিল। শিপ্রার হাজার দুয়ারী দেখার সখ বহুদিনের। তাই সে পরেশবাবুর ক্যামেরাটা চেয়ে নিয়ে ছিল ফটো তুলবে বলে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল সবাই। শিপ্রা ক্যামেরা নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাজারদুয়ারীর সমস্ত স্মৃতিচিহ্নগুলোর ছবি তুলছিল। কারণ, প্যালেসের ভিতরকার ছবি তোলা বারণ। শিপ্রার পেছুনে পেছনে পশেবাবুও ছাড়ার মত ঘুরছিলেন। হাঠাৎ পরেশবাবু শিপ্রাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যান। প্রাচীন, ভাঙ্গা, অন্ধকার ঘর। এই ঘরে নাকি সিরাজের কোন প্রিয়তমার সমাধি আছে।

অন্ধকার ওই ভুলভুলাইয়ার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে শিপ্রা যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পরেশবাবু চোখ দুটো লোভের লালসায় চকচক করে জ্বলে ওঠে। কথায় কথায় সে যেন বিবশ করে ফেলে শিপ্রাকে। অন্ধকার ঐ ঐতিহাসিক স্মৃতিভূমির পাশে এক কামোন্মও পুরুষের সাহচর্য এবং নিশ্ছিদ্র নির্জনতা সব কিছুর মিলিত প্রতিক্রিয়ায় শিপ্রা নিজেকে সমর্পণ করে বসে চতুর ওই পুরুষটির কাছে। সব কিছু বুঝে উঠবার আগেই শিপ্রা তার নারীত্বের পরম সম্পদটি হারিয়ে বসে। পরেক্ষণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তার সম্বিত ফিরে আসে। একটা প্রবল ঘৃণা ও অনুতাপ তাকে সাপিনীর মত হিংস্র করে তোলে। আহত বাঘিনীর মত সে ধেয়ে যায় সেই নরপশুটির দিকে। চীৎকার করে বলে ওঠে — 'এ আপনি কি করলেন! আমি বিবাহিতা।'

পরেশবাবু মনেও এই অনুতাপ ও অপরাধ বোধ সংক্রামিত হয়। বুঝতে পারে ক্ষণিক লালসায় সে এক অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে ফেলেছে। এ অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। শিপ্রার দুটি হাত ধরে সে প্রতিজ্ঞা করে এণন অপরাধ সে আর জীবনে কোনদিন করবে না। শিপ্রার পা দুটো ধরে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আত্ম-অনুশোচনায় বিহ্বল শিপ্রা অবশেষে নরম হয়ে পড়ে। কথা দেয় একথা সে কাউকেও বলবে না। তবে শর্ত — শিপ্রার সঙ্গে পরেশবাবু আর কোনদিন কোনও কতা বলতে পারবে না। একটা অন্ধ অতীত তার দরজা বন্ধ করে দেয়। কেউ জানতে পারে না সে কথা।

'কথায় বলে পাপ আর পারা কোনদিন চাপা থাকে না। সাইক্রিয়াট্রিস্ট ডাঃ রবীন সেন প্রদ্যুম্নর

ব্যক্তিগত ডায়েরী পড়ে জানতে পারেন, প্রদ্যুম্ন তার বন্ধু ডাক্তার অজিত দত্তকে দিয়ে সিমেন অ্যানালিসিস করিয়ে জানতে পেরেছিল যে তার সন্তান হবার কোন সম্ভবনাই নেই। ডায়েরীর মধ্যে তার সিমেন রিপোর্টটাও দেখতে পান তিনি। প্রদ্যুম্নর স্পার্ম এ্যাকাউন্ট একদম 'নিল্'। ডায়েরীর পাতায়ে বড় করে একটা শব্দ লেখা রয়েচে - অ্যাজুস্পারমিয়া।

একটা আবিষ্কারের আনন্দ ডাঃ সেনকে উৎফুল্ল করে তোলে। নিজের মেধা ও ইন্‌টিউয়িশনের যথার্থতা দেখে তিনি নিজেই বিস্মিত হন। কিন্তু পরক্ষণই সংসারের এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা চিন্তা করে বড়ই বিহ্বল হয়ে পড়েন। সংসারের ভিত্তিভূমি ভালোবাসা ও বিশ্বাস সম্পর্কে এক দার্শনিক উদাসীনতা তার মনে উদয় হয়। এই যদি গার্হস্থ্য জীবনের চেহারা হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কোথায় গিয়ে মুখ লুকোবে? সংসারের সবচেয়ে প্রিয়জন যে জীবনসঙ্গিনী তাকেও যদি বিশ্বাস ও নির্ভর করতে না পারা যায় তবে মানুষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কোন জঙ্গলে?

'বিশ্বাস্যো নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু'--- সংস্কৃত নীতি শাস্ত্রের সেই বস্তাপচা, বাতিল প্রবাদ-প্রবচন আবার কি জীবন্ত হয়ে উঠল? ডাঃ সেন একবার ভাবলেন, শিপ্রাদেবীর এই দুষ্কর্মের কথা তাকে সোচ্চারে জানিয়ে দেবেন। বলবেন— এ সন্তানের পিতা প্রদ্যুম্ন নয়, অন্য কেউ। জানতে চাইবেন — কে সেই তৃতীয় ব্যক্তি? ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক একটা মিথ্যার ইমারত। খুলে পড়ুক মিথ্যার কুটিল মুখোশ। কিন্তু না, পরক্ষণেই তার মনে পড়ে সে একজন ডাক্তার — 'ডামি গড'। মানুষকে বাঁচানোই তার ধর্ম। ভাঙ্গা নয়, গড়াই তার কাজ। তার একটা সামাজিক কর্তব্যও আছে। মানুষের রোগের চিকিৎসা করাই শুধু ডাক্তারের শেষ কর্তব্য নয়। রোগীকে যাতে সমাজে ও সংসারে পুনর্বাসন করা যায় সে দিকেও একজন সুচিকিৎসককে লক্ষ্য রাখতে হয়। একটা ভগ্নপ্রায় সংসারকে জোড়া লাগিয়ে তার মধ্যে সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনাই হবে তার সঠিক কর্তব্য।

ডাঃ সেন তার পরিকল্পনা ছকে নিলেন। প্রদ্যুম্নকে জানালেন তার কোন শারীরিক দুর্বলতা নেই। ডাঃ দত্তের সিমেন রিপোর্টে ভুল আছে। অনেক সময় এরকম ফ্যালাসি দেখা যায়। ডাক্তার দত্তের সঙ্গে তিনি এই বিষেয়ে পরামর্শ করলেন। ডাক্তার দত্তও এই প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং আগেকার রিপেটি-এর সঙ্গে তার রিপেটি যে ভ্রান্ত সেটাও জানালেন তিনি প্রদ্যুম্নকে। অন্য এক রোগীর রিপোর্ট-এর সঙ্গে তার রিপোর্টে'র গণ্ডগোল হয়েছে। এবং সেটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি অবার প্রদ্যুম্নর সিমেন অ্যানালিসিস করিয়ে জানলেন — তার শরীরে সন্তান হবার উপযোগী শুক্রকীট আছে।

প্রদুম্ন সেই কথা জানাতে পেরে আবার প্রাণবন্ত ও উচ্ছল হয়ে উঠল। নিজের ও নিজের স্ত্রী প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাস ফিরে এলে। ডাক্তার সেন শিপ্রাকে নির্জনে ডেকে বললেন — আপনার স্বামী এবার পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক। আমার মনে হয় আর কোন প্রবলেম অ্যারাইজ করবে না। তবে শিপ্রাকে দেখতে হবে প্রদ্যুম্নর মনে যাতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্ম নেয় এমন কোন কাজ যেন সে না করে। অর্থাৎ প্রকারন্তরে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি বুঝতে পরেছেন শিপ্রার পদস্খলন, কিন্তু সেটার যেন আর পুনরাবিৃত্তি না ঘটে। শুধু একটা কথাই তিনি শিপ্রাকে বললেন 'ইউ কি ক্যান বি ফুল ইওর হাজব্যান্ড বাট ইউ কান্ট বি ফুল দ্যা ডক্টর।'

আমাদের কাহিনীও শেষ হয়ে এল। কিন্তু এর মধ্যে একটা বিরাট কিন্তু রয়ে গেল। অভিনয়ের যেখানে শেষ, আসল নাটকের সেইখানেই শুরু। আমরা আশা করব, আর কোন দুর্যোগ ওদের সংসারকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি আবার কোনদিন প্রদ্যুম্ন জানতে পারে তার শরীরে সন্তান হবার উপযোগী ক্ষমতা নেই? যদি আর একাটি সন্তান চেয়ে এরপর তার ব্যর্থ হয়? তবে?

হ্যাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতে সে 'কিন্তু'র উত্তরও আছে। হয়ত বিজ্ঞান বলবে — সেটা সেকেণ্ডারী স্টেরিলিটি, প্রাইমারী নয়। আসুন আমরা ওদের সুখের ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসি। ওরা সুখে থাক, হাসিখুশি থাকুক।

নিরাময়ের আয়োজন

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

এভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন প্রবীরকে। তার মুখ থেকে মাসে দু একবার মদের গন্ধ পেলে লিপিকা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়। কলকাতার যাবতীয় আবর্জনা নিয়ে বয়ে যওয়া বাগজোলা ক্যানেল ইঁট ছোঁড়া দূরত্বে। তাই ভনভনে মশায় এ- বাড়ি সারাক্ষণ ভরে থাকে। স্কুলে থেকে ফিরে লিপিকা জানলাগুলো দিয়ে দেয় পটাপট। প্রথম বিকেল থেকেই ঘরে হাওয়া -বাতাস ঢোকা বন্ধ। কি রকম এক ভ্যাপসা গরমে এই ঘরের দুই বাসিন্দা লিপিকা আর রুদ্র ঘামতে থাকে। পাখার হাওয়া যথেষ্ট নয়। তার ওপরে দেয়ালের দিকে মুখ করে বিছানায় মশারির কোণে সরে গেলে তো আরও গরম লাগবে। লিপিকার আবার গরম বাতিক খুব। মাঝে মাঝেই মাঝারাতে উঠে ফ্রিজের কনকনে ঠান্ডা জল ঢকঢক করে গলায় ঢালে। সেই লিপিকাও রুদ্রের মুখ থেকে মাসে দু-একবার মদের গন্ধ পেলে দেয়ালের দিকে মুখ করে বিছানার কোণে গিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকবে। গরমে ঘেমে চান করে গেলেও রুদ্রের মুখোমুখি হবেনা।

কিন্তু সেই লিপিকা কি করে প্রবীরের এই মূহূর্তে এ-বাড়িতে বসে মদ খাওয়াকে মেনে নিচ্ছে। শুধু মেনে নিচ্ছে নয়, রীতিমতো প্রশ্রয় দিচ্ছে। লিপিকা রান্নাঘরে গিয়েছিল। ছোট্ট কাচের প্লেট হাত ফিরে এসে খুব প্রগলভ হেসে বলল, টোম্যাটো সস আর পেঁয়াজ ছাড়া কিচ্ছু নেই এ-মুহূর্তে ......

কাফি, কাফি বলে দাড়ি চুলকে গোঁফের নিচে সরু হাসি ভাসিয়ে তুলল প্রবীর। হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিয়ে নিল। সামনের ছোট বেতের টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে বল, একটু জল লাগবে যে......

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছি ......। লিপিকা সহজ ভাবে ঘাড় নাড়ে।

রুদ্র দেখে লিপিকার দুচোখে প্রবীরের মদ্যপান নিয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কি করে হচ্ছে এটা। রুদ্রর চোয়াল দুটো মৃদু শক্ত হয়। জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তায় অলস রোদের মধ্যে দিয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভ্যানরিক্সায় চলে যাওয়া দেখে। ওদের স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে। তার মানে সোয়া বারোটা। এ - সময় রুদ্রকে একতলায় গিয়ে রিজার্ভারেরর চাবি খুলে দিতে হয়।

লিপিকা স্কুলে চাকরি করে। রুদ্রকে তাই সামলাতে হয় ঘর সংসার। এতে অবশ্য কোন অসুবিধে নেই রুদ্রের। ঘরের কাজ করেও সময় পাওয়া যায় অনেকটা। দশটা-পাচঁটার অফিস করলে কি এতটা সময় পাওয়া যেত। তখন কোথায় থাকত তার ছবি আঁকা। এই বেশ ভালো আছে। রুদ্র খদ্দরের পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেতের চেয়ার ছেড়ে একটু তাড়ার ভাব এনে উঠে দাড়ালো, প্রবীরকে বলল, তুই বোস, আমি নিচে গিয়ে রিজার্ভারের চাবিটা খুলে দিয়ে আসি, না হলে সারাদিন আবার জল খাওয়া যাবেনা........।

প্রবীর বলে উঠল, বসব কি করে, তুই খাবিনা! ওসব চাবি-টাবি পরে খুললেও চলবে, তুই

বোসতো.......। লিপিকার দিকে তাকিয়ে বলল, ঐতো, ও খুলে দিয়ে আসবে.......

রুদ্র আলতো করে দেখল লিপিকাকে। এমন কথার পরেও লিপিকা নীরব। সে যদি বলত কথাগুলো। তাহলে তো এতক্ষণে বাতাসেও আগুন ধরে যেত। একদিন সবে রঙে তুলি ডুবিয়েছে। লিপিকা সেদিন বাড়িতে। মাধ্যমিকের মেয়েদের টেস্টের খাতা দেখছে। বিছানায় শুয়ে দেখল ঘড়ির ওপরে চোখ পড়ে যাওয়ায় বারান্দায় রঙ তুলি নিয়ে বসে থাকা রুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেছিল, কি গো নিচে গিয়ে রিজার্ভারের চাবিটা খুলে দিয়ে এসো না.........

রুদ্র বিরক্ত হয়েছিল। রেগে উঠেছিল। উচুঁ গলায় বলেছি, আমি ক্যানভাসে রঙ চাপিয়েছি ....

আমি খাতা দেখছি—

তোমার খাতা দেখা আর আমার ছবি আঁকা এক হল?

সব মানুষের কাজই কাজ, সকলেই সমান, এই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবনাটা তোমার কথার ভিতরে থাকে সেটা আসলে বানানো বলো।

রুদ্র ও কথার উত্তরে রীতিমতো খেপে উঠেছিল। প্রায় চেঁচিয়ে বলেছিল, ছাত্রী পড়াতে পড়াতে তুমি সবাইকে তোমার ছাত্রী মনে করতে শুরু করেছ, সব সময় অমন দিদিমণিমার্কা কথা বোলোনা ....

দির্মিণিমার্কা কথা! কেন এই দিদিমণির কথাই তো তোমার ভাবনায় স্ফূরণ ঘটাতো একসময়......। কথাগুলো বলে ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গিয়েছিল লিপিকা চাবিটা খুলবে বলে।

ঐ ঘটনার পরে নিজের সঙ্গে নিজেই একটা সামঝোতা করেছিল রুদ্র। এ-বাড়িতে, এ-সংসারে থেকে ছবি আঁকতে গেলে কিছু কিছু কাজ তাকে করতে হবে। ও নিয়ে রাগ করলে চলবেনা। ছবিকেই জীবনে সবচেয়ে বেশী ভালোবসেছে। তাই আর অন্যকিছু ভাবেনি। স্কুলের গণ্ডীও পেরনো হয়নি। একটা নির্ভরতা দরকার। নির্ভরতার জন্যে সেই সব দিনে আকুল হয়ে উঠেছিল রুদ্র।

ছবি, শিল্প, নাটক, কবিতা নিয়ে তাদের যে কফিহাউসের জগৎ ছিল সেখানে এসে পড়েছিল লিপিকা, তার জগৎ এম.এ, এম. ফিল, বি. এড.। সেই জগতের ছত্রে ছত্রে কত মহান স্রষ্টার কথা। তাদেরই তো বীজ ঐ রুদ্র, শ্যামল, প্রবীর, অনির্বান আরও কতোজন। এমনই মনে হয়েছিল লিপিকার। জাড়িয়ে গিয়েছিল রুদ্রের সঙ্গে। তারপর ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণেশ্বর, কোলাঘাটে কত না জলরঙের ল্যান্ডস্কেপের সাক্ষী হওয়া।

কিন্তু রুদ্র মনে করে ঐই জড়িয়ে যাওয়া আসলে লতাগুল্মের কোন শক্তপোক্ত গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে যাওয়া। কোন মূল্যবান লতাগুল্ম যা দিয়ে হয়ত তৈরী হয় পৃথিবীর কোন মহৌষধি, তার তো বেড়ে ওটার সময় কোন না কোন অবলম্বনের দরকার হয়। সেই লতাগুল্ম যখন পুরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তার দাম হয় সহস্র কোটি মুদ্রা। অথচ তারও তো বেড়ে ওটার সময় সামান্য একটা বাঁশের খুঁটির অবলম্বনের প্রয়োজন পড়ে। রুদ্র মনে করে সে লতাগুল্ম আর লিপিকা যেন সেই অবলম্বন। দুজনের ভিতরে এখন যে সম্পর্ক তার এমনই এতটা মানে ঠিক করে নিয়েছে রুদ্র। না

হলে আর কি-ই বা রয়ে গেছে এই সম্পর্কের ভিতরে........

লিপিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রুদ্র-র তো তাই মনে হয় যে শিল্পীকে জানতে গিয়ে জানার ইচ্ছে থেকে মিশতে এসে তাকে ভালোবেসে ফেলার কথা লিপিকা যা বলত তা তো মিথ্যে, সত্যি আসলে সাধারণ মানুষের শিল্পীর প্রতি যে একটা অলীক মোহ থাকে তার থেকেই নিজেকে ও জড়িয়ে ফেলেছে রুদ্রের সঙ্গে, এখন বুঝতে পারে ভুল করেছে, তাই বেশী বেশী করে সংসারী হয়ে উঠতে চায়, সংসারের জাঁতাকলে পিষে ফেলতে চায় রুদ্রকে।

কিন্তু অনেকদিন পরে, প্রায় এক যুগ পরে এ-বাড়িতে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে ঐই সংসারিক আবহাওয়া, এই নিয়মের পরিমণ্ডল, লিপিকার পছন্দ-অপছন্দে যে সীমারেখা তা যেন অতি সহজেই ভেঙে দিচ্ছে প্রবীর। কি করে হচ্ছে এটা! প্রবীর পেরে উঠেছে? নাকি লিপিকাই ওকে পেরে উঠতে সাহায্য করছে? কফিহাউসের সেই আড্ডায় থাকত ছবি আঁকিয়ে রুদ্র, কবিতা আর লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে থাকা প্রবীর, এম টেক-এর শ্যামল, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি-তে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট করতে আসা নম্রতা আর সায়নী, লিপিকা যেন কিভাবে জুটে গিয়েছিল। পুরো দস্তুর ঝালমুড়ি আড্ডা। আড্ডা চলাকালীন কে যেন একবার হো-হো করে হেসে উঠে কথাটা বলেছিল। হাসেনি শুধু প্রবীর, সিরিয়াস স্বরে বলেছিল ওরকম চিপ্ করে দিসনা ব্যাপারটাকে, ঝালমুড়ি আড্ডা না বলে বল এই সময়ের আড্ডা............

প্রবীর কবিতা লিখত। কথা বলত কবিতার মত। সমস্ত জীবনযাপনটাকে কবিতা করে তুলতে চেয়েছিল। এমন এমন কথা বলে উঠত যে আড্ডার গতি স্তব্ধ হয়ে যেত। চিন্তাশীল হয়ে উঠত সকলে। রুদ্র লক্ষ্য করেছে কয়েক মূহুর্তের জন্য আড্ডা থামিয়ে সকলেই প্রবীরের কথাগুলো নিয়ে ভাবলেও শেষ পর্যন্ত প্রবীরের ব্যাপারে কেউই উৎসাহী করে তুলতে পারেনি কোনদিন। মেয়েদের মধ্যে কোন আবেদনই তৈরী করতে সক্ষম হয়নি প্রবীর। কিন্তু আজ রুদ্রর শুধু মনে হচ্ছে প্রবীর সম্পর্কে যা ভেবেছে, যা জেনেছে তা হয়ত সবই ভুল। লিপিকার হৃদয়ের গভীর আড়ালে প্রবীরের প্রতি ক্ষীণ একটা দুর্বলতা হয়ত রয়েছে, ঔজ্জ্বল্যহীন, সবসময় এক দু চোখে এক বিচিত্র উদাসীনতা লেগে থাকা পাগলাটে বেনিয়মী প্রবীরকে জীবনসঙ্গ হয়ত করেনি লিপিকা কিন্তু হৃদয়সঙ্গী করেছিল আড়ালে। প্রবীরের অনুপস্থিতিতে ওর কথা উঠলে লিপিকা হাসতে হাসতে বলত, কিরকম ছাগলের মত চোখ দুটো না। কথাটা বলত আর বলেই ফের হেসে উঠত। অথছ আজ কেন জানে না রুদ্রর বারবার মনে হচ্ছে ঐ হাসিটা নিখুঁত অভিনয় ছিল লিপিকার।

না হলে এমনভাবে প্রশ্রয়টাকে বাড়িয়ে তুলছে কেন লিপিকা! দীর্ঘদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হঠাৎ করে প্রবীরের এ-বাড়িতে প্রবেশের পর থেকেই রুদ্রের ওপরে লিপিকার ভিতরে একটা প্রবল রাগ জন্ম নিয়েছে। সেটা বুঝেছে রুদ্র। এটাও বুঝেছে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। মেটাক না যত খুশি রাগ। কিন্তু অত তাড়ার কি আছে। আগে প্রবীর এ-বাড়ি থেকে চলে যাক। একটা মিথ্যে গল্প, কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে প্রবীরকে বাসে তুলে দিয়ে আসুক রুদ্র। তারপর নয় হবে। অথচ তা না করে এ-বাড়িতে যাতে প্রবীর আরও কিছুক্ষণ তাকে তারই আয়োজন

করছে লিপিকা। প্রবীরকে যেন একটা অস্ত্র করে তুলে ধরছে তার বিরুদ্ধে সেই রাগটাকে মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে। এটা কি শুধুই রাগ মেটান নাকি একভাবে পুরনো বন্ধুর প্রতি ঘুমিয়ে থাকা পুরনো রোমাঞ্চকে জাগিয়ে তোলা?

নিচে রিজার্ভারের চাবি বন্ধ করার জন্যে এ-ঘর থেকে যাওয়ার সময় দেখেছিল দুটি গ্লাসে পেগ বানিয়ে ফেলেছে প্রবীর। নিচ চাবিটা বন্ধ করে ওপরে ফিলে আসতে একটু বেশীই সময় নিয়েছিল রুদ্র। আর ওপরে ফিরে মদ ঢালা গ্লাস দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল, আমি তো খাবো না.........

প্রবীর ঠোঁটে মৃদু হাঁ এনে বলেছিল, খাবিনা মানে।

খাবোনা মানে এ-সময়ে আমি খাইনা......

এ-সময় তুই খাসনা। কথাটা বলে প্রবীর হো-হো করে হেসে উঠেছিল, লিপিকার চোখে চোখে রেখে ফের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েছিল রুদ্রে দিকে, বলল, বিয়ের পরে খুব উন্নতি হয়েছে রে তোর.........

রুদ্রে চেয়ার চেনে বসতে বসতে বলল, উন্নতির কি হল এতে, সাতসকালে তুই ছাড়া দেশে মদ্যপান করেটা কে........

রুদ্র লক্ষ্য করল একথায় প্রবীরের মধ্যে সামান্য বাবান্তরও ঘটলনা। নিজের গ্লাসে জল ঢেলে রুদ্রের উদ্দেশ্যে বলল, দ্যাখ্ তোর গ্লাসে কতোটা জল ঢালব—·

আমি খাবোনা প্রবীর........। রুদ্রর স্বর এখন বেশ গম্ভীর। আড় চোখে তাকাল লিপিকার দিকে। আশা করেছিল লিপিকার দিক থেকে সকালবেলাতেই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসবে। কিন্তু রুদ্র লক্ষ্য করেছিল সেই মুহূর্তে লিপিকার চোখে কোন প্রতিবাদ তো নেই-ই উল্টে প্রচ্ছন্ন এক প্রশ্রয়। খুব কৌতুক ভরা চোখে প্রবীরের গ্লাসের মদে জল মেশান দেখছে।

একটা গ্লাস উচুঁ করে রুদ্রে-র মুখের সামনে তুলে ধরল প্রবীর, বলল, নে। গ্লাসটা নিয়ে নিল রুদ্র। প্রবীর বলল, কফি হাউসের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, তখন তো কোন কোনদিন তুই আর আমি মদ দিয়ে মুখ ধুয়েছি........

রুদ্র উত্তর দিল না। প্রবীরের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বসে শেষ করে ঠক্ শব্দে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপরে। প্রবীরের মনে হল রুদ্র আজ তার সঙ্গে মদ্যপান করছে না, ডাক্তারের নির্দেশে কোন তেতো ওষুধ গিলছে।৷ লিপিকা ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা বোসো তাহলে, দেখি পাশের পাড়া থেকে কিছু আনা যায় নাকি—

প্রবীর বলে উঠল, পাশের পাড়া কেন!

এ-পাড়ায় তো আজ সব দোকান বন্ধ, সোমবার না......

লিপিকা চলে গিয়েছিল। আর রাগে গা রি-রি করে উঠেছিল রুদ্রের। এতটা আবেগ, প্রবীরের প্রতি লিপিকার এতো আতিথ্যের হেতু। মাসের মধ্যে একদিন দুদিন তার মুখ থেকে মদের গন্ধ যার কাছে অসহ্য সেই এখন মদের চাটের জন্যে পাশের পাড়ার দোকানে ছুঠছে। সকালে হঠাৎ করে প্রবীর

যখন ঢুকে পড়েছিল এ-বাড়িতে চমকে ওঠে রুদ্র। শেষ পর্যন্ত চলে আসবে কল্পনাতেও আনতে পারেনি। আজকাল তেলরঙের কাজ আর করেনা রুদ্র। করেনা বললে, ভুল, আসলে ক্যানভাসের ওপরে তেলরঙের কাজে যে ছবি, শিল্পীর এক একটি অনিদ্য সুন্দর ভাবনা ফুটে ওঠে তা আর আজকাল রুদ্র-র কল্পনা জগতে স্থান করে নিতে পারেনা, আজকাল আর ভাবনার জন্ম হয় না তার মস্তিস্কে। আর হয়েই বা কি লাভ। ছবিগুলো তৈরী হওয়ার পরে একজিবিশন করো। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাও। বিদেশে পৌঁছে দাও। হাজার পরিশ্রম। এরপরেও ছবি বিক্রী হবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার থেকে কলেজ স্ট্রীটে বড়ো প্রকাশকের ঘরে বই-এর প্রচ্ছদ, লে-আউট করলে পয়সা খারাপ পাওয়া যায় না। পরিশ্রমও কম।

কিন্তু লিপিকা বলেছিল তোমাকে অত পয়সার চিন্তা কে করতে বলেছে। সে তো আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু মন দিয়ে ছবি এঁকে যাও। উত্তরে রুদ্র ঠোট ফাঁক করে সিগারেটের ধোঁয়া সরু করে ছেড়ে দিয়েছিল ঘরের সিলিঙের দিকে। বলে উঠেছিল, ধ্যুৎ যা বোঝোনা তা নিয়ে কথা বলো কেন। এক অবরুদ্ধ ব্যথায় লিপিকার ভিতরটা কঁকিয়ে উঠেছিল। সে বলতে পারেনি তুমি ঠিকই বলেছ, আমি ছবির কিছু বুঝিনা, কিন্তু আমি তো কোনদিন ছবি বুঝতে চাইনি, বুঝতে চেয়েছি শুধু ছবি আঁকিয়ে মানুষটাকে, সেই যে কফিহাউসের দিনগুলোতে তোমার ক্ষয়াটে গাল, সামান্য কোটরাগত চোখ, চোখের নিচে কালি, দীর্ঘ নাকের নিচে শুঁয়োপোকার রোমের মত গুঁড়ো গুঁড়ো গোঁফ, অর্ধজ্বলন্ত বিড়ি, আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ভাবনা-কথা আমি যে সেই রুদ্রকেই ভালোবেসেছি, সেই রুদ্রকেই চেয়েছি। এই যে এখন তুমি কত পরিণত, কত সফল, দাবানলের মত আবেগ আর কণ্ঠ বেয়ে বেরিয়ে আসেনা এখন, এখন কাকে কি কথা বলেল সন্তুষ্ট করা যায় জেনে গেছ, এখন তোমার গাল আর ক্ষয়াটে নয়, হাসলে মেদ ঢেউ তোলে থুতনির নিচে, বিড়ি নয় কিং সাইজ এখন তোমার ঠোঁটে— এই উজ্জ্বল রুদ্রকে যে আমি কোনদিনও চাইনি, এই উজ্জ্বল রুদ্র তো আসলে রুদ্রের মৃতদেহ........। লিপিকা বুঝেছিল এই কথাগুলো। তারপক্ষে রুদ্রকে বলা সম্ভব হয়নি কারণ ঐ শেষের ভয়ঙ্কর শব্দটা তার পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন ছিল।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ার প্রকাশকের ঘর থেকে ফেরার পথে কফিহাউসের দরজার সামনে দেখা হয়ে গিয়েছিল প্রবীরের সঙ্গে। চমকে উঠেছিল রুদ্র। এ কি চেহারা করেছিস। রুদ্র দেখেছিল চুল উঠে মাথার ওপরে জায়গায় জায়গায়। টাক পড়ে গেছে প্রবীরের। গাল আরও ঢুকে গেছেচ দু চোখে অদ্ভুত এক হলুদ ছোঁয়া। যেন অনন্ত জন্ডিস ওর সঙ্গী। কি করছিস? উত্তরে ওর সম্পাদনায় সাত বছর ধরে চরম অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পাওয়া লিটল ম্যাগাজিনের নবতম সংখ্যাটি ধরিয়ে দিয়েছিল রুদ্রর হাতে। আর ফিসফিস স্বরে বলেছিল, কোন জায়গা থেকে ধারে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দে না, আগামী ইস্যুটা না হলে বেরবেনা, দরকার হলে সুদ দেবো.......

রুদ্র প্রায় হেসে ফেলেছিল। শীর্ণ প্রবীর আরও শীর্ণ হয়েছে। লাঠির মত প্রবীর সরলরেখা হয়ে গেছে। মানুষটাই নেই। আসল নেই যেখানে সুদ আসবে কোথা থেকে। তাই বলেছিল, এভাবে নিজেকে ক্ষয় করে কি লাভ।

প্রবীর যেন চমকে উঠেছিল, এটাকে তুই ক্ষয় বলছিস। এটা যে কি ....

নিজের থেকেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল প্রবীর, বলেছিল, ঠিকানা দে, একদিন যাবো.........

ঠিকানা দিয়েছিল রুদ্র। তারপর লিপিকার কথা জিজ্ঞেস করায় রুদ্র বুঝেছিল তাদের বিয়ের কথাটা জানেনা প্রবীর। গোপন কৌতুকে বলেছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয়না রে, তোর সঙ্গে হয়?

লিপিকার সঙ্গে রুদ্রর দেখা হয় না কথাটা শুনে প্রবীরও অবাক হয়েছিল। কফিহাউসের সেই আড্ডায় সকলেই তো জানতো মাটির বুক থেকে হিমালয়কে সরিয়ে ফেলা সম্ভব কিন্তু লিপিকার কাছ থেকে রুদ্রকে বা রুদ্র-র কাছ থেকে লিপিকাকে সরিয় নেওয়া সম্ভব নয়। সেই লিপিকার সঙ্গে রুদ্রর এখন আর দেখা হয় না। প্রবীর মনের রুদ্ধ অর্গল খুলে দিয়েছিল। বলেছিল, আমি জানতাম ও কোথাও নোঙর করবেনা, শুধু এ ঘাট থেকে ও ঘাট, ও ঘাট থেকে সে ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাবে।

এক কপট সিরিয়াস ভাব মুখে চোখ আটক সেই মুহূর্তে প্রবীর কথা বলার উৎসাহকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রবীর লিপিকাকে ঘিরে তার মনের গভীর বেড়ে ওঠা অনেক ভাবনার কথা বলে ফেলেছিল। আর রুদ্র তখন নীরবে হো- হো করে হাসছিল।

আজ সাকলে এ-বাড়িতে ঢুকে সিঁথিতে সিঁদুর টানা, হাতে শাঁখাপলা পরা লিপিকাকে দেখে চমকে ওঠে প্রবীর। সেই মুহূর্তটা যে কি চরম অস্বস্তিতে কেটেছে তা একমাত্র রুদ্রই জানে। আসলে সে তো কল্পনাও করতে পারেনি প্রবীর শেষ পর্যন্ত চলে আসবে। আর সকালের সেই প্রাথমিক পর্বে রুদ্র আর প্রবীরের কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে লিপিকাও বুঝেছে রুদ্র প্রবীরের কাছে তাদের বিয়ে হওয়ার কথাটা গোপন করেছে। প্রবীরের দুটি বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে জানায় তো নি উল্টে প্রবীরকে নিয়ে এক নিষ্ঠুর কৌতুক করেছে রুদ্র। কেন, কেন এরকম হয়ে উঠছে রুদ্র? এখন তো রুদ্রের ব্যথা, জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা অনেক কম। তাহলে। আচ্ছা ব্যাথা মরে গেলেই কি মানুষ নিষ্ঠুর কৌতুকপ্রিয় হয়ে ওঠে......

কিন্তু সেটা কি? ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা লিপিকা।

দু পেগ মদ সাতসকালে শরীরে যাওয়ায় স্নায়ুগুলো সব ধনুকের টানটান ছিলা হয়ে উঠেছে। রুদ্র নিচে নেমে আসতে দেখল রান্নাঘরে ডিমের ঝুরি ভাজছে লিপিকা। ওর ঠিক মনে আছে প্রবীরের প্রিয় চাট কি। এপাড়ায় দোকান বন্ধ বলে পাশের পাড়ার দোকান থেকে ডিম আর পেঁয়াজ নিয়ে এসে ঝুরি ভাজছে লিপিকা। রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষে প্রবীর বলল, এটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

---- কিসের বাড়াবাড়ি?

---- ওকে তুমি মদ খেতে অ্যালাও করলে কেন?

---- অ্যালাও করার কি আছে, তোমার পুরানো বন্ধু। একসঙ্গে অনেক মদ খেয়েছো, তাছাড়া ও আড্ডার মাঝখানে যেভাবে বোতলটা বের করল তাতে না করি কি করে ....

---- না কর কি করে.........। রাগে ভেংচে উঠল রুদ্র, কেন, আমার মুখ থেকে মাঝেমধ্যে গন্ধ পেলে তো দেওয়ালের দিকে মুখ করে শোও। তাও তো আগের মত রেগুলার খাই না.........

---- তুমি তো নিজের জন্য খাওনা, তুমি তো এখন মদ খাও তোমার দরকারি লোকদের খুশী করার জন্য, কিন্তু প্রবীর খায় নিজের জন্য.........

---- তাতে হয়েছেটা কি?

লিপিকার ভেতরে এর জন্য তেমন কোন ভাবান্তর হয় না। নির্লিপ্ত স্বরে বলে, হবে আবার কি, বলছিলাম শুধু তফাৎটার কথা, ওর আর তোমার তফাৎ, তুমি অনেক দূর এগিয়েছ, অনেক সুন্দর হয়েছ, কিন্তু মজাটা হল তুমি থাকতে পারোনি......... ও ক্ষয়েছে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে আরও শীর্ণ হয়েছে , কিন্তু ও প্রবীরই থেকে গেছে , এখনও আগের মতই ব্যাথা পেতে জানে , সকালে ও যখন সবে এ বাড়িতে ঢুকেছে দেখলেনা আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেখে কিরকম বিহ্বল হয়ে পড়ল, কেনো জানাওনি ওকে আমাদের বিয়ের কথাটা!

রুদ্র মেঝের ওপরে দৃষ্টি নামিয়ে আনে, বলে, বিশ্বাস করো অতো ভেবে চিন্তে ব্যাপারটা আমি করিনি, সেদিন ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে হঠাৎ করে ওকে নিয়ে একটু মজা করতে ইচ্ছে হয়েছিল

মজা! হাঁ করে রুদ্রর দিকে তাকাল লিপিকা! বলল, তুমি না শিল্পী, ছবি আঁকো ....

আঁকি তো। এবার রুদ্র অবাক।

প্রবীর তো কবিতা লেখে, লিট্‌ল ম্যাগাজিন করে, ওতো শিল্পী, একজন শিল্পী আরেকজন শিল্পীকে নিয়ে এভাবে মজা করতে পারে। কৌতুকপ্রিয় হয়ে উঠতে পারলে এমন করে।

এখন রাত্রি- সমুদ্রের নীরবতা এই জনবসতিপূর্ণ লোকালয়ের ঘরটিতে।

লিপিকা বলে, তো তোমার ভেতরের শিল্পী মানুষটা মরে গেলে আমি কাকে ভালবাসবো বলোতো ....

রুদ্র ধীর পায়ে রান্নাঘরের সামনে থেকে সদরের দিকে চলে আসে। প্রবীর বলছিল সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। সিগারেট আনতে হবে এখন।

সিগারেট আনা নয়। রুদ্র আসলে পালালো। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিল রুদ্র, কেন লিপিকা প্রবীরের মদ খাওয়াটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রবীর তো আসলে মদ্যপান করছে না। প্রবীর তার শরীরের সৃষ্ট ক্ষতের নিরাময় করছে, যে ক্ষতটা সৃষ্টি করেছে রুদ্রের কৌতুক।

ডেট

বিধান মজুমদার

ট্রেনটা ছাড়ব ছাড়ব করছে, একবার ভাবছি উঠে পড়ি, পরক্ষণেই ভাবনাটা পাল্টে যাচ্ছে, কেন যে পাল্টে যাচ্ছে, ভাবনার নামাওঠায় শেষপর্যন্ত কয়েক পা ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরায় ছিটকে এসে শরীরটা জব্দ হল যেখানে সেখানেই সেই মূর্ত্তিমান। পা ফাঁক করে দু'ধারের দুই রো'র মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দাঁড়ানো অবস্থানেই চারদিক চোখ ঘুরাচ্ছেন, নাচাচ্ছেন, হেলছেন দুলছেন। ওঁকে পাশ কাটাতে না পারলে ভেতরে সেধোঁনো অসম্ভব, কিছু বলতে যাব, মুখের দিকে তাকাতেই দু'পা পিছিয়ে গেলাম। ভয়ংকর কঠিন, ঋজু, চোখ দুটো যেন আমাকে গিলছে। অজান্তে কোনো অপরাধ করে ফেলেছি কি! ট্রেনে ওঠার সময় অথবা ছিটকে এসে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে! এভাবে আমার দিকে তাকানোর অর্থ কি!

আরও দু'পা পিছিয়ে এসে কমপার্টমেন্টের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম চোখটা নামিয়ে। ওঠানামার ব্যস্ততা আর নেই। অনেকে ভেতরে সেঁধিয়ে জায়গা দখল করে বসেছে। দু'চারজন এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে। ঋজু হয়ে। আমিই শুধু জবুথবু। মূর্তিমানের সামনে জবুথবু। ভয়ে ভয়ে চোখটা আবার ওঠালাম। এবার আবার মূর্তিমান ভদ্রলোকের অন্যরকম চেহারা। থুতনির মাঝে চেরা ভাঁজ। চোখ দুটি নরম। আমাকে গিলছে না, আপ্যায়ন করছে। তবে পা দুটি আগের যেমন বিঘৎ কয়েক ফাঁক করে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এখনও তাই। আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সোজাসুজি তাকালাম। আঁতকে ওঠার কথা নয় কিন্তু আঁতকে উঠলাম। চোখ দুটো নরম করায় মুখাবয়বটাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তাই হয় না কি! মুখের ডৌলে আমার ছাপ। আমার মতই চওড়া কপাল, বাম দিক ঘেঁসে সরু সিঁথি, আমারই মতন। গায়ের রঙ, নাক, ঠোঁট ঠিক আমারই। বয়সটা ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না, পঞ্চাশ পঞ্চান্নর কাছাকাছি। অর্থাৎ আমার যা বয়স। দু-চার বছরের ছোটবড়।

মূর্তিমান ভদ্রলোকের চোখ জোড়া কি অন্যদিকে ঘুরল! একটু আগেই আমাকে দেখছিলেন অপাঙ্গে। পা থেকে মাথা, মাথার চুল পর্যন্ত। আমি কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমিও কি রকম আশ্চর্য, তাঁর চোখ অন্যদিকে ঘুরলেও, তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছি। দেখছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হারিয়ে যাওয়া কাউকে যেমন লোকে দেখে। আমার পেছনে এবং সামনের যাত্রীরা চলমান দৃশ্যের দিকে তাকাচ্ছে, গাছপালা জীবজন্তু বাড়িঘরের দিকে, কেউ কেউ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছে আড্ডার মেজাজে অথচ এদের মাঝেই দাঁড়িয়ে আমার চক্ষু স্থির নিস্পন্দ নিষ্পলক ওই মানুষটির দিকে।

নেক্সট্ ষ্টেশন আসছে, এসেই প্রায় পড়েছে। ভদ্রলোক চোখ রাখলেন প্লাটফর্মের প্যাসেঞ্জারদের দিকে। ট্রেন ইন্ করছে। নামাওঠায় ব্যস্ত যাত্রীকূল। একবারই মাত্র সামান্য সময় চোখ অন্যদিকে চলে গেছিল, এখন আবার স্থির মূর্তিমানের দিকে। যেভাবে গেটের সমানে যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি চলছে, সে দিকেই চোখ আটকে থাকার কথা কিন্তু চেষ্টা করেও চোখ ঘোরাতে পারছি না। অথচ টের পাচ্ছি

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই নরম শীতেও আমার শরীর বেয়ে কুলকুল ঘাম নামছে, কপাল, চোখ, চোখের নীচে জব জবে ঘাম জমছে—স্পষ্ট ঘাম নামার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হৃৎপিণ্ডও কি ঘামছে। রক্ত ঝরছে কি! একটা তীব্র রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডের আনায় কানায় ঘাই মেরে চলেছে। আমি ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছি।

ট্রেন প্লাটফর্ম ছাড়ছে। ঝিঁ ঝিঁ শব্দে কিংবা হিক্ হিক্ শব্দে। ঠিক কি শব্দে স্পষ্ট হচ্ছে না। শব্দটা বড় অন্তর্ভেদী, বড় জ্বালাময়। এই শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূর্তিমান ভদ্রলোক ঘাড় ঘোরালেন। আমার দিকে ফিরলেন কি! হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার দিকে ফিরে আমার চোখের পর চোখ রাখলেন। চোখে ধমক। আমার মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছে। ভয়ংকর টেনসনে ভুগছি। অথচ আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কতকিছু ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ভদ্রলোক কি আমার কেউ — আমার কোনো—কিংবা আমিই —মুখ দিয়ে একটি কথাও বলেন নি অথচ কি আশ্চর্য, আমি সর্বক্ষণ ভেবে গেছি উনি আমার কানে ফিসফিসিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন—ধমকে যাচ্ছেন— যেন আমি বিনা টিকিটে ভ্রমন করছি, আমার কোনও বোধবুদ্ধি নেই—রানিং ট্রেনে পকেটমারদের মত লাফিয়ে উঠি—ষাঁড়ের মত চিৎকার করে আশপাশের লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নিজের বসার জায়গাটা করে নেই।

আচ্ছা, মূর্তিমান আমার ছোটবেলার বন্ধু নীহার নয় তো! ফুটবল, হা-ডু-ডু, চু কিৎ কিৎ খেলেছি একসাথে এক মাঠে! তখন বয়স আর কত। তেরো চোদ্দ হবে। ওর একটু বেশি। সতেরোর কাছাকাছি। ছোট বেলায় ফিরছি। কি যে আনন্দ! স্ফূর্তি। অস্থিরতা কোথায়! যত্তসব আজগুবি বাজে চিন্তা! ছোটবেলায় ফিরতে পারলে কার না স্ফূর্তি আসে! দুঃখ কষ্টে দিন কেটেছে যার তারও! রোমাঞ্চ খেলে যায় শিরা উপশিরায়। রোমন্থনের ভার, ভার নয়, আহ্লাদে বিষাদে মিশে যায়। ফিরে ফিরে এসে ধাক্কা দেয়, মোচড় দেয়।

না হয় একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। যেমন এই কিছুক্ষণ আগে ট্রেনে ওঠার মুখে প্লাটফর্মের ওপরেই জনৈক মধ্যবয়সী সহযাত্রীর কুনই-এর ধাক্কায় উরি বাব্বা শব্দে আর্তনাদে নিজের মধ্যে ছেলেমানুষী স্বভাবটাকে জোর সামলে নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে মুচকি হেসে বলেছিলাম, এরকম আরও যদি ধাক্কা মারেন আমি সামলে নিতে পারব। এই দেখুন, ধাক্কা খেয়েও আমি উঠতে পেরেছি। ধাক্কাটা বড় নির্মম হলেও টাল খেয়ে সামলে নিয়েছি। এ সব কি মূর্তিমান ভদ্রলোক দেখেছিলেন? সেই অলক্ষুণে দেখার রেশই তাঁকে ছোটবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি আমাকে তাঁর কিশোর বয়েসের সাথী বরুণ ভাবছেন। আমি যে বরুণই আমার লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গি দেখেই বুঝে নিয়েছেন। হাঁটাচলা হাসা কাঁদার মধ্যে একটা না একটা মিল খুঁজে পেয়েছেন। একটা কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাবেই। অবধারিত। কী করেন, কোথায় থাকেন কিছুই জানা নেই। অফিস যাতায়াতের পথে দেখেছি কী! দেখে থাকতে পারি। হয়তো রোজই দেখছিল মনে পড়ছে না। সেই কবে থেকে ছাড়াছাড়ি। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর তো বটেই। এই দীর্ঘ ব্যবধানে চেহারার যে পরিবর্তন ঘটে এক নজর চোখ ফেলে স্পষ্ট চেনা যায় না। তাকিয়ে থেকে ডেফিনিট হতে চাইছেন। আমাকে ভড়কে দিতে মাঝেমাঝে চোখ বড় বড় করছেন, আমার ভেতরটা পড়ে নিচ্ছেন একবার মনে হয়েছে ওঁর মধ্যে এসব প্রতিক্রিয়া কি আমার তাকানোর কারণেই।

আমি এখন সংযমী দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছি, কখনও দৃষ্টি অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ছে। আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি উনি আমার বাল্যবন্ধু নীহার। নীহার রায়। আমার দু'ক্লাস উপরের সেরা ছাত্র। ওঠাবসা ছিল ঘনিষ্ঠ। বিকেলের দিকে পদ্মার ধার ধরে বেড়াতাম। কখনও অলস পায়ে কখনও দ্রুত। যেদিন যেতাম না খেলতাম ফুটবল, হা-ডু-ডু, চ-উ-কিৎ-কিৎ। বর্ষায় যখন পদ্মা টইটুম্বুর, মাঠঘাটেও জলকাদা, ওর বাড়িতে বসে লুডু কিংবা ক্যারাম।

পাঁচ ছ'বছরের ঘনিষ্ঠ সখ্যতায় প্রত্যেক প্রত্যেকের মুখাবয়বের খুঁটিনাটি দেখে নেয়, হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে সবকিছু বুঝে নেয় অথচ ভদ্রলোক বোধহয় এখনও দোলাচলে। একটি কথাও এখনও বেরোল না।

ভদ্রলোকের চেহারায়, ভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটছে। ভ্রূজোড়ায় কম্পন, মুখের ডৌলে ভয়ের ছাপ। হাসি ঠোঁটে ধরা না থাকলেও একবার হেসেছিলেন, অনেকটা সময় ধরে। এখন মুখখানাকে মনে হচ্ছে সাপের খোপ। ভয়ংকর কালো। থিকথিকে করছে অন্ধকার।

ওঁর দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যেও কি কোনও পরিবর্তন ঘটছে। আমি স্পষ্ট করে তাকাতে পারছি না কেন! ও তবে নীহার নয়। নীহারের মুখে হাসি ছিল বাঁধা। মুখে ছিল অপূর্ব শ্রী, দুঃখকষ্টে শ্রীটা আরও খুলত। আমি লেখাপড়ায় খারাপ, নিচু ক্লাসে পড়ি—এই কথা বলে কতজন ওকে আমার সঙ্গে মেশামেশির জন্য কথা শোনাত, গালমন্দ করত। নীহার পাত্তা দিত না, আরো নিবিড় হতে চাইত।

টের পাচ্ছি আমার মুখটাও কালো হয়ে গেছে। ভয়ংকর কালো। চুলগুলো কে যেন নাড়া দিয়ে উস্কখুস্কো করে দিয়েছে হাসার চেষ্টা করছি, ভাব নিয়ে আসছি, হাসতে পারছি না। ভাব নিয়ে আসতে গিয়ে মুখটা যে কদাকার দেখাচ্ছে তাও টের পাচ্ছি। কিন্তু কেন? উনি যখন নীহার নন, কোথাকার উটকো লোক, তাঁকে দেখে আমার মুখ কালো হওয়ার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে। নেই অথচ আমি ...

মূর্তিমান হাসলেন। সেই একবার আর এবার। হাসিটা শব্দ করে। ফিজ্ ফিজ্ শব্দ হচ্ছে। এগিয়ে আসছেন কি! হ্যাঁ, ডান পাটা বাড়ালেন। তারপর বাম পা। আবার ডান পা। আমার কাছে এসে পড়েছেন। —হ্যালো মিঃ, দিল্লী থেকে কবে ফিরলেন। আমার দিকে তাকিয়েই যখন জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নটা আমাকেই নিশ্চয়। তবে আমি কখনও দিল্লীতে ছিলাম না, দিল্লী থেকে ফিরিও নি। বিনীতভাবে বললাম বোধহয় ভুল করছেন।

—নেভার, নেভার। আমার কখনও এসব ব্যাপারে ভুল হয় না। আপনি ফিরবেন কেন। ফিরেছিলাম আমিই — কিন্তু ঠিক কবে — ডেটটা আমার খুবই দরকার। মূর্তিমান চাপা গলায় বললেন। বলেই বললেন, সরি কিছু মনে করবেন না।

আমি তো থ। কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। এখন যে কিছু বলব তার রাস্তাও উনি 'সরি' বলে বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে ভাবলাম আমাকে দেখেই দিল্লী ফেরার কথা মনে পড়েছে। মানে আমার মতই দেখতে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর দিল্লীতে পরিচয় আছে, দিল্লী থেকে ফেরার ডেটটা নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। কথার মধ্যে যে ইঙ্গিতই থাকুক উনি ডেট্‌টা খুঁজছেন। ডেট্‌টাই দরকার। ফর্সা মুখ

বীভৎস কালো দেখাতেই আমার মনে হয়েছিল উনি ভয়ংকর টানাপোড়েনের মধ্যে আছেন। কামরার মধ্যে প্যাসেঞ্জারদের মৃদু কথাবার্তা চলছে, স্টেশন এলে ওঠানামা চলছে অথচ উনি ঘুরেফিরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকছেন—আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কত কিছু ভেবে যাচ্ছি। চোখ সরাতে পারছি না অদ্ভুত এক মায়াজালে। এ সময়ে আমি কিভাবে ওঁর সাহায্যে আসতে পারি!

ভদ্রলোক জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন। ট্রেন ইন্ করছে। ট্রেনের ভেতরে, প্লাটফর্মে হকারদের হাঁকাহাঁকি। বিস্তর মালপত্র নিয়ে নামার তাগিদে পেটের সামনে ছোকরা বয়েসের কয়েকজন অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছে। সেটা নিয়ে রীতিমত বাক্‌বিতণ্ডা। যে কোন কোনো সময়ে হাতাহাতি পর্যায়ে চলে যেতে পারে। ভদ্রলোক ঘাড় ঘোরালেন, বললেন সাহায্য? ... কি ভাবে আর সাহায্য করবেন! ডেটটাই তো ভুলে গেছেন! তবে একটা জিনিস ... বলে খানিকক্ষণ দূরের ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি আমার মুখে হাসি দেখে আপনার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার মুখ যখন শুকনো, হাসতে পারছি না, আপনার মুখটাও দেখেছি বিবর্ণ—এতেই টের পেয়েছি আপনি স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতায় জড়ানো মানুষ। বন্ধুপ্রীতি আপনার মধ্যে প্রবল। তবে কেন যে আপনি স্মরণ করতে পারছেন না ...

দমদম স্টেশনে যাত্রীদের নামাওঠা চলছে। ভিড়ের ধকলে ভেতরে বাইরে হাঁসফাস। বয়স্ক এক মানুষ তীব্র হাঁসফাসানিতে বুকে হাত দিয়ে প্লাটফর্মের ওপরই বসে পড়েছে, ট্রেন স্টার্ট দিচ্ছে। আমি বুঁদ হয়ে আছি ভদ্রলোকের কথার মধ্যে। কিসের ডেট কোন ডেটের কথা উনি বলছেন! আবার বন্ধুপ্রীতি ... কি যে সব কথা।

মূর্তিমানের পেছন দিক থেক কে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, কী রেঁ নীহার, তোর মুড়াগাছা তো চলে গেছে। নামিস নি! স্টেশন ছাড়ার কী যে কষ্ট এবার টের পাবি।

উল্টোদিক থেকে আমার চেনাজানা কয়েকজন হঠাৎই সিট ছেড়ে লাফিয়ে উটে বলল, শিগ্রি নাম বরুণ। দমদম ছাড়ছে। এখান থেকে লালগোলার ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগর যেতে পারবি। কখন কি ভাবে যে এতগুলো স্টেশন পার হয়ে এলাম কেউ-ই কিন্তু টের পেলাম না।

নীহার আমার, আমি নীহারের হাত ধরাধরি ক'রে হোঁচট খেয়ে দমদম স্টেশনে নামলাম। উল্টোদিকের দোকানপাটের ঘেঁসা শেডের দিকে তাকিয়েই মনে পড়ছে পয়লা জানুয়ারি, দিল্লী থেকে ফেরার পথে নীহারকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করে এই স্টেশন থেকেই ওকে লালগোলার গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর দীর্ঘ ছাড়াছাড়ি ... কেউ কারোর কোনও খবর রাখিনি। চিঠিপত্র আদান প্রদানও নেই। আজ এই স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিয়ে গল্প করে লাস্ট লালগোলা ট্রেনে ওঠার ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুতির মধ্যে দু'জনেই ক্লান্ত ধ্বস্ত শরীতে বাড়ি পৌঁছে বৌ-ছেলেমেয়ের উৎকণ্ঠায় ভরা গালমন্দে দীর্ঘ ছাড়াছাড়ির কষ্টটা টের পাওয়া যাবে।

পিক্ আওয়ার্সের ভিড়ভাট্টা কেটে গেছে। স্টেশন এখন অনেক ফাঁকা। প্লাটফর্মের ওপর দোকানীদের ঝাঁপ বন্ধ করার ধপ্ ধপ্ শব্দ হচ্ছে। দ্রুতলয়ে আমরা দু'জনে কাঁধ কাঁধ রেখে ধীর পায়ে হাঁটছি, গল্প করছি, হাসছি—কাঁধ ছেড়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছি—ওভার ব্রীজের মখে সিঁড়ির কোণে একটা

চায়ের দোকানের ঝাঁপ্ খোলা। নীহার চেঁচিয়ে বলল, এ ভাই দু'কাপ চা, জল্দি। দোকানি ঝাঁপ্ বন্ধ করছিল। গোছগাছ করে নিয়েছে। সামনের ঝাঁপ্‌টা বন্ধ করলেই—, দোকানি বলল, স্টোভ বন্ধ করে দিয়েছি। চা আর হবে না। নীহার অনুরোধ করতে যাচ্ছিল আমি বললাম, থাক। সারাদিন খাটাখাটানির পর ওকে বাড়ি যেতে দে। নীহার হতাশ হল। বলল, অ্যাদ্দিন পর দেখা—দু'জনে একসঙ্গে একটু চা খাওয়া যাবে না! বলেই বলল, ওদিকটায় যাই। চা যখন নিপাত্তা, বেঞ্চে বসে গল্প করি। তোর কাছে সিগ্রেট আছে? সিগ্রেট! আমার মুখ তারপর চারদিকে তাকিয়ে বলল, যা! গল্প জমবে কি করে! সিগ্রেট বিড়ির ঝাঁপগুলোও তো দেখছি বন্ধ।

চা সিগ্রেট ছাড়াই ফাঁকা এক বেঞ্চে বসে গল্প জমালাম। একটার পর একটা। অদূরে চার নম্বর প্লাটফর্মের মাথায় গোটাকয়েক ইজের পরা বাচ্চার গোঙানিতে গল্পের মাঝে ছেদ পড়তেই দু'জনে উঠে গিয়ে মাথার দিকে হাঁটলাম। রোগা টিঙটিঙে খালি গা, চুল উস্কখুস্ক, ক্ষুধার্ত চেহারার স্পন্দন জোগাচ্ছে জ্বলন্ত উনুনে ফুটন্ত ভাতের মিষ্টি গন্ধ। ইজের পরা বাচ্চাদের হাতে হাতে ভাঙাচোরা থালা। উনুনে কাঠ ঠেলছে মা। মাকে ঘিরে বাচ্চাদের দঙ্গল। মিনিট কয়েক নিস্পন্দ তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীহারের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি বললাম, চ, দেখা যায় না! নীহারের চোখ ছলছল, এখন ক'টা বাজে রে! নিশ্চয়ই এগারোটা। বাড়ি থাকলে এতক্ষণে খেয়েদেয়ে আরামসে শুয়ে পড়তাম। আর এরা দেখ! কতক্ষণ যে এরা—, নীহারের কথায় মনটা ছটফট করে উঠল। সেই সদ্য কৈশোরে যখন দু'জনে পা দিয়েছি, দু'একটা বছর গড়িয়েও গেছে—নীহার এক বিকেলে বাড়ি এসে বলেছিল, কৈশোর অর যৌবনের ধর্ম কি জানিস তো—চরিত্র গঠন আর আর্তের সেবা করা। সময় পেলেই নীহার দূর দূর গ্রামে ছুটত। চাক্ষুস সবকিছু জরিপ করত। বন্যা খরায় নানান সংগঠনের সাথে যেত। আমি যেতাম না বলে ধমক দিত। বলত, তোর সঙ্গে মেশা বোধহয় আর হবে না। কথাটা যেন এইমাত্র বলল, আমি নীহারকে জাপ্টে ধরে বললাম, আর কখনও 'না' বলব না। এবার থেকে তোর সঙ্গে যাব। নীহারের দিকে তাকালাম। ওর চোখে জল। আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো যত পয়সা ছিল, তা বাচ্চাদের মাকে দিয়ে বললাম, ওদের কিছু কিনে দেবেন।

প্রথম শীতের রাত। ঠাণ্ডা লাগছে। অফিস ব্যাগ থেকে মাফলারটা বের করে কানে গলায় জড়িয়ে নিলাম। নীহারকে বললাম, কিছু আনিস নি। সোয়েটার কিংবা মাফলার! জড়িয়ে নে।

নীহার ব্যাগ খুলছে, অ্যানাউন্সমেন্ট হল, লালগোলা তিন নম্বরে আসছে। মনটা বিষিয়ে উঠল। কতদিন পর দেখা! আর একটু গল্প করতে পারলে—নীহারের দিকে বারবার তাকাতে লাগলাম। গলাটা সরু করে বললাম এবার যেন যোগাযোগ ঠিক থাকে। বাব্বা! কত বছর বাদে বলতো! তুই পারলি কি করে অ্যাদ্দিন চুপচাপ থাকতে ... নীহার হাসল। কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ বড় বড় করে বলল, তুইই তো ... কিন্তু বলতে পারলাম না। ঠিকই তো। সেই যেদিন ওকে লালগোলার ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছিলাম বলেছিলাম আমিই তোকে চিঠি দেব। বরাবর যোগাযোগ রেখে চলব। রাখি নি। চিঠিপত্রও দিই নি।

অ্যানাউন্সমেন্ট হতেই কোত্থেকে যে এত প্যাসেঞ্জার জুটে গেল — থিক থিক করছে ভিড়। এতক্ষণ টের পাই নি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাত্রীরা শুয়ে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। নীহার বলল,

বরুণ, এ ট্রেন ফেল করলে কিন্তু রাতভোর এখানেই থাকতে হবে। গায়ে মোটা জামা নেই। ভীষণ কষ্ট হবে। মনে মনে ভাবলাম, বলি, হোক না, যেমন খামখেয়ালি করে যোগাযোগ রাখি নি!

ভিড়ভাট্টা ঠেলে ট্রেনে উঠলাম। শরীর মন দুটোই ক্লান্ত। ভেতরে ঢুকতে পারছি না। গেটের সামনে গাদি গাদি লোক। অগত্যা গেটে দাঁড়িয়েই ঘন্টাখানেক দু'জনে কথা বলে গেলাম। পুরনো দিনের কথা। খেলার মাঠ, স্কুল ক্লাব, সহপাঠি, মাষ্টারমশায়, লাইব্রেরী সব এক এক করে চোখের সামনে এসে জটলা পাকাল। নীহার বলল, আর পারছি না রে দাঁড়তে ... দেখি ভেতরটা যদি একটু ..., আমি বললাম, হ্যাঁ দেখ, অনেকটা পথ তো! আমি গেটের সামনেই থপ্ করে বসে পড়লাম। ঝরঝর হাওয়া কাটছে। মাফলার, শার্ট আঁটোসাঁটো করে জড়িয়ে নিলাম। পায়ের মোজাটা হাঁটু অব্দি টেনে দিলাম। চোখে ঘুম নামছে। তাকাচ্ছি। চোখ এঁটে ধরছে। ঝিম্ ... ঝিম্ ... ঝিম্...।

রাত দুটো নাগাদ বাড়ি ফিরছি। হেঁটে। চারদিকে অন্ধকার। খোয়ার রাস্তা। পাকা রাস্তায় উঠতেই আলো আঁধারি। রাস্তার আলো ছেঁকে ধরেছে কালী পোকা। বাড়ির সামনে জটলা। ছেলেমেয়ে বউ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘরে ঢুকতেই বউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, তুমি কিরকম বে আক্কেল মানুষ বলো তো। নীহারকে আসতে বলে..., নীহার?—হ্যাঁ নীহার। পাশের ঘর থেকে নীহার ছুটে এসে দাঁত খিঁচিয়ে বলল—আজ কত তারিখ? পয়লা জানুয়ারী না! তুই তো চিঠিতে আজই আসতে বলেছিলি। তুই বাড়ি থাকবি। তোর ছুটি। কোথায় গেছিলি?

আমি খানিকক্ষণ, বেশ নির্বাক, নিথর। শুধু চোখের সামনে ওকে আসতে বলে লেখা লালকালিতে পয়লা জানুয়ারিটা—ঘুরছে। নিরন্তর ঘুরছে।

দূরত্ব

রানা মুখোপাধ্যায়

এক টুকরো শীতের সকাল। সামনে পিছলে যাওয়া রোদ, চকচকে কালো রাস্তা। সকালের উত্তাপ পিঠে নিয়ে মন্টুদা ক্ষিপ্র গতিতে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিন চাকার সাইকেল রিক্সা। সকালের তীব্র শীতের ধার শরীর কেটে গেলেও প্রভাতী আলোর ওম একটা আরাম নিয়ে আসে। মিঠু বসে আছে বাবার পাশে। গোশালার পাশ দিয়ে রিক্সা যাচ্ছে। গোবরের চৌবাচ্চায় বাচ্চারা খেলছে। তারই মত বয়স সবার। আঃ যদি নেমে যেতে পারতাম। ওদেরতো আর স্কুলে যেতে হচ্ছে না। কিন্তু বাবা পাশে বসে আছে যে। বাবা মানেই একটা দূর দূর ভাব। বাবা মানেই নিস্তব্ধ বাড়ি। হীমশীতল নীরবতা। চশমার কাঁচের ওপারে দুটো গম্ভীর চোখ। বারান্দায় মচ্ মচ্ জুতোর আওয়াজেই নীরব হয়ে যায় ঘর বাড়ি। বাবার কথা মানেই- পড়তে বস। মাও যেন কেমন দূরে চলে যায়।একদম ভালো লাগে না, মাকে জিজ্ঞেস করেও উত্তর মেলে না। সেই বাবা পাশে বসে আছে, ভাবা যায়! নেমে যাওয়ার কথা ভাবতেও ভয় লাগে।

আজ অনেক সকালে মা ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে। "মিঠু ওঠ বাবা। আজ তোর ইস্কুলের প্রথম দিন"- মিঠু আড়ষ্ট হয়ে শুয়েছিল। সারা রাত প্রায় ঘুমোই নি। একটা ভয় গলার কাছে জড়ো হয়ে ছিল। ইস্কুল সেটা আবার কেমন হবে? পড়া বলতে মা'র কাছে প্রথম-ভাগ দু অঙ্কের যোগ-ধারাপাত। ইস্কুলে নাকি এসবই শেখায়। রাতে মায়ের বুকের কাছে শুয়ে এসব কথা শুনতে শুনতে চোখের ঘুম একেবারে পগারপার। লোডশেডিং-এ মা মাথায় হাওয়া করছিল। "মা বাবাকে বল না পরে ইস্কুলে যাবো"-আধো আধো গলায় এভাব ফুটে উঠতেই মা হেসে উঠেছিল-দূর বোকা-সবাইকেই স্কুলে যেতে হয়। এতে ভয় কি? তবুও সে বায়না করলে মা বলেছিল- পড়াশোনা না শিখলে মানুষ হবি কি করে? মা বাবাকে খাওয়াবি কি করে? শোন খোকা আমি বলছি কোন ভয় নেই-দেখবি মাস্টারমশায়েরা কত ভালবাসবেন-আদর করে গল্প বলবেন সাত সমুদ্দুর তেপান্তরের গল্প এরপরে মায়ের হাতের পাখা থেমে গিয়েছিল। মা'র চোখ বুঁজে আসছিল। মিঠুর মনে হয়েছিল কাল বাবার সঙ্গে যেতে হবে। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরাও হয়ত বাবার মত গম্ভীর। এপাশ ওপাশ করে সারা রাত আধো ঘুমের মধ্যে কেটেছিল মিঠুর। তারপর এক সময় চোখ বুঁজে আসতেই মা ডেকেছিল - ভোরবেলায়, একেবারে কাক ভোরে। লেপের ভিতর থেকে মায়ের ঠাণ্ডা হাতের ডাড়নায় বেরিয়ে এসেছিল মিঠু। ঘরের বাইরে তখন আকাশে তারাদের মেলা। মিঠু মা'কে জড়িয়ে ধরেছিল ভয়ে। দূর পাগল ভয় কি! নে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নে এক্ষনি মণ্টু এসে যাবে। মা বলেছিল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে। বাইরে হিম ভেজা উনুনের তলা থেকে ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে একটা উদ্বেগ তাড়া করেছিল মিঠুকে। আর ঠিক তখনই-তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও - বাবার কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি হাতের ঘটির জলে কুলকুচু করেই দৌড়ে রান্নাঘরে। কিন্তু এখন ভাবনা ইস্কুলটা কেমন হবে, লোকেরা সেখানে কিরকম। দাদার স্কুলে মাস্টারমশাইরা খুব মারে। দাদার

গায়ে বেতের লাল দাগ। সে নিয়ে মা'র কত ভয়! বেতের কথা ভাবলেই ভয় লাগে। কতদিন যে দাদার ব্যথা ছিল। বাবাকে ও ভয় করে। চোখ খুলে তাকাতেই মিঠু দেখল বলদ টানা গাড়ি। শব্দ নেই - রবারের চাকা, পিছনে দৌড়চ্ছে তিনটি ছেলে - গাড়োয়ান পিছনে তাকিয়ে বারবার বকছে। গাড়োয়ান সামনের দিকে ফিরলেই আবার যাকে তা। খুব হাসি পাচ্ছিল তার। সেবার মামাবাড়ি যাবার সময় সাঁইথিয়া থেকে কুন্ডলা গরুর গাড়িতে যাচ্ছিল তারা। মা এর নিষেধ পরোয়া না করেই সে ধুলোর রাস্তায় নেমেছিল। মাঝে মাঝে গরুর গাড়িতে যাচ্ছিল তারা। মা এর নিষেধ পরোয়া না করেই সে ধুলোর রাস্তায় নেমেছিল। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ির পিছনে ধরে ঝুলে পড়ছিল। তারাপদ গাড়োয়ান কিছু বলতে পারছিল না, শত হলেও মা সঙ্গে রয়েছেতো। তারাপদ বলেছিল ঃ- বাবু ওরকম কোরো না । মিঠু কথা শোনেনি। পরমানন্দে ধুলোর ভেতর পা ডুবিয়ে গরুর গাড়ির পিছন ধরে ঝুলছিল। মা বলেছিল মিঠু এরকম করলে গাড়ি থেকে নেমে যাবো। তাতেও কথা শোনেনি মিঠু। তারাপদ অনেক কষ্টে বলদ দুটিকে বশে রেখেছিল। কাজেই বিরক্তি তার স্বাভাবিক। মাও লজ্জিত। মিঠু কথা শুনছে না। আবার তারাপদর সামনে সহ্যও হচ্ছে না মিঠুর এই অসভ্যতা। শুনছোনা তো - গরু লাফিয়ে উঠলে কিন্তু মার লাগবে - তারাপদর শেষ মোক্ষম অস্ত্র। আর তাতেই কাজ। সুড়সুড় করে তারাপদর কোলে চেপে মিঠু গাড়িতে উঠে এসেছিল। মাকে জড়িয়ে ধরে মার বুকে মুখ লুকিয়েছিল। "দুষ্টু কোথাকার" - মা মিঠুর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলেছিল। মিঠুর বুকটা হু হু করে উঠল। আর হয়ত তারাপদর সঙ্গে কোনোদিন দেখাই হবে না। সেই ধুলোর রাস্তায় পা দিয়ে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে যাওয়াও বুঝি হল না। মানকের দোকানের ঝাল চানাচুর, ফনির দোকানের বালুসাই, সাঁইয়ের চমচম - সে সব হয়ত অধরাই রয়ে গেল। বিকেলে খেলা যাবে তো জগাদের সঙ্গে। মিঠু আড়চোখে বাবার দিকে তাকাল। চশমার নিচে বাবার দুটো গম্ভীর চোখ। সব বাবাই কি এরকম গম্ভীর। সারা দিন বাড়ি মাথায় করে ফেরে সে! দাদার সঙ্গে মারপিট, বোনের চুলের মুঠি ধরে টান, সারা সকাল বিকাল খেলার মাঠ - কখনও একা, কখনও দাদার সঙ্গে। আর সন্ধ্যা হলেই চোখ জুড়িয়ে আসে ঘুমে। মাস্টারমশাইরা শত ধমকানিতেও কাজ হয় না। অধিকাংশ দিনই মাস্টারমশাই বিরক্ত হয়ে চলে যায়। আর ঠিক তখনই বাবার আসার সময়। বই বালিশ হয়ে গেছে তখন। ঠিক তখন দাদার কানে কানে ফিসফিস - মিঠু বাবা আসছে। মিঠু তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে - বাবার জুতোর মশমশ আওয়াজ কানে আসে। মিঠু প্রায় জোর করে চোখ টেনে বইয়ের ওপর তাকায়। সামনে তাকাতে সাহস হয় না। বইয়ের ছবি - লেখা - আর বাবার মুখ এক হয়ে যায়। বাবার বাড়িতে ঢোকার সময় তাদের পড়ার যায়গায় কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবে নিরীক্ষণ করেন পড়াশোনার ধরন। মিঠুর হাড় হিম হয়ে যায়। তখন শুধু মনে হয় কখন মশারিতে ঢুকে জড়িয়ে ধরবে মা'কে।

সকালে মুখ ধুয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিঠু। "তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও" আবার বাবার গম্ভীর গলার আওয়াজ কানে ঢুকেছিল। এক দৌড়ে রান্নাঘরে পিছন থেকে মা'কে জড়িয়ে ধরতেই, ছাড় ছাড়। মা তখন লুচি ভাজছিল। তারপর মায়ের কোলে বসে কান্নাভেজা চোখে চা সহযোগে গরম লুচি খেতে খেতে আমি বাবার সঙ্গে যাবো না - তুমি চল। "দূর বোকা - প্রথমদিন বাবার সঙ্গেই যেতে হয়"- মা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল। মা'র ওপর ভীষণ রাগ হয়েছিল। মা পরিপাটি করে

সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ইস্ত্রি করা জামাকাপড়, সিঁথে কেটে চুল আঁচড়ান - চকচকে কালো জুতো একেবারে বাবু। মাথায় মা দিয়েছিলেন একটা হলুদের ফোঁটা। অন্যসময় হলে মিঠু কিছুতেই পরত না। তারপর মা গাল টিপে, কড়ে আঙুলে কামড়ে মিঠুকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার হাত ধরে মিঠু এগোল। বাবার হাতের মধ্যে তার হাত। বাবা চলছেন দ্রুত। প্রায় দৌড়ে বাবার সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে মোড়ের মাথায় তারপর মন্টুকাকুর রিক্সায়। চোখে জল দেখে মন্টুকাকু বলেছিল, ভয় কিরে দেখবি এরপর ইস্কুল না যেতে পারলেই খারাপ লাগবে। তারপর মন্টুদা রিক্সার প্যাডেলে পা দিয়েছিল আর গাড়ি চলল তরতরিয়ে। চোক বুঁজে মিঠু শুনছিল বাবা আর মন্টু কাকুর গল্প

ঃ প্রত্যেক দিন সকালে তোকে ঠিক সাড়ে ছটায় আসতে হবে - ইস্কুল যেন কামাই না হয় দেখিস।

ঃ খেপেছো দাদা আমাদের গাড়ি চালিয়েই খেতে হয়।

ঃ সে আমি জানি - তবু বলছি একটু সাবধানে দেখিস - বড় ইস্কুলতো সামান্য গাফিলতি এরা সহ্য করে না, একটু এধার হলেই টি সি দিয়ে দেবে। মিঠু টি সি কথাটার মানেটা বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝল, প্রচণ্ড কড়াকড়ি, কড়াকড়ি মানেই দাদার গায়ের দাগড়া দাগড়া লাল দাগ।

ঃ কিন্তু দাদা তোমার ছেলেকে আগে ভালো লাগাও ইস্কুল। এত ভয় পাচ্ছে। আর দুদিন বাদে ভর্তি করলে।

পাগল হয়েছিস - এখন ভর্তি না করলে পরে চান্স পাওয়াই মুস্কিল।

তবু আর এক বছর বাদে হলে ভাল হত। (আঃ ভগবান - বাবা যেন মন্টু কাকার কথায় রাজি হয়ে যায়। ভগবান যেন মন্টুকাকাকে পাঠিয়েছেন)

ঃ তাই কি হয় - এখন সময় পাল্টে গেছে - বাবা মন্টুকাকার কথা পাত্তাই দিলেন না। মিঠুর মনে হল বাবা মন্টুকাকার সঙ্গে কি সুন্দর কথা বলছেন!

ঃ মিঠুর দিকে নজর রাখিস। আমার বড় আদরের।

তাদের রিক্সা একটা বিরাট মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। দূরের আকাশে লাল সূর্যটা এখন চকচকে রুপোর থালা। মা প্রত্যেকদিন সকালে চান করে গলায় কাপড় দিয়ে মন্ত্র সহযোগে সূর্য প্রণাম করে মিঠুকে ঘুম থেকে তুলে দেন মা বলেন সূয্যিঠাকুর মাঠের পরে সূয্যি ঠাকুরকে মনের ভিতর নিয়ে মিঠু চোখ বুঁজল।

মাথায় কারুর হাতের ছোঁয়ায় মিঠুর ঘুম ভেঙে গেল। তবু মিঠু ঘুমের বাইরে আসতে চাইছিল না সারা আকাশ জুড়ে সাদা রোদের কোমল উত্তা। মিঠু উপভোগ করছে সমস্ত শরীর দিয়ে। ঘুম ভেঙে গেলেও চোখ বুজে থাকে সে। বাড়িতেও এরকমভাবে, আপাদমস্তক চাপা দিয়ে শুয়ে থাকে শীতের সকালে, যতক্ষণ না মা এসে কাকুতি মিনতি করে - ওঠ বাবা ওঠ। তারপর লেপের ভিতর মায়ের ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়য় সে লাফিয়ে উঠে বিছানার বাইরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। আজ কোথায় মা! মা হয়ত ইস্কুলে পাঠিয়ে আনন্দেই আছে। কি হবে কঠিন বানান আর ধারাপাত মুখস্থ করে। বাবাতো পড়ে না। কিছুক্ষণ বাদেই সেই ভয়ের ইস্কুল - বেতের বাড়ি - আটক স্যার। সবই দাদার কাছে শোনা। একটা

বাচ্চার মুখওয়ালা ঘড়ির সামনে আটক -স্যার পড়ান। পড়া না পারলে হাতে লাল কালির দাগ দিয়ে দেন। মানে ছুটির পর আটকে রাখা হবে সেই ঘরে। সেখানে শুধু ঘড়িটার আওয়াজ। চোখ আর জিভ তাঁর কাটা। সেগুলো নড়ে ঘড়ির কাঁটার বদলে। আটক-স্যার আবার খোলা মাঠে দাঁড় করিয়ে রাখেন। মা'র ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। কাল থেকে আর কথা বলব না যতই আদর করুক। কি দরকার ছিল এমন ভয়ের জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার। আটক-স্যারের কথা মনে হলেই হাড় হিম হয়ে আসে। আটকে রাখলে দৌড়ে বাড়ি পালিয়ে যাব। গুলতিটাও আনা হয় নি। গুলতি দিয়ে আটক - স্যারের মাথা ফাটিয়ে দেব। কিন্তু পাশে বসে আছে বাবা। বাবারা কি হাসে না? সব বাবারাই কী ভীষণ রাগী আমার বাবার মত? দূর ভাল লাগে না! বাবারা যে কেন মায়েদের মত হয় না! আর ভাবতে ভাল লাগছে না। মিঠু তলিয়ে গেল ঘুমের দেশে সাত সমুদ্দর তের নদীর পারে!

"খোকা ওঠ - ওঠ বাবা" - মাথায় হাত বুলোচ্ছে। চোখ খুলতে চশমার আড়ালে বাবার সেই দুটো গম্ভীর চোখে যেন ভালবাসা ঝরে পড়ছে। বাবা যেন অনেক দূর থেকে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পরম করুনাময় ঈশ্বরের মত। মা যা কথা প্রায়ই বলেন। মিঠু বুঝতে পারছে না - এ কোন বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে। তার সমস্ত অপছন্দ আপত্তির উত্তরেই যেন বাবা এই রকম। মা'র কথা মনে পড়ছে। বাবার মুখের আদলে যেন মায়েরই মুখ। দুটো একাকার অভিন্ন। এক অনন্ত অনুভবের তীরে দাঁড়িয়ে যেন মিঠু। এ তার অচেনাকে আবিষ্কার। মিঠু আর কিছু না ভেবেই রিক্সা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার বুকে। বাবা তাকে দুহাতে বুকে চেপে ধরলেন। মিঠুর শিশুমনে, মাথার ওপরে গাছের খুশীতল ছায়ার অনুভব সৃষ্টি হল। সেই ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে - "ঐ দ্যাখ খোকা তোর ইস্কুল।" বাবার বাড়ানো হাতের তর্জনীর ইঙ্গিতে সে দেখল - একটা শিশির ভেজা সবুজ মাঠ আর সাদা রঙের একটা ছোট বাড়ি। নীল প্যান্ট-সাদা-জামা-পরে হাতে টিনের সুটকেশ নিয়ে দলে দলে ছেলেরা সবুজ মাঠের শেষের দিকে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। মিঠুর কাছে বেশ নতুন লাগলো দৃশ্যটা। কি রে যাবি না? বাড়ি ফিরে যাবি? মিঠু বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। কোল থেকে নামল। বাবার হাত থেকে টিনের সুটকেশটা নিল। দুপা এগিয়ে আবার পিছন ফিরল। বাবার গম্ভীরমুখে তৃপ্তির হাসি। মন্টুকাকুও হাসছে। আজ আর কাউকে পরোয়া নেই মিঠুর। ইস্কুলে না এলে সে তো চিরকাল বোকাই থেকে যেত। এমনভাবে বাবা কি কখনও হাসত। এখন শুধু সাদা বাড়ির রহস্যভেদ। মিঠু দৌড়ল মাঠের শেষে চকচকে সাদা বাড়িটার দিকে 'আস্তে বাবা - আস্তে,স্নেহশীল বাবার গলার আওয়াজটা শুধু তার কানে বাজল।

পাটলিপুত্রকন্যা

অমিত মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গসূত্র ঃ অশোক সেদিন হাঁ করে চেয়ে দেখছিল। মানে মুখ বুঁজে চুপ করে তাকিয়ে ছিল। অর্থাৎ স্বাভাবিক বদনে আনমনে চোখ মেলে রেখেছিল। ঔৎসুক ছিল, পর্যবেক্ষন ছিল, তন্ময়তা ছিল, স্মৃতিচারণা ছিল। অথচ কোনওটাই মাত্রাতিরিক্ত ছিল না বলে সব সহজ,সাধারণ ছিল। পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করায় অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের তেমন মশলা ছিল না। অত উঁচু থেকে সেই অবলোকনে কোনও নাটকীয়তা, অসঙ্গতি, অশোভনতা চূড়ান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল। ফলে অশোকের দর্শনে বিশেষ নজরবিন্দুর অভাব কাউকে অনিরাপদ করে তোলেনি।

সংশয়তৎপর হননি নীতিসংবেদী অধ্যাপকরা। পুরনো কলেজে তাই অশোক সময়বোধ হারিয়ে ফেলেছিল।

প্রশ্ন ঃ অশোকের না দেখার ভানের সামনে কী ছিল ?

বহুতল-নয়নে কী আকর্ষণ টানা ছিল দিকবলয়ে ?

নিচে আরও নিচে পরতে পরতে কেমন পটভূমি ছড়ানো ছিল ?

(নম্বরের উল্লেখ নেই)

উত্তর ঃ তেমন কোনও বাঁধানো দৃশ্য বারান্দা-পরবর্তী ব্যপ্তি-স্থানে ছিল না। চোখকাড়া ঘটনাপ্রবাহ বা কর্মতৎপরতাও নয়। নীচে পাঁচিলের পরে টিনের চাল, টালির খুপরি, নিমগাছ। অ্যাসবেস্টসের ঘর। পরের সারিতে টালির চারচালা, কেতলা বাড়ি, চৌকো দোকান। তার পরে দোতলা টালির বাড়ি, একতলা টানা ছাদ, রাঙা মন্দির। চতুর্থ সারিতে দোতলা লম্বাটে বাড়ি, তিনতলা ফ্ল্যাটের ছাদে দারোয়ানের কুঠরি ইত্যাদি, প্রভৃতি (নম্বর বেশির নিশ্চয়তা থাকলে দৃশ্যাবকাশ সম্প্রসারণ করা যেত) কলেজপাড়ায় যে কম্মে অশোক পৌঁছেছিল তা সারতে হলে দুঘন্টা পরে ফের ঢুঁ মারতে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ। তবু মধ্যবিত্তের সংকোচ ফাঁক হয়ে থাকে সেলাই খুলে, ছিঁড়ে যায় বোতামে। একতলার সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে পুরনো পরিবেশে নতুন করে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। ছায়ায় বসে দু'পাশের বাগানে ফুল, পাতা, যত্নের ঘাস দেখতে খারাপ লাগার কথা নয়। সুঠাম সাবুগাছ, ঝোপঝাড় মরুদ্যানের খন্ডদৃশ্য তৈরি করে ট্রামবাদ্যের অলৌকিক আবহে বেজে উঠেছে। তখনকার উদ্যোগহীন ন্যাড়া জমিতে গোল হয়ে বসে বন্ধুদের সাথে কতো রকম ভবিষ্যতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তারুণ্যের দাঁপটে চারপাশের পাতি পৃথিবীকে মুছে ফেলে দিয়ে সামনের জটিল দিনে অনেক ভেবেচিন্তে দুরূহ সংকটের ফাঁক ফোকরে সম্ভাব্য জায়গায় বসিয়েছে নিজেদের। কোনও ভাবেই যে ঘিরে ঘিরে বাসা বানাতে পারে। আর কোনও ভাবেই যে পারে না।

কলেজ ছিল একলিঙ্গের। এখন দ্বিতীয়র আর্বিভাব হওয়া সামলে নিতে সামান্য বেশি দেরি হওয়ার কারণ। ছাত্রীর কারনে কিনা কে জানে, ছাত্রও বেড়েছে। ব্রহ্মচর্যের চত্বরে, বাঁকে গুনগুন, ছন্দময় পায়চারি, সহজ সান্নিধ্য কেমন আড়াল ময়তা এনেছে। অথচ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার চেনা জগত। সেই অস্তিত্ব লুকোচুরি খেলতে টানছে তাকে। টুকি খেলতে ডাকছে। সেই সব গতজন্মের টুকিটাকি আওয়াজে চনমন করে উঠেছে অশোক। ক্যান্টিনের টুং টাং, পরীক্ষাগারের গন্ধ আবেশ আনছে। সেই লাল-কালো ঘুড়ির গাছ থেকে গাছে সুতোর ইশারা! এই সব অন্তরালের উৎসে চলে যেতে হবে তাকে। খেলার নিয়ম মেনে খুঁজতে হবে তাকে। নিষিদ্ধ অঞ্চলগুলো বাঁচিয়ে চলা। কখনোই প্রশ্নের মুখে না-পড়া। কী কারণ বলবে সে! কেন জানতে যাবে কোন আকাঙ্খায় অস্থির হয়ে উঠেছে! এই সুযোগে কেন লালা ঝরছে তার!

সেই মায়ায় উঠে চলেছে অশোক, তার একান্ত মৌর্য সাম্রাজ্যে ফিরে পেতে। কোথায় ঘাপটি মেরে আছে সেই পরিচিত আদল! মুখোমুখি দেখার ব্যগ্রতা বেড়ে উঠেছে! যাচ্ছে বটে অশোক চোরের মতো, কিন্তু নিজে থেকে তো নয়, ডাকে সাড়া দিতে। হতে পারে অনধিকারের ইতস্তত পায়ে, এদিক ওদিক সন্তপর্ণে তাকিয়ে, কোথাও মুহূর্তের বিহ্বলতায় থমকে, দ্বিধায়, লজ্জায় শক্ত হয়ে, তবু টেনেছে তো কেউ! সেই মায়াই তো কাটিয়ে দিচ্ছে সব দুর্বলতা। সরিয়ে দিচ্ছে বাধা। না হলে তার সাধ্য কী, ভুলভুলাইয়ার অন্ধিসন্ধি পেরিয়ে ঈপ্সিত দুর্গমতায় পৌঁছে যাবে! নানা সময়ে ঝুরি নামিয়ে ডাল বাড়িয়েছে যে স্থাপত্য, বিনা পারানিতে তার খেয়ার সুলুক্ পাবে কেমন করে? কী করে তার মনে থাকবে ওই মহালগ্নে কোথায় বক্তৃতার অধিবেশন, কোথায় গোপন জোড়ের উপবেশন, কোন মোড়ে দেওয়াল সরে, দরজা খুলে, জানলা ফাঁক হয়ে যাবে? একেকটা কোণের স্মৃতিই তো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে। আর সেই সব শেষ মুহূর্তের সংকেত, আচমকা কোনও কিউবিক্লের ঘুরপথ, ঝুলে-থাকা চৌকো বিজ্ঞপ্তি, ঘুলঘুলির রঙিন নকশা হাত ধরে এগিয়ে দিচ্ছে। কখনো পায়রায়, নয়ত টিয়ার নবীকরণ হচ্ছে সেই কুহক, আমি এখানে। কেউ তার বালখিল্যতার মজা করতে ছাড়ছে না। ওই সব গমগমে শ্রেণীকক্ষ, সারগর্ভ ভাষণ, ব্যস্ততা, সহাস্য সমাগম বিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। নাহলে তার চলা তো কিছু অশরীরী অদৃশ্য নয় যে তারা অশোককে খেয়ালই করত না! তার সন্দেহজনক গতিবিধির সামনে আশারাফ দারোয়ান এসে পড়েনি? সেই কোঁচকান অথচ সস্মিত মুখ যা একই সঙ্গে কলেজের অলিন্দে আর দেশের বাড়িতে থাকে বলে বয়স বিমূঢ়তায় বাড়তে না-পারার কারণে অজর, অশোককে (যে কিনা প্রশ্নের ভয়ে নিরস্তিত্বে গুটিয়ে গ্রহান্তরের দিকে চেয়েছে) দেখে তো অভিস্রাবিত হয় নি? সে নিরবচ্ছিন্ন কানামাছি খেলে গেছে, নাকি সারা কলেজ সব গোপনতা খুলে মেলে দিয়েছে প্রাক্তনীকে, অতি নিশ্চিন্তে? আর সে ধর্মাশোক, যাকে পায় নি তাকেও ছুঁয়ে চলেছে ভোঁ ভোঁ! দেখে চলেছে সেই সব টুকরো সংসার যেখানে অধুনা নারীস্পর্শে গার্হস্থ্য মসৃণতা নেমে এসেছে। সেই মগ্ন ধবলগিরির ঢাল বেয়ে উঠে আসতে পারে নি দয়া নদীর বাহন প্রবাহ, রণকল্লোল। রাজসভার, জ্ঞানসভার, প্রেমসভার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সে তখন পাহাড়ের গুহায় সুড়ঙ্গ পথে।

স্তূপ থেকে সংঘের প্রাচীরগাত্রে চিত্রধারা পান করেছে আঁজলা ভরে। অস্ফুটে উৎকীর্ণ করেছে শিলালিপি। শুধু ইতিহাসই কি ইতিহাস হয়? মন্ত্রোচ্চারণে শ্রমণভাষ্যে অদূর অতীতের নানা সুর ঝরে পড়েছে তাই। এত স্মৃতি জমা হয়েছিল ছায়াগহন প্রত্যন্তের কুঠরিগুলোয়! নেমে এসেছে মান্ধাতার চওড়া পাখা থেকে, মগডাল থেকে ঝোলা আলোর বিচিত্র সাদা ঢাকনা চুঁইয়ে, মুঘল-গবাক্ষের ধারালো শিখর, ঘুপচি, রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ, কূটাগার, নির্জন নিঃশ্রেণী উজিয়ে। এক সময় ভয় পেয়েছে, সবচেয়ে বড় হলঘরে এসে ভূতের মতো কখন বসে আছে দেখে। পাখা ঝাপটানোর শব্দে ছিটকে পড়া যুগলমূর্তি? নাকি তার অভিমান জমাট বেঁধে আনমনা করেছে ব্রহ্মচর্য-খোয়ন কলেজের কারণে? যে সমস্ত মরুদিবস অমৃতময় হয়ে উঠতে পারত, সেই ভাবনাজনিত আক্ষেপে?

প্রশ্ন ঃ- প্রাক্তন বিদ্যাস্থান কি পর্যটনক্ষেত্র?

সেখানে এতক্ষন কাটানো কি বাস্তব সম্মত?

এতটা আবেগতাড়িত হওয়া কি বাড়াবাড়ি নয়?

(বার্ষিক পরীক্ষার সম্ভাব্য ইঙ্গিত)।

(প্রতি বছরই জীবন সম্ভাবনাময় ইঙ্গিতে ভরা)।

(কেউ পাশে লিখে রেখেছে)।

সবাই যখন আড্ডায় মত্ত, ফাঁকা ক্লাসের সদ্ব্যবহার করতে কেউ হাজির অধ্যাপকদের ঘরে, পেছনের এই দেহলিতে চুপ করে কতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে অশোক। এই কবুতরময় চবুতরায় মধ্যাহ্নসঙ্গীত মাখিয়ে খেয়েছে দৃশ্যের ইচ্ছেমতো টুকরো। গলিসর্বস্ব এই আশ্চর্য অন্দরমহলের ছড়ানো ছাদ, গা-ঘেষা কামরা, চিলতে বারান্দা ঘিরে একান্ত মন্থর জগতে লীন হয়ে থেকেছে। কতো দিন!

অথচ আজ সাম্রাজ্যচ্যুতের অনিধিকার প্রবেশের মন্থরতা। অপরাধবোধ! নিচের মহলে আজও সেই অলস চলাফেরা নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। কাজলকালো দক্ষিণ-পশ্চিম ছেয়ে আসছে। মেদুর হয়ে এসেছে দৃশ্যপট। খুব সামান্যই পরিবর্তন টের পাচ্ছে অশোক। তাকে দেখে টালির সারি বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধা শুয়ে আছে বড়ি, আচারের পাশে। বউমা একমনে বই পড়ে চলেছে। দারোয়ানের স্ত্রী দেরি করে স্নান সারল সেই একটেরে আড়ালে। দোতলা লম্বাটে বাড়ির বুড়ো পায়চারি করার ফাঁকে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে। সেই তিন মহিলা রহস্যময় হাতের কাজে ব্যস্ত থেকেও গল্প চালাচ্ছে। মন্দির সারাই হয়ে রঙ মেখেছে। আধুনিক হয়েছে চৌকো দোকান, প্রজন্ম বদলের সাথে। ছেলেটার বড়সড় চেহারায় শ্রী এসেছে, এখন চাকরির পড়া পড়ছে হয়ত। ওর দিদির নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে। তার বেয়ে কাপড়, আলসে জুড়ে পায়রা, ছেয়ে আছে লাউডগা। পাশে জুটেছে অপরাজিতার ঘন নীল। কদম পড়ে আছে চারচালার সামনের চত্বর জুড়ে। এখনো এত মায়া জমা হয়ে আছে নেপথ্যে! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চলেছে অশোক, তার নিজস্ব অহিংসা সাম্রাজ্য। ওদের তুচ্ছ কাজের চেয়ে টানে বেশি ওই শান্ত, নিশ্চিন্ত নড়াচড়া। কোনটা বাদ দিয়ে কী দেখবে? একসাথে সব দেখতে ইচ্ছে করছে দূরদর্শনের চ্যানেল তো নয়, খুঁজে পেতে দেখতে হয় সক্রিয়তা। গোদারের

ছবি দেখছে অশোক, দ্য ব্রিটিশ প্রেস। উদ্ঘারী নারী দরজা খুলে বেরচ্ছে, বেসিনে মুখ ধুচ্ছে, কী সব করছে, সিঁড়ি বেয়ে নেমেছে, ফের উঠে এল, দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে গেল, অল্প পরেই বেরিয়ে এল। সারাক্ষণ নেপথ্য ভাষণ চলেছে, জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ, অনম্বরতায় আগ্রহ খুইয়ে দর্শক সখেদে পলায়মান। যারা বসে আছে, ভাবছে এবার কিছু হবে, ঘটবে নিশ্চয়ই কিছু। আলোর সামনে রিল খুলে চলেছে, ছবি বয়ে চলেছে, টুকিটাকি কাজের আবহে বক্তৃতা.....

এত বছর পরেও প্রত্যাশায় চেয়ে আছে অশোক। অনুল্লেখ্য, তাৎপর্যহীন খুঁটিনাটির চেয়েও বড় হল সংগোপনে নিভৃতি নিহারণ। অলক্ষিত নেত্রপাতে ক্রমউদ্ভাসন উপভোগ করা। অনভ্যাসে ঘুলিয়ে যাচ্ছে দৃশ্য। এক দৃশ্য দেখতে গিয়ে অন্যদিকে চোখ চলে যাচ্ছে। ক্রমশ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে তার অবলোকন। টুকরো টুকরো এত কিছু দেখার আছে, ওই সব অজস্র ফ্রেমে-ধরা জীবন! কত রঙের প্রদর্শনী! কত শিল্পী! তার মাঝেই কে কোথায় নড়ে, সরে হাতছানি দিয়ে নজর কেড়ে নিতে চায়! শুধু আমাকেই দ্যাখ, নতুন কী করতে যাচ্ছি আমি। অশোক লোভ সামলাবে কী করে? আবছা পটভূমি। তুমুল বৃষ্টি ধেয়ে আসছে। কত কত মুখ, শরীর কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেই সব বদন, নতুন-পুরোনো। প্রকাশ্যে এসে যে যার সম্পদ বাঁচাতে ব্যস্ত। প্রত্যেকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে তাঁকে! বর্ষণ অছিলামাত্র, দর্শনেই ছিলা টানা আছে। এই কদাচিৎ জোটা টান-ভালবাসার উপলক্ষ্যে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ চাই তো! তাই তো ওরা নজর করছে অশোককে, তার আগ্রহ, মুগ্ধতা, স্মৃতিমেদুরতা। ক্ষণিকের জন্যে হলেও সব দরজা, জানালা, সিঁড়ি, প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছে। গোটা পাড়াই এখন বারান্দা। নাটকের সব দৃশ্য এক সাথে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে আছে তাদের একমাত্র দর্শকের দিকে। পেছনে চেয়ে আছে মহাকায় কাঠামো তার দরাজ শ্রেনীকক্ষ, ধ্রুপদী অলিন্দপথ, অজস্র গুপ্তবৈভবের আতুর পরশ নিয়ে। কখন নবীকরণে, বশীকরণে সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেছে যে! মহাবিদ্যালয়ে তার অধিকারের জায়গা হারিয়ে গিয়েছে হয়ত, মহাবিদ্যা সম্ভবত পরাস্ত করেছে তাকে, মহামায়া কেড়ে নিয়েছে অতীত সেই সব ছোঁয়া, বসতচিহ্ন, হতে পারে। নারীসকল এসে, প্রকৃতির মতো বহুধাবিভক্ত হয়ে নির্মমভাবে সরিয়ে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে তাকে। গ্রাহ্যই করেনি প্রাক্তন কেউ তোমাকে মনে রাখবে না, ফিরে আর আসবে না, দেখো! ...... এমত অভিমানে অশোকের গলা যখন বুঁজে আসছিল, তখনি তো পশ্চাতপটের জীবন্ত কুশীলবেরা বরণ করে নেয় তাকে! সম্পর্কস্থাপনে, দৃশ্যসঞ্চারে কাছে টেনে নেয়। তখনি তো অচলায়তনের চিনতে শুরু করল তাকে!

[অসম্ভাব্য প্রশ্নের খোঁচ ঃ * যে গেল কুণ্ঠাভরে, সে আবার অধীশ্বরের ভঙ্গিতে কেন পরিদর্শন করে? * অত যে ধর্মভাব, আসলে কি বাড়তি সাম্রাজ্য দখল করবে বলে?]

(এইখানে চরিত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বলছে, তোমার বন্ধুর কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ফুঁ দিলে। দু'ঘন্টা পরে যে কাজ আছে বলেছিলুম! গপ্পে মেতে এত বেআক্কেলে হলে আমি বের হব কী করে? আমার কাজ মিটল না যে।) কাজ কি কখনো মেটে পাগল, এত তাড়া কিসের? কলেজের সামনে দাঁড়ানো গাড়ির পেছনে লেখা বাণী।

চৌকাঠের ওপারে

আলপনা সান্যাল

তখনও ঠিক ভোর হয়নি। যদিও ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা, শীতকালে বলেই বোধহয়। এই রাস্তাটা, কালীঘাটের মন্দির থেকে সোজা ট্রাম রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। এখন অবশ্য মন্দির পর্যন্ত নাম মাত্র লোকের আনাগোনা। দোকানপাট সবে খুলেছে। প্যাঁড়ার দোকানে চৌকাঠ ধোয়া হচ্ছে। কিন্তু আর একটু এগিয়ে রাস্তাটা এখনও প্রায় ঘুমে মোড়া। শীতের কুয়াশা অ্যাসফল্টের রাস্তাটাকে হালকা সাদা চাদরে ঢেকে রেখেছে। ট্রাম চলা শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। এত কাছে থেকেও ট্রাম রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে না। তবে ট্রামের টুংটাং আওয়াজটা অনেকটা গির্জার ঘন্টার মতো মনে হচ্ছে।

তবে এ পাড়ায় সকালটা একটু দেরীতেই আরম্ভ হয়। বাসিন্দাদেরর ঘুম দেরীতে ভাঙলেও চা, কচুরী, পানের দোকানীদের সময়টা ঠিক রাখতেই হয়। এখানে চা জলখাবারের পাট সাধারনতঃ দোকান থেকেই স ারা হয়। তাছাড়া সামনেই বড়বাজার। আনাজ-তরকারীওয়ালারা, দুধের মেয়েরা, তাদের দারোয়ান, কিছু তাড়াহুড়ার খদ্দের, এরা বেশ সকালে এসে পড়ে। তাই ভোর ভোর এদের উনুনে আগুন দিতে হয়। তার মধ্যে কিছু গৃহস্থ ঘরেও আগুন পড়ে। কুয়াশা, ধোঁয়া সব মিলে এক অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করে। এটা অল্প সময়ের জন্য।

বাজার ছাড়িয়ে শনি মন্দিরের উল্টো দিকে পানের দোকান। রামসরণের। এখন খুব চেপে চেপে শুকনো ছাই দিয়ে সরণ ভবণের ঘটি পরিস্কার করছে। ওর বাড়ি উড়িষ্যায়। যখন এখানে আসে তখন ছিল এক ছিপছিপে তরুন। এখন স্থুলকায় এক মানুষ। তাই নীচে বসেই ঘটি ডলতে হয়। পান সাজানো শ্বেত পাথরের পাশের টিনের দেওয়ালে বড় সাইজের আয়না। ফ্রেমটা অবশ্য বেশ সস্তার। রাস্তার দাঁড়িয়ে একটা মানুষের অনেকটাই দেখা যায়।

এই ভোরবেলায় হঠাৎ আয়নায় ভেসে উঠল একটা মুখ। দাঁতে ব্রাঁশ। মধ্যিখানে সিঁথি কেটে থাক থাক করে পাতা চুল। মোটামুটি ভ্যাদভেদে চেহারা! ঠোঁট, দাঁত দেখলে বোঝা যায় দীর্ঘদিন পানের সঙ্গে সম্পর্ক। দাঁতগুলো তরমুজের বিচির মতো কালো,.... থুতনি বোঝা যায় না। হয়ত কখনও সেখানে ভাঁজ ছিল। সাদা পাথরের নাকছাবিটা চোখে পড়ার মতো বড়। নাকের মধ্যে গেঁথে আছে।

সোহাগবালা। পরনে জংলা ছাপা শাড়ি, গায়ে প্রিন্টেড ব্লাউজ। কোন কালে হয়ত নাম ছিল সোহাগ বা সোহাগী। কিম্বা সোহাগিনি। এখন ও সোহাগবালা। এ পাড়ার মাসী।

ভোরে ওঠা ওর অনেক দিনের অভ্যাস। যখন বয়স পড়তে শুরু করেছিল, গায়ে গতরে এখানে ওখানে মাংস জমেছিল, খদ্দেরদের আসাও কম হয়ে গিয়েছিল। তাই অন্যদের তুলনায় রাতের শোয়াটা একটু আগেই হয়। বয়েস হচ্ছে। বাত, অম্বল এসবও শরীরে বাসা করেছে। তাছাড়া হাজারো ঝক্কি সামলাতে হয়। মাতাল বাবুদের সায়েস্তা, গুন্ডা ঠিক করা, কার ঘরে কেখাবে? কোন বাবু পয়সা দিল

না। এসবের জন্য সন্ধ্যে থেকেই মনটা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। সকালের এই সময়টুকু একান্ত নিজের। ব্রাশটা জলে ভিজিয়ে বাঁ হাতের তালুতে মাঙ্কি ব্যাণ্ড, ডাবর বা ঐ ধরনের মাজন নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পাড়ায় একটু ঘোরা।

হঠাৎ সে দেখল পান-দোকানী ছোট্ট লতার হাতটা মুচড়ে দিতেই মেয়েটা চিল চিৎকারে কেঁদে উঠল। আধময়লা ফ্রক। পিঠে একটাও বোতাম না থাকায় সোয়েটারে পর থেকে ইজের পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খানিকটা ছিঁড়ছেও বোধহয়। সোয়েটারটা পাতলা। কনুই, পিঠের কাছে ঘর খুলে গেছে। ময়লার রং বোঝার উপায় নেই।

ব্যাপারটা দেখেই সোহাগবালার মাথায় রক্ত চড়চড় করে উঠল এই হারামীর বাচ্চা, ঐ একরত্তি মেয়েটাকে সক্কাল হতে না হতে পিটলি? তোর স্পর্ধা তো কম নয়। হতচ্ছাড়া মিন্‌সে। আমাদের বুকের উপর বসে রোজগার করবি, আর আমাদের কাচ্চা বাচ্চাদের পেটাবে। কেন র‍্যা? বেজম্মা বলে? বলি ওরে ওদের বাপের ঠিক নেই, তবে মা আছে রে ঢ্যামনা। একটানা কথাগুলো বলে সোহাগবালা থামে।

রামসরণ কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে বলার কোন সুযোগ না দিয়ে সোহাগবালা আবার বলে ওঠে — হ্যাঁ ছুঁড়িটার একটু হাত টান আছে। তা বলে মারবি। ফের যদি দেখি মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো।

লতি ততক্ষণে তার কালো লিকপিকে পা দিয়ে সোহাগবালার বিশাল শরীরের পেছন থেকে দে ছুট্। এবার সোহাগ একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল। টিয়া, কনক, তরঙ্গ, শাকিলা, ভানুদের উঠে পড়ার সময় হয়ে আসছে। এর মধ্যে টিয়াকে সে একদম সহ্য করতে পারে না। মাগির সব সময় বড় বড় কথা আর ঢলাঢলি। তবে দেহে যেন যৌবন ডগমগ। সব বাবুই ওকে পছন্দ করে। তাই রোজগারও অন্যদের থেকে বেশী। তাতেই মাগী মটমট করে। কাউকে রেয়াৎ করে না। এমন কি মাসীকেও না। ভদ্দরলোকের মতো পড়াশুনা শেখাতে চায় মেয়েকে। সোহাগবালা কোন কথা বলতে গেলে বলে, আমরাও ভদ্দরলোক। কেন? আমরা কি সেধে এ লাইনে এসেছিলাম? রোজ রাতে বউ ছেলে-মেয়েকে লুকিয়ে যারা ফষ্টি-নষ্টি করতে আসে, তারা যদি ভদ্দরলোক হয় তবে আমরা নয় কেন?

সোহাগবালা বলে, আ মর মাগী। কথার কী ছিরি দেখ! ওরে গতর না থাকলে ভিক্ষা করতে হবে লা। কেউ ঘুরেও দেখবে না। সোহাগবালা আবারও বিড়বিড় করে, বাজারের মধ্যে আবার এক তরকারীওয়ালা দাদা জুটিয়েছে। বেশ্যা, বেবুশ্যাদের আবার দাদা! ছেনালী আর কাকে বলে, দেখলে গা জ্বলে যায়।

বিকাশ ছোট ছোট হিং-এর কচুরী বেলে গরম তেলে ছাড়ছে। সোহাগবালা বিকাশের কাছে গিয়ে বলে — কচুরী ভাজা হলে ভিতরে পাঠিয়ে দিবি। আর চাঙারীটা ভাল করে বাঁধিস। যেন ঠান্ডা না হয়ে যায়। তরকারী না ডাল রে?

বিকাশ উত্তর দেয় — ডাল।

— ভাঁড়টা ভাল করে ধুয়ে দিবি। নইলে বালি কিচ্‌কিচ্ করে।

দোকান থেকে বেরিয়ে কী মনে হতে আবার দু পা পিছোয়। বিকাশকে বলে, ও বিকাশ একটু খাবারটা টিয়াকে দিয়ে বলিস যেন কেটলি করে চা টা নিয়ে যায়।

রাস্তার ওধারে চোখ পড়তেই সোহাগ ভিতরে ভিতরে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেলা বাড়ছে। কচি-কাচারা স্কুলের দিকে যাচ্ছে। তার মানে প্রায় সাতটা। বাচ্চাগুলো কোনটা রোগা, কোনটা ফোলা, কোনটা কালো। কোনটার আবার চুল আঁচড়ানো হয়নি। কেউ টুপি খুলে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে। কেউ এই শীতেও জলের বোতলের পাইপ চুষতে চুষতে চলছে।

বেশ লাগে এদের দেখতে। কেমন একটা অনুভূতি হয়। সোহাগ ভাবে আচ্ছা এদের মধ্যে কেউ হয়ত বড় হয়ে কনকদের মতো হবে। মনে হতেই বুকের ভিতরটা টাটিয়ে ওঠে। ছি-ছি! কী অলুক্ষুণে চিন্তা। নিজেদের বাচ্চাগুলোর দিকে একবার তাকাল। চাতালে ঘুম থেকে উঠেই এক্কাদোক্কা খেলছে। গা চিড়বিড় করে উঠল।

আর দেরী করা যাবে না ভেবে বাজারটায় একবার টুঁ মারতে যায়। কি উঠেছে দেখে মনে মনে ভাবে মাথুকে পাঠাতে হবে বাজারে। মাগীদের মুখে এখন বড় রস হয়েছে। সবকিছু আবার রোচে না।

বাজারে ঢোকার মুখে চায়ের দোকানে কনককে দেখা গেল। চায়ের দোকানের কালো ছোঁড়াটার সঙ্গে দাঁত বার করে গল্প জুড়েছে।

— হ্যাঁ লা, চা কিনতে কতক্ষণ লাগে র‍্যা, সেই কোন সকালে কুলি করেছি এখন পর্যন্ত মুখে একটু চা পড়ল না, সোহাগবালা তাতা গলায় বলে।

কনকও ছাড়ার পাত্রী নয়, সেও ঝামটা দিয়ে বলে, হ্যাঁ মাসী গতর গিয়েছে বলে চোখের মাতাও খেয়েচো না কী? দেখছ না শীতে জল ফুটতে দেরী হচ্ছে। বলেই হি হি করে হেসে ঢলে পড়ল।

ছোঁড়াটাও হাসিতে যোগ দিয়ে বলে, মাসি গো, তোমায় ভাঁড়ে একটু চা দিই। গলাটা ভিজিয়ে নাও।

পিরীত দেখ! মাঝে মাঝে মনে হয় ঢ্যামনার খাল খিঁচে নিই। মনে মনে বলে সোহাগ। আর একটু এগিয়ে আলুর দোকানের কাছে দেখে টিয়া। উল্টোদিকের দুধের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছে।

দুধের মেয়েরা কেউ বলে এই ডিপোতে আসতে চায় না। শত হলেও এটা বাজার, বেশ্যা পট্টি। ভদ্রঘরের সব মেয়ে। লেখাপড়া জানা। ওরা কেন এখানে আসবে? কীসে যে ভয় পায়? সোহাগবালাদের সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলে। একদিন তো তরকারী দোকানীকে একজন বলেই বসল, কি ..... কি যেন কথাটা। সোহাগবালা মন হাতড়াতে থাকে। হ্যাঁ, পিলিজ, আমরা যতক্ষণ বলে, — ঠিক আছে? শোন কথা! তা আবাগীর ব্যাটা বলে, দিদি আমার যে চরিত্তির লষ্ট হয়ে যাবে। মর ব্যাটা। কেমন জব্দ! তবে খিস্তি খেউর আর করেও না। যা একটা দুটো মুখ ফস্‌কে বের হয়ে পড়ে। অনেক দিনের অভ্যাস তো।

টিয়া ওখানে গিয়ে জুটেছে। চুলটা খুলেও আঁচড়ায়নি। ঘুম থেকে উঠে মাথার সামনেটুকু চিরুনি বুলিয়েছে। কলাবেনীর গোড়ায় তার জট জট। এবড়ো, খ্যাবড়া হয়ে আছে। বেনীতে দু এক জায়গায় কম্বলের তুলো লেগে। ও পড়াশুনা শিখবে। মেয়েদের কেউ হয়তো শেখাবে।

সোহাগবালার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। নিজেরটা থাকলে আজ এত বড় হতো বইকি। ডিপোর দারোয়ানটা বেশ খচ্চর। কত আর বয়স হবে আঠারো-উনিশ। ডিপো বন্ধ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষন বাজারে থাকে। আড্ডা দেয়। মেয়েগুলোর সামনে ভিজে বেড়াল। কিন্তু অন্য কোথাও

দেখা হলেই হয়। বলবে, যাবে নাকি মাসি? কাজল-শাহরুখ। যা জমবে না। ওপেনিং ডে , ওপেনিং শো, পয়সা লাগবে না। আরে মর! মিনসের কথা কি। ওলো বেবুশে বলে আমাদের কি ভাতার পুতের জ্ঞান নেই লা। আবার হাসিও পায়। ও তো মজা করেই বলে।

গলি দিয়ে মাছের বাজারে যাবার সময় মনে মনে ভাবল, থাক। যদি ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে মিশে ও নিজেকে ভদ্র করতে পারে, ক্ষতি কী? এতে শান্তি পেলে পাক।

মাছের বাজারের কাছ থেকে সে ফিরে এল। ভাল লাগছে না। কেমন যেন আলগা আলগা ভাব। ভাবে থাক। আজ মাথুকে বলবে হাঁসের ডিম গোটা গোটা রাধঁতে। মাংসটা সাধারনতঃ রাতেই চলে। দোকানের। খদ্দেরদের পয়সায়।

বেলা প্রায় আটটা। ঘরে ফিরে খানিকটা জবাকুসুম তালুতে নিয়ে মাথায় চাপতে লাগল। ঘরের দড়িতে ঝোলা লাল খোপ গামছাটা টেনে নিয়ে সোজা সাবিত্রী ঘাটে। একটু বাস তেল মাথায় দিলে, তাতে জল পড়লে বেশ হালকা হালকা লাগে। আর গঙ্গায় না নাইলে মনটা ঠিক শুদ্দ-শুদ্দ লাগে না। যদিও গঙ্গার এখন যা অবস্থা। জল তো নেই। শুধুই কাদা। কিন্তু বহু দিনের অভ্যাস। ফেলাও যায় না।

ঘাটে উঠে কাপড় পায়ের গোছের কাছে জড়ো করে নিংড়ে নিল। নইলে সপাং সপাং করে শব্দ হয়। হাঁটলে পায়ে বাঁধে। এখন সোজা মায়ের মন্দিরে। একটা ধুপ ধরিয়ে প্রণাম। মায়ের কাছে বেশ্যা ভদ্দর লোকের কোন তফাৎ নেই। এই যা রক্ষে। কথাটা মনে হতে ফিক্ করে হাস্‌ল সোহাগ।

একবার এক কুমোর পাড়ার বিটকেলকে আচ্ছা দিয়েছিল। আমাদের ঘরের মাটি ছাড়া বলে ঠাকুর হয় না। মিন্‌সে সেই একমুঠ মাটি নিয়ে এগিয়েছে, অমনি গিয়ে জাপটে ধরি। ব্যাটার সে কী ঠকঠক কাঁপুনি। সোহাগবালা মজা করে বলে, মাটি তুই পাবি। কিন্তু আমার ঘরে বসতে হবে। শুনে তো ভিমরি খায় আর কী! ছেনালী আর কাকে বলে! অন্ধকারের মানুষ বানিয়ে, তাদেরই ঘরের মাটি দিয়ে পুণ্যি। ঝাটা মার অমন পুণ্যির মুখে।

এ পাড়াতেও একটা শনি মন্দির আছে।

ভদ্রঘরের মেয়ে, ঝিরা এখানে আসে না বললেই হয়। ওটা বেশ্যাদেরই বলা চলে। এই মন্দিরে এসে ধুপটুপ দিয়ে চৌকাঠে মাথা ঠুকে প্রণাম করল। এ জীবনে নিজের জন্য আর কিছু চাওয়ার নেই। সবাইকে ভাল রেখো, বলে প্রণাম সারল। বাড়িতে আবার গোপাল আছে। তাকেও জল, মিষ্টি দিতে হবে।

মন্দির থেকে আসার সময় কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল, মাগী যাচ্ছে দেখো, যেন গেরস্থ ঘরের বৌ। সোহাগবালা পেছন ফিরে বলে, আ মর মাগী। সকালে গেরস্ত না তো কী? চোখের মাথা খেয়েছিস? দেখিস না এত বড় সংসারে বাজার দোকান করা, মেয়েগুলো, এতগুলো এন্ডি গেন্ডিকে তো এই মাগীকেই সামলাতে হয়। এটা সংসার নয়। ব্যাটা ছেলে নেই বলে?

দুপুরে খাওয়া মিটিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব উঠোনে। রোদ পোহাচ্ছে। সোহাগবালার মুখে পান। রামশরণের তৈরী। দুটো বাংলা পাতায় মিষ্টি মসলা। মিঠে পাতায় তার পোষায় না। কেমন মুখে

দিয়ে এ গাল ও গাল করতেই ফুস্‌। এই ভাল। বেশ এ গাল ও গাল চিবানো চায়। বাস তেল আর কিমামের গন্ধে বেশ বড়লোক বড়লোক লাগে।

বাচ্চাগুলো কেউ মাসির পাকা চুল বেছে দিচ্ছে। কেউ খেলছে। তরঙ্গ একটু দুরে নোনা ওঠা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন জলে ভেজা সবুজলতা। একা দাঁড়াতে পারে না। খুবই নরম সরম।

তা দেখে সোহাগবালা বলে উঠল, হ্যাঁ লা তরঙ্গী, তোর যে দাঁড়াতেও গোঁজ লাগবে র‍্যা। সবাই হেসে উঠতেই মাসী আবার বলে, আ মর মাগীরা।

কনক জিজ্ঞাসা করে ওঠে, ও মাসী, সব সময় আ মর, আ মর, কর কেন গো?

কে একজন ওদের থেকে উঠে কোমর দুলিয়ে সামনে এসে হাত নেড়ে বলল, পিলিজ, আ মর আ মর করবেন না। আমরা যতক্ষণ আছি।

ওদের হাসির চিৎকারে নিম গাছের কাকটা ভয় পেয়ে উড়ে গেল।

বেলা একটু ঢলতেই মাসী তাড়া লাগাল, যা তোরা এই বেলা একটু গড়িয়ে নে। ছোট বেলা রোদ পড়তেই সন্ধে। কাউকে নড়চড়া করতে না দেখে গলা তুলে চিৎকার পাড়ল, ওলো ও গতরখাকীর দল, কথা কানে ঢোকে না?

সবাই এবার উঠল। সকলে চলে গেলে নিজেও ঘরে গিয়ে দোর দিল। সন্ধ্যের মুখেই বেশী ব্যাস্ততা। তখন কারও ঘরে মদ, কারও ঘরে খাবার। কারও বাবু চিৎকার করে টাকা মারার ধান্ধা করছে। এত্ত সব সামলানো।

এই চালে একজন মাষ্টার আসে। বাচ্চাদের পড়াতে। মা না হয়েও এরা চায় তাদের বাচ্চারা যেন এ লাইনে না আসে। সোহাগবালা নিজেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খদ্দের-এর ফাইফরমাশ খাটা পছন্দ করে না। কোথায় বোধহয় মাতৃত্ব জেগে ওঠে। কে যেন এসে বলে গেল ভর সন্ধেবেলায় যে তরঙ্গ আজ তার ঘরে বাবু পাঠাতে বারণ করেছে।

সারা গা রাগে রি রি করে উঠল, মাগী ভেবেছেটা কী? ঘরে ঢুকে দেখে তরঙ্গ শুয়ে আছে

— হ্যাঁ র‍্যা, গতরে তোর ঘুণ ধরল না কী? ভর সন্ধেবেলা গড়াচ্ছিস্‌ যে?

— শরীলটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে গো। মাসী আজ থাক না।

— তা বলি কোন ভাতারে গেলাবে শুনি? না কী সোয়ামীর জন্য মন খারাপ? যে মিনসে নিজের বিয়ে করা মাগ্‌কে বেচে দেয় অমন শুয়ারের বাচ্চার মুখে থু থু দেওয়া উচিত। তা নয় মন খারাপ! নে নে শরীল ফরিল রেখে ওঠ! ব্যবসার সময় ব্যবসা। পরে সোয়ামীর কথা। ঢং। সতী মাগী।

এত বলার পরও সোহাগবালা গজগজ করতে থাকে, এই এক হয়েছে। রোজ বায়নাক্কা, মাগীকে যেন বিনিপয়সায় এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

এরও প্রায় চারঘন্টা বাদে সোহাগবালার একটু স্বস্তি। সব ঘরই ভরা। বাইরে পানু মাস্তান আছে। এবার একটু নিজের ঘরে বসে জিরানো। শান্তি। বাচ্চাগুলো সব ঘুমে কাদা। ডাবরটা টেনে ছোট জাঁতি দিয়ে কিছুটা সুপারী কুচালে। একটু পান মুখে দেবে। দূর থেকে কে যেন ডাকছে বলে মনে হল, ... সোহাগী .... সো...হা...গী।

বুকটা ধক করে উঠল। কতদিনই আর শোনা যাবে এই ডাক কে জানে! সোহাগবালার একমাত্র ভেজা জায়গা। এ নামে তাকে কেউ ডাকে না। শুধু একজন ছাড়া। এ পাড়ার দালাল। বুড়ো, ক্ষয়াটে চেহারা। যার হাত ধরে এ পাড়ায় আসা। বয়েসের কালে সবাই গেছে। টিকে আছে শুধু ঐ মিনসে। মাঝে মধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ হঠাৎ এসে উদয় হয়। এক রাত হয়ত থাকে। সুখ দুঃখের কথা হয়। আবার পাখী আকাশে। এটা কী ভালবাসা? কে জানে বেশ্যার আবার ভালবাসা! হবে হয়ত। বড় করে শ্বাস টেনে মুখ তুলতেই চোখে যায় উল্টো দিকের পুরোনো গৃহস্থ বাড়ীতে।

এক মানুষ সমান জানালাটার লোহার শিক ধরে কচি বৌটা। উদাস হয়ে কী দেখছে। সকালের টিটকারীর কথা মনে হতে সোহাগবালা ভাবে আমাদের সঙ্গে ওদের কীসের তফাৎ ? আমাদের হাজার বাবু। ওদের একজন। আমরা শুধু রাতেই মন যোগাই। ওরা? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। স্বামী, শ্বশুড়, শাশুড়ি, দেওর, ভাসুর, ননদ, জা। তার উপর ছেলে মেয়ের। রক্ষা করো বাবা। আমরা তো তবু স্বাধীন। পোষাল না, বাবুকে খেদিয়ে দিলাম। কিন্তু ওরা তা পারবে? মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে। তবে হ্যাঁ একটা জায়গায় ওরা ওপরে। ওরা মা। আর আমরা শুধুই মেয়ে।

সোহাগের সঙ্গে বালা। এ পাড়ায় এসে যোগ হয়েছে। বালা মানে তো মেয়ে। তারা যে শুধু মেয়েই, এই কথাটা ভাল করে বোঝানোর জন্যেই বোধ হয়। কবে? কবে যে সে সোহাগ থেকে সোহাগ বালা হল, এখন আর মনে পড়ে না। বহু দূরের যেন ঝাপসা ছবি। মাটির উঠোন। ছোট মেয়ে। ফ্রক। বাছুরের দড়ি ধরে বাবার পেছনে। উনোন লেপার মাটির সোঁদা গন্ধ। বড় .... বড় ঝাপসা। ভাবতে ভাবতে চোখ আবার গিয়ে পড়ে বৌটার চোখে। দুজনের চাউনি কি মিলেমিশে এক হয়ে গেল? তখনই 'সোহাগী' ডাকটা চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মেঝেতে এসে আছড়ে পড়ে।

চলমান জীবন — বহমান স্রোত

উৎপলেন্দু মণ্ডল

ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হতেই হাত নেড়ে বলে উঠল। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে গলার স্বরে বুঝতে পারলাম ঝর্ণাই।

—কি রে সেদিন কোথায় যাচ্ছিলি, এত করে ডাকলাম, শুনলিই না—

—কোনদিন?

—ঐতো যে দিন তুই বেশ ঝকঝকে একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বড় রাস্তায় মেয়ে দেখছিলি।

আমি মনে করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ সেদিন একটা চকচকে গেঞ্জিই পরেছিলাম। সস্তায় ফুটপাত থেকে কেনা। বেশ ভালো লাগে। পরলে মনে হয় হৃত যৌবন ফিরে পেয়েছি। সেদিন কাজের মেয়ের সঙ্গে আমার কন্যা স্কুলে যাচ্ছিল, আমিও বেরিয়েছিলাম। মেয়ের বায়নার কারণে স্কুলের গেট অবধি যেতে হয়েছিল। গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে ওকে আটকে দিল। অনেক করে হেডস্যারকে বললাম। তিনি আমার কোন কথাই কানে তুললেন না। আরও জ্ঞান দিলেন মোজা কিনে নিয়ে আসুন। মোজা না পরলে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমি ওদের গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে মোজা কিনতে যাই। যথারীতি একটা দোকানও খোলা পাইনি। আমি পাগলের মতো খুঁজে যাচ্ছি। মেয়েটা স্কুলে যেতে পারবে না, ওর সব বন্ধুরা স্কুলে আর ও বাড়ীতে, এসব ভাবতে ভাবতেই মনটা বিষন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তখনই পাশ দিয়ে ঝর্ণা রিক্সা করে চলে যাচ্ছিল, ভেবেছিল আমি বোধহয় রিক্সা খুঁজছি। ঝর্ণা আমাকে রিক্সায় উঠতে বলল। আমি কর্ণপাত না করে সোজ হাঁটতে লাগলাম। ওকে সমস্ত ঘটনা বলার মতো সময়ও পাইনি। সেই ঝর্ণা এখন আমার পাশে বসা। ওর জন্য আমাকে জানলার দিককার সিটটা ছাড়তে হয়েছে। মেয়েদের যে কি আরাম জানলার কাছে বসার। মাঝে মাঝে দেখি মিনিবাসের একবারে সামনের সিটটাতে বসে। ওকি জানে, কলকাতা শহরের একটা বাসেরও ব্রেক ঠিক নেই। আর কলকাতা অতো দেখার কি আছে! আমার মতো চাষারে, গ্রামের লোক না হয় একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে।

গত বছর ওকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। একটা হাফ কমার্শিয়াল কাগজে বেরয়। কাগজটা কি করে যেন ওর হাতে পড়ে। কবিতা লেখকদের অনেক সুবিধা। অস্পষ্টতাই তাদের ধর্ম। আর গল্প লেখকদের কি ঝামেলা; একটা গল্প অন্ততঃ থাকতে হয়। তাই গল্পের গরু যতই গাছে উঠুক। যদিও আমার লেখায় কোন গল্প থাকে না, শুধু ভাবনার কৃৎকৌশল। আর এই অভাব ঢাকার জন্য আমি চেনা অচেনা সব মানুষকে গল্পের মধ্যে নিয়ে আসি।

এতে বন্ধুত্বের সীমা লঙ্ঘন হয়, কার্যতঃ বন্ধুত্বহানি ঘটে তবু আমি নিরুপায়। ঝর্ণা লেখাটা পড়ে খুব খেপে গিয়েছিল; আর প্রবল উৎসাহে যখন বলেছিলাম, — এই গল্পটাই রেডিওতে পড়েছি — তখন ওর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে অনেকদিন আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেনি। বেচারী জানেনা গল্পের গরুকে যারা গাছে তোলে তারা প্রাত্যহিক জীবনে ভীষণ অসফল ঢেঁড়স মার্কা

লোক হয়। এদের বিরুদ্ধে পাড়া-প্রতিবেশী অফিসের লোকরা চিনে জোঁকের মত লাগে। পৃথিবীতে আর পাঁচটা কাজের তবু যা হোক একটা রেপুটেশন আছে। কিন্তু একজন গল্প লেখকের? নৈব নৈব চ। কিন্তু তবু সাদা পৃষ্ঠায় কেন যে এত লেখা লেখা খেলা বুঝতে পারি না— আসলে এটাই আমার ভবিতব্য। না হলে প্রিয় গোপল পাঠাশালা জীবন বিজ্ঞানের স্যার কেন এখানে এসে মরবে। কেন চারপাশের রক্তচক্ষুর মধ্যে তাকে বসে থাকতে হবে। কিন্তু এই বয়সে কি ফেরা যায়? এখন কত শেকড় বাকড় হয়ে গেছে। মাস গেলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনোর খরচ দেশে মাকে টাকা পাঠানো, সব সামলাতে সামলাতে কখন যে বুড়ো হয়ে গেলাম — চোখেমুখে সেই তারুণ্যের দীপ্তিটা নেই। কফি হাউসে ব্রিতর্কের তুফান তুলে আর আমরা বসিনা। শুধু ব্যক্তি জীবনের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে কাটিয়ে দিলাম। ঝর্ণার বর প্রসেনজিৎ-এর ও একই দশা। ভাবী কালের সাইনটিস্ট এখন ব্যাঙ্কে টাকা গোনে। বয়স বাড়ে। বাড়ি হয়। পুকুরে সুখী মাছেরা ঘাই মারে। মধ্যরাত্রে বড়ে গোলাম আলি ঘুম পাড়ায় ওদের।

আমি এসব কথাই লিখেছিলাম গল্পে। কাউকে আঘাত দিয়ে নয়। তবু পরিণামে দাঁড়াল অপ্রেম। আমার সঙ্গে দেখা হলেই মুখ ভার।

—কি রে একেবারে বোবা হয়ে গেলি? সুনীপার শরীর কেমন?

—ভাল।

—কিছু মনে করিস না। ভাবলাম; একদিন যাব তা আর যেতে পারলাম না। তোর মেয়ে কেমন আছে?

— মেয়ে ভাল আছে।

আমাদের বাসটা এগোচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পরে ডালহৌসী। অফিসের লোকরা শুধু ঘড়ির দিকে তাকায়। তাকে যেতে হবে অনেকদূর। এই বাসের শেষ গন্তব্যস্থল হাওড়া থেকে আবার আমাকে ট্রেনে উঠতে হবে। ভোটের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাগজগুলোও তৈরী। পাঠক ভোটের খবর খুব খায়। আসলে মানুষ চায় উত্তেজনা। সেই উত্তেজনা প্রশমনে প্রত্যহ সকালে খবরের কাগজ চাই। আর আমরা খবরের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তবে খবরের কাগজের কাছে মানুষ এখন নেপথ্য কাহিনী চায়। বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন চায়। আর এসব করতে গিয়ে আমার সাহিত্য সাধনা অগাধ জলে হাবুডুবু।

এই কাগজে ইন্টারভিউয়ের দিন আমাদের লাহিড়ীদা বলেছিল — স্কুল মাস্টারী ছেড়ে তুমি কাগজে চলে আসছ? তোমার টেবিল থেকে সাহিত্যটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে তবে তুমি নিউজে হাত দেবে। কথাটা আজও আমার স্মরণে রয়েছে। লাহিড়ী দা চলে গেছে। আমরা রয়ে গেছি। যাওয়ার জায়গাও নেই। এদিকে আবার একগাদা ধার।

নীপা অসুস্থ হয়ে আমাকে প্রায় পথে বসিয়ে দিয়েছে। প্রায় দু-মাস নার্সিং হোমে রাখা আমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সম্ভব হতে হ'ল। নীপা একটা স্কুলে পড়ায়। কো-এড। হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে বাড়ী এসে উল্টোপাল্টা কথা বলতে থাকে। কেমন যেন অস্থির। কয়েকদিন ধরে ওর ভাল করে ঘুম হচ্ছিল না। এর আগে একবার হয়েছিল ভালও হয়ে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। আবার কি সেই দিকে

এগোচ্ছে। দেখলাম, আমার অনুমানই ঠিক।

স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে এল। সেদিন আমার নাইট ডিউটি ছিল। রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে দেখি গোটা ঘর পায়চারি করছে। এক একবার ফোনের কাছে গিয়ে কাকে যেন ফোন করার চেষ্টা করছে। পুরনো ডাক্তারকে দেখালাম। সপ্তাখানেক ওষুধ-পত্রও খেল কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

আজকাল সারারাত আর ঘুমায় না। আমাকে সামলাতে হয় সব। অফিসে কতদিন ছুটি নেব। আমাদের কাগজের ধীমানদা বলল নার্সিংহোমে ভর্তি করে দে। তুই একা মানুষ, কত আর সামলাবি? আমারও মনে হ'ল তাই বারুইপুরের 'আপনজনে' ভর্তি করে দিলাম। এতে শ্বশুর বাড়ির লোকরা খুব রেগে যায়। হপ্তা তিনেক রেখেও কিছুতে কিছু হ'লন না। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। তাহলে কি সারবে না? সারাজীবন এভাবে কাটবে? সোনাকে কে মানুষ করবে! সংসার কি করে চলবে? কর্তা, গিন্নী দু-জন বাইরে চলে যাই বলে, একটা পার্মানেন্ট কাজের লোক রয়েছে। এদের মাইনে দিতে হয়। কোত্থেকে আসবে এসব?

খুকির জন্য খুব চিন্তা হয়। ওর মা যখন চ্যাঁচাত, জিনিষপত্র ভাঙচুর করত তখন খুকি হাসত। বোধহয় খুব মজা পায়। ভাবতাম কবে সোনার গায়ে ও হাত লাগাবে। এখন মা নেই। মেয়েটা সারাদিন আমার কাছে। আমার সব কাজকর্ম বন্ধ। কয়েকদিন হ'ল জ্বর কমেও না।

রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে পড়ে। বিছানায় খুব জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। ওর দিদা আর ভুলেও আমার বাড়ীতে পা দেয় না। অপরাধ তার মেয়েকে কেন নার্সিং হোমে দিয়েছি। এসব রোগীকে নাকি হসপিটালে দিতে নেই। তাতে হিতে বিপরীত হয়। — পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে আমার জন্য নাকি ওদের মেয়ের ওইরকম হয়েছে। সোনার জন্য কিছু করতে পারছিনা। ওর বাপের বাড়ীর লোকরা আমার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে।

এসব কথা ঝর্ণা জানে না। ঝর্ণার সময়ই বা কোথায়! চাকরী সংসার সব নিয়ে এমনিতে মেয়েরা খুব বিব্রত হয়ে থাকে। তবু এই যে পথে দেখা হলে কথা বলা, খোঁজ খবর নেওয়া, এটুকুই বা আজকাল কে করে।!

আজকাল মনে হয় পয়সা—থাকলে পৃথিবীতে অনেক কিছু করা যেত। অনেক সাধ পূরণ হ'ত। মানুষ বোধহয় এত হিংস্র থাকত না। মানুষ কি আবার বন্যজীবনে ফেরৎ চলে যাচ্ছে। না হলে অকারণে কেন এমন করে? এসবের কোন উত্তর নেই।

ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে খুব বেশী ভিড় নেই। তাদের সাউথ সেকশানের মত নয়। অবশ্য ট্রেন তো এখন কলকাতা থেকে মফঃস্বলে যাচ্ছে। এখন আর ভিড় হবে কি করে? একসময় এদিকে চাকরী করেছি। তাই ইচ্ছে করে নটা পঁচিশের গাড়ীটা ধরিনি। তা হলে সেই পুরনো কলিগদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। আবার কুশল বিনিময়। আবার একগাদা জ্ঞান। পেজ এডিটর সমরদা আমাকে পাঠাল, আমি এই জায়গাগুলো হাতের তালুর মতো চিনি। সমরদা'র ভাষায় ভাল করে কভার স্টোরী। সঙ্গে ফটোগ্রাফার

দিতে চেয়েছিল, নিইনি। ব্যাগে হাত দিয়ে হেসে উঠি—কোথায় রইল তোমার সাহিত্য। সারাজীবন নিউজের পিছনে ঘর করেই সময় কেটে গেল। এককালে মনে করতাম স্কুল মাস্টার হবো। প্রচুর ছুটি স্কুলে, ঐ অবসর সময়ে খুব লেখালেখি করা যাবে। স্বপ্ন সবটাই স্বপ্ন। হয়তো এই স্বপ্নগুলো ছিল বলেই সে এতদিন বেঁচে থাকতে পারলাম!

মাঠঘাট পেরিয়ে ট্রেনটা ছুটছে। মৌরীগ্রামের পর সব প্রায় ফাঁকা। তার পূর্বতন চাকরির কলিগরা অনেকে এই স্টেশনে নেমে যেত। আর কয়েকটা স্টেশন।

সাঁকরাইল... সেদিনও নেমেছিল, তারপর। তারপরের ঘটনাই তাকে এখানে নামিয়ে দিয়েছে। সেদিন যদি ঐ অ্যাক্সিডেন্ট না ঘটত তা হ'লে হয়তো কাগজের চাকরি করতে আসত না। এখন মনে হয় সবটাই ভবিতব্য। না হলে আজ মাইনে হ'ত দশ হাজার টাকা। এখন কাগজ যদি বন্ধ হয় তবে চাকরি খতম। কোম্পানীর অবশ্য চা বাগান হ্যানা ত্যানা আছে। হয় তো ঐ সব জায়গায় কোথাও ঢুকে যেতে পারবে। তখন কোথায় থাকবে এই কলকাতা। এই ভোটরঙ্গ।

দীর্ঘদিন যাতায়াতের রাস্তায় দেখছি কি গরমকাল, কি বর্ষাকাল মাঠ সব সময় সবুজ। গরমকালে উলুবেড়ের গঙ্গার জল আর এখন বর্ষাকালে আকাশ-বন্যা। প্রায় প্যারালাল চলে গেছে হাইরোড। কতবার যে এই রাস্তা দিয়ে গেছি—এখন মনে হয় যেন সব চেনা। যেন এই সেদিনও সেখান থেকে এসেছি। এখনও অনেকটা পথ, আবার আজ রাতে ফিরতে হবে। একবার জেলা সভাধিপতির কাছে যেতে পারলে ভাল হত। রিপোর্টটা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত। দেখি কি হয়।

মাঠ ভেঙে হাওয়া আসছে। চোখ যেন কি এক ঘোরের মধ্যে আটকে গেছে। এইসব জায়গা কত পুরনো জনপদ. কত মানুষের হাসি; অশ্রু। সেই বল্লাল সেনের আমল থেকে...কত রাজ্যপাট, শিক্ষক, কেরানী, অফিসার সব পথ একদিকে মিশে গেছে...এক বৈকুণ্ঠের দিকে। সব দ্বিধা দ্বন্দর শেষ। তবু মানুষ যায় মানুষে।

—স্যার ভাল আছেন?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, নাম মনে পড়ে না।

—স্যার আমি আনন্দ। মনে পড়ছে আপনার। আপনি আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

—কি করব আর করা গেল না। তোমাদের ওখানে যা সব লোকজন। আমি অতদূর থেকে আসতাম ... কোন দয়া দাক্ষিন্য নেই, তার উপর নিত্য নতুন নিয়ম চালানো। তোমাদের ঐ মিত্র মাস্টার মশাই! কি মানুষ! মানুষ নয়-যন্ত্র! তা তুমি এখন কি কর?

ঐ স্যার মায়ের ব্যবসা। কাঁচা সব্জি নিয়ে বাজারে যাই। কি করব স্যার, আর পড়তে পারলাম না। পয়সা কড়ি কিছু ছিল না। বাবাও তাড়াতাড়ি চলে গেল। আপনি এখন কি করেন স্যার?

—আমি এখন একটা কাগজে চাকরি করি।

আর কথা এগোয় না। আনন্দ অনেক বড় হয়ে গেছে। ও যখন ক্লাস ফাইভে পড়ত—আমি তখন

সদ্য যুবা। কলকাতা থেকে দূরে চাকরি করতে গেছি। বুকে একরাশ স্বপ্ন। এখন সব স্বপ্নের সমাধি। আমি সামান্য একজন রিপোর্টার। বাড়ীতে অসুস্থ একজন মানুষ; সঙ্গে ফাউ হিসেবে আমার চার বছরের শিশুকন্যা। এসব ভেবে ভেবে আজকাল খুব অবসন্ন লাগে। আনন্দ চুপচাপ বসে থাকে। কত ছোট ছিল, কারুর জন্য কিছুই থেমে থাকে না।

আমরাও এগিয়ে যাই। সামনের স্টেশনে দু-জন নামব। তারপর ভিন্নপথে।

নীলরতনের মেয়ে

প্রগতি মাইতি

সৌম্যদ্বীপ-রচনার বিয়েতে ডাঃ সেন খরচের কোন কার্পন্য করেনি। দু'জনেই তার ছাত্র-ছাত্রী। ঘটনাক্রমে রচনার পিতৃপরিচয় ডাঃ সেনই। রচনাও জানে ডাঃ সেন একাধারে তার শিক্ষক অন্যধারে তার পালক পিতা। প্রথম প্রথম আসল বাবা-মায়ের পরিচয় জানবার পর মুষড়ে পড়েছিল রচনা। ডাঃ সেন কোনকিছু গোপন করেনি। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষে সৌম্যদ্বীপের সঙ্গে সম্পর্কটা গভীর হয়। শুরুতেই রচনা তার জন্ম বৃত্তান্ত সৌম্যদ্বীপকে বলে সতর্ক করেছে। সৌম্যদ্বীপের প্রতিক্রিয়া— আমি সৃষ্টির আনন্দে থাকতে চাই, স্রষ্টাকে নাই বা জানলাম।

বিয়ের দিন রচনার মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল কেবল তার পালিতা মা হাসপাতালের গৌরীমাসির জন্য। গৌরীমাসী রচনার প্রাথমিক দায়িত্ব না নিলে, রচনাকে অপরিচিতই থাকতে হোত। গৌরীমাসি নীলরতনের আয়া। হাসপাতালেই গাইনো ওয়ার্ডে থাকতো। নিকটাত্মীয় কেউ ছিল না গৌরীমাসির। পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময়েই পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রায় এক কাপড়ে ভারতে চলে আসে। নিজের প্রয়োজন খুবই সীমিত, তার চেয়ে বরং অন্যের বেশিই ছিল। হাসপাতালের ঝাড়ুদার থেকে আয়া — সব মাসেই কেউ না কেউ ছুটে যেত। দরাজ হস্তে গৌরীমাসী ধার দিত। তার মধ্যে অনেক টাকা অনাদায়ও থাকতো। সকলের প্রিয় গৌরীমাসী। ডাক্তার, নার্স, এমনকি সুপারও একডাকে গৌরীমাসীকে চেনে।

এগারো নম্বর বেডে দু'জন রুগী। ফতেমার ডেলিভারী হয়েছে। তাই তার বেডের অংশীদার সুনীতার মাটিতে স্থান। চার চারটে মেয়ের পর পঞ্চম কন্যার গর্ভধারিনী ফতেমার সারারাত ঘুম নেই। হাসপাতালে আসবাব সময় শাশুড়ি আর স্বামী ধমক দিয়ে বলেছিল — 'শুইন্যা রাখ মাগী, এইবারেও যোদি মাগী বেওস্, তাইলে তোদের দু'জনেরই কবরে পাঠাইবো।' আখতার জানেও না কবে তার বিবির কন্যা সন্তান হয়েছে। সপ্তাহে একদিন এসে দেখা করে যেত আখতার। কাল বুধবার, আবার আখতার আসবে। এসে যদি ফতেমার কোলে কন্যা সন্তান দেখে! বারো নম্বরের ছেলে হয়েছে। ফতেমা ভাবে রাত্রে ঘুমের মধ্যে বদলে নেবে কিনা। বার দু'য়েক বারো নম্বরের আশে-পাশে ঘোরা-ঘুরি করে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করেছে। বারো নম্বরের বউটার যেন ঘুম নেই। আবছা আলোয় ফতেমা লক্ষ্য করে বউটার যেন চোখ বন্ধ। কাছে যেতেই দেখে জেগে আছে। সন্তানের অতন্দ্র প্রহরী। অন্যদিন নার্সরা ঘুমিয়ে পড়ে। আজ যেন নার্সরাও তার শত্রু। বড় বড় চোখ করে কাঁচের দেওয়াল দিয়ে বীথি আর নীলীমা খোশ গল্পে ব্যস্ত। ফতেমা একবার ভাবে সুনীতার কোলে মেয়েকে শুইয়ে এই রাত্রেই চম্পট দেয়। আবার ভাবে সুনীতার তো প্রসব হবে, তখন! সাত-পাঁচ ভাবতে থাকে ফতেমা। নিজের জীবন আগে, নাকি দশমাস গর্ভে ধরা কন্যার ভবিষ্যৎ আগে। আখতারের কাছে আবার একটা সন্তান-কামনার পথ তো খোলাই রইল। বারদুয়েক মেয়েটাকে বুকের দুধ খাওয়ালো ফতেমা। বড্ড রাগ মেয়েটার ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না। মায়াও হয় ফতেমার। ঠোটের ঠিক নিচে একটা তিলের মতো দাগ। কান্নার সময় মনে হয় হাসতে হাসতে কাঁদছে। — কি করি রে আমি তুয়াকে লিয়ে, তুই বাঁচলে আমি বাঁচুম না, কই যাই বল্ দেকিনি! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ফতেমা। যখনই মেয়ের ওপর মায়া আসে, তখনি স্বামী ও শাশুড়ির সতর্কবার্তা কানে বেজে ওঠে।

ফতেমার এককালের প্রতিবেশী আয়েষার কথা মনে পড়ে। সাত-সাতটি সন্তানের জননী আয়েষা। স্বামী তালাক দিয়েছিল। শেষতম কন্যা-সন্তানকে নিয়ে পার্কসার্কাস রেল স্টেশনের একটা ঝুপড়িতে নতুন ঠিকানা তৈরী করেছে। চারঘর ঠিকা কাজ করে একজনের বাড়িতে আবার দু'বেলা খাবার দেয়। ঐ খাবার আয়েষা বাড়িতে এনে মা-মেয়ে ভাগ করে খায়। ফতেমা সাথে হঠাৎ-ই একদিন আয়েষার দেখা হয়েছিল। ফতেমা আয়েষার নতুন জীবনের হাল হকিকত জানতে পারে। আয়েষা যদি স্বামী ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে, সে কেন পারবে না? ফতেমা ভাবে সেও মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে আয়েষার কাছে আশ্রয় চাইবে। মনস্থির করে ফেলে ফতেমা। ভোরে গেট খুললেই পগার পার। আখতার এসে ফতেমার টিকিও খুঁজে পাবে না। হাসপাতালে আসার দিন বড়মেয়ের জ্বর দেখে এসেছিল ফতেমা। চতুর্থ কন্যা দিলরুবার কান্না এখনও যেন ফতেমার কানে ভাসে। ফতেমা ভাবে— এক মেয়ের জন্য চার চারটে মেয়েকে ছেড়ে যাবো! ওরা কি অন্যায় করেছে? ফতেমার অনুস্থিতিতে ঐ চারটে মেয়ের ভবিষ্যত কি হবে? আখতার আবার নিশ্চয় নিকাহ করবে। সাত-পাঁচ ভাবনায় ফতেমাকে উদভ্রান্তের মতো লাগে। রাত চারটে থেকেই শৌচালয়ে আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। কর্তব্যরত দুই নার্স বীথি আর নীলিমা শেষ রাত্রের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। হরি সিং-কে চা আনতে যাওয়ার কথা বললেই গেট খুলে দেবে। আর দেরী নয়। গরিষ্ঠ কন্যার স্বার্থে লঘিষ্ঠ কন্যাকে ত্যাগ না করে ফতেমার উপায় নেই।

সকালে বীথি ও নীলিমা নিয়মমাফিক কতকগুলো ট্যাবলেট নিয়ে ওয়ার্ডে ঢোকে। বীথি ফতেমার বেডের কাছে এসে দেখে সযত্নে থাকা নবজাতক গভীর নিদ্রায় মগ্ন, পাশে নেই তার গর্ভধারিণী। নিচে শুয়ে থাকা সুনীতাকে ফতেমার কথা জিজ্ঞাসা করে বীথি। — কি করে বলবো? বাথরুমে যেতে পারে? — উত্তর দেয় সুনীতা। মিনিট পনেরো বাদে বীথি আবার ফতেমার বেডের কাছে ওষুধ দিতে আসে। তখনও ফতেমার দেখা পায় না। চিৎকার করে বীথি বলে — এসব কি মা রে বাবা। বাচ্চা ছেড়ে কোথায় যায়? নীলিমা বীথিকে ডাকে — কি রে ডিউটি তো শেষ হোল। বাড়ি যাবি চল।

— আরে দেখ না, এগারো পেসেন্ট বেপাত্তা, ওষুধ কাকে দেব! উত্তর দেয় বীথি।

— বুলা আর রুমকিকে বলে যা, ওরা দিয়ে দেবে।

সেইমতো সকালের শিফ্‌টে ডিউটিতে আসা বুলা আর রুমকিকে বীথি এগারো নম্বরের ওষুধের কথা বলে চলে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে এগারো নম্বরের নবজাতক কাঁদতে থাকে। প্রথমে সুনীতা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। ফল হয় না। চিৎকারে সারা ওয়ার্ডে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয় শিশুটি। বুলা-রুমকি ওয়ার্ডে আসে। চারিদিকে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে খবর যায়। পাশেই পেইং বেডে ডিউটিতে থাকা গৌরীমাসী আসে। এতক্ষণ কেউ শিশুটিকে কোলেও তোলেনি। গজ গজ করতে করতে গৌরীমাসী কোলে তুলে নাচাতে থাকে শিশুটিকে। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধা টাকা দিয়ে ফিডিং বোতল, দুধ আনতে আর এক আয়াকে পাঠায় গৌরীমাসী। — দৌড়ে যা, দেরী করিস না, যাবি আর আসবি। ধমকের সুরে নির্দেশ দেয় গৌরীমাসী। লিফ্‌ট খারাপ। তিনতলা থেকে নিচে নেমে ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে দুধ ও বোতল আনতে একটু সময় তো লাগবেই। এদিকে শিশুটির গলার স্বর সপ্তমে ওঠে। গৌরীমাসী অন্য একটি বেডের মা হওয়া ফাল্গুনীকে বুকের দুধ দিতে অনুরোধ করে। তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে ফাল্গুনী — আপনি কি ক্ষেপেছেন? নিজের বাচ্চারই দুধ হয় না, তার উপর আবার মুসলমানের মেয়েকে দুধ খাইয়ে জাত খোয়াব নাকি? আমি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ।

গৌরীমাসি ক্ষেপে যায়। ভ্রূ-কুঁচকে বলে — বলি জাত কি কারুর গায়ে লেখা থাকে? বাচ্চার

আবার জাত কিসের? কথা বলাবলির সময় শিশুটির কান্না খাদে নেমে আসে। কথা শেষ হতেই আবার চড়ায়। সাত নম্বরের শুভ্রা গৌরীমাসির কোল থেকে শিশুটিকে নিয়ে নিজের বেডে চলে যায়। গোগ্রাসে শিশুটি দুধ খায়।

— পোড়ারমুখী, তুই কি গাই দুইয়ে দুধ আনলি?

— মুখ করছো কেন মাসী, রাস্তাটা কি কম!

— তোকে বলেছিলুম না, যাবি আর আসবি।

— মুখে মুখে তক্ক করিস না।

ডাঃ সেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ওয়ার্ডে ভিজিটে বেরিয়েছে। ঝড়ের তান্ডব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কেমন থমথমে হয়ে যায়, ওয়ার্ডের অবস্থা তখন তাই। সকলে তখন নিজেদের আসন অলংকৃতও করতে পারেনি।

— কি হয়েছে গৌরীমাসী? ডাঃ সেন জিজ্ঞেস করে।

— আর বলেন কেন সার। এগারো নম্বরের পেসেন্ট উধাও, এই তার বাচ্চা।

— সুপারকে খবর দেওয়া হয়েছে?

সে কি আর আমার কাজ? সিস্টারদের জিজ্ঞাসা করেন না সার? ডাঃ সেন বুলা ও রুমকিকে সুপারকে খবর দেওয়ার কথা বলে ওয়ার্ডে ঢোকে।

হাসপাতালের রেজিস্টারে ফতেমার ঠিকানা লেখা ছিল— এন্টালি, স্বামী আখতার আহমেদ, বয়স ছাব্বিশ। পুলিসে ডায়েরী করা হয়। শিশুটিকে টেরিজার 'নির্মল হৃদয়ে' স্থান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পুলিসের রিপোর্ট না পেলে সিদ্ধান্ত বলবত করা যাবে না। পুলিশ প্রথমেই আপত্তি জানায় তদন্তের ব্যাপারে। ঠিকানা কেবল এন্টালি বললেই কি খোঁজা সম্ভব! এতো সেই খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা! তবু ঐ এন্টালি অঞ্চলেই পুলিশ বারোটি ফতেমা বিবির সন্ধান এনেছে, যার একজনেরও স্বামী আখতার আহমেদ নয়। অগত্যা? এদিকে প্রায় একমাস অতিবাহিত। গৌরী মাসীর কাছেই শিশুটি ছিল। সুপার অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও হার মানে। ঘটনাকে পুরোপুরি চাপা দেওয়া হয়। মেয়েটি গৌরীমাসীর কাছেই বড় হতে থাকে। নাম দেয় গুড়িয়া।

প্রায় দেড় বছর বয়স হয়েছে গুড়িয়ার। ফুটফুটে ফর্সা সারা ওয়ার্ডে গুটি গুটি পায়ে ঘুরে বেড়ায়। নীলরতনের মেয়েকে সকলেই আদর করে। ফোলা ফোলা গাল ধরে টানে। হঠাৎ একদিন ডাঃ সেনের চোখে পড়ে গুড়িয়া।

— হ্যাঁ গো গৌরীমাসী একি কোন সিস্টারের মেয়ে?

— না সার, মনে আছে ঐ যে একটা পেশেন্ট মেয়েকে ছেড়ে পালিয়েছিল? এটা তারই। আমি রেখে দিয়েছি।

সে কি গো! তুমি মানুষ করছো?

— মানুষ আর করছি কোথায়? খাওয়া পরা দিলেই কি মানুষ হয় সার!

— তা তুমি ওকে লেখাপড়া করাবে? বড় করবে?

— আপনি করুন না সার। আপনার তো কোন ছেলে-মেয়ে নেই শুনেছি।

— তুমি দেবে আমাকে!

— কেন দেব না? তবে হ্যাঁ, আমি হর-হপ্তায় একদিন যাব। আমাকে গুড়িয়াকে আদর করতে দিতে হবে।

— তা যাবে বৈ কি!

এরপর গৌরীমাসীকে চাকরী ছেড়ে ডাঃ সেনের বাড়িতেই আয়া হতে হয়। ডাঃ সেনের স্ত্রী রঞ্জনার ইচ্ছানুসারে রচনার আয়া এবং গুড়িয়ার মায়ের ভূমিকা পালন করতে হয় গৌরীমাসীকে। রচনা যখন ক্লাস এইটে পড়ে, গৌরীমাসী হেপাটাইটিসে মারা যায়।

সৌম্যদ্বীপ রচনার গোমড়া মুখ দেখে জিজ্ঞেস করে — কি গো আজ আবার তোমার কি হল?

— কিছু না ।

— কিছু না বললেই হোল? কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে, বলো না আমাকে!

— আসলে গৌরীমার জন্য মনটা খারাপ লাগছে।

— কী আর করবে বলো? উনি বেঁচে থাকলে আজ তোমাকে সম্প্রদান করতেন হয়তো। দারুন হতো। কিন্তু .... আচ্ছা তোমার আসল মায়ের জন্য মনখারাপ লাগছে না?

— আসল মা বলতে তুমি কাকে বোঝাতে চাইছো? ফতেমা বিবি? জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না সমু?

— যাক্ আজ আর এসব নিয়ে নাইবা আলোচনা হোল!

— একটু হালকা তো হওয়া যায়।

— সত্যি তোমার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়। আজকাল তো সাহিত্যিকেরা ভালো প্লট পাচ্ছেন না।

— উপন্যাসের নায়ক তো তুমিই হবে।

— আমি নায়ক হব কেন? নায়িকার স্বামী মানেই নায়ক নাকি?

— হ্যাঁ তাই।

— আমার তো মনে হয় ডাঃ অনিকেত সেনই নায়ক। গৌরীমাসী নায়িকা। তুমি আমি পার্শ্বচরিত্র। রচনা হেসে ফেলে। সৌম্যদ্বীপও গলা খুলে হাসতে থাকে। দুজনের হাসির মধ্যেই বেড সুইচে হাত চলে যায় সৌম্যদ্বীপের। আবছা সবুজ আলোয় নীলরতনের মেয়ের নতুন জীবন রচনা শুরু হয়।

নীড়

শ্রীকান্ত

প্রথমে একেবারেই রাজি ছিল না তোর্সা। তোর্সা মানে তোর্সা চৌধুরী, এই সময়ের ব্যস্ততম গায়িকা। সরকারী কোনো অনুষ্ঠানে সে যায় না, যাবেও না—এই ব্যাপারে সে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না। ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে টেলিফোনে জানিয়েও দিয়েছিল সে কথা। মুশকিল বাঁধল এখন সরাসরি সামনাসামনি কথা বলতে আসায়। তবুও সে আপত্তি জানিয়ে নিষেধ করেই দিয়েছিল। এর মধ্যে উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে একজন বোধ হয় শেষ চেষ্টা হিসাবে যায় নাম করে অনুরোধটা জানাল, তার কথা মনে পড়তেই একটু নরম হয়ে গেল সুরটা। এরকমটা হবার কথা নয়, তবু হয়ে গেল। বলল, ঠিক আছে, দেখি চিন্তা করে। এক্ষুণি কথা দিচ্ছিনা।

উদ্যোক্তারা চলে গেল। কিন্তু কানের মধ্য দিয়ে যে নামটা মরমে পৌঁছিছিল, সেটার অনুরণন চলতেই থাকল। দিব্যজ্যোতি মুখার্জী - ডি জে মুখার্জী, আড়ালে আবডালে শুধুই ডি. জে। প্রায় অবচেতন স্তর থেকে স্মৃতির পথ বেয়ে উঠে আসা না। কতবছর আগের মথা! তখন সবে কৈশোর পার করে সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পাওয়া সদ্য চাকরী। প্রায় সমসাময়িক বয়সের একগুচ্ছ ফুল যেন। তা, ছেলে মেয়ে মিলে জনা পনেরো তো হবেই। অর্থ দপ্তরে সে যেন এক চাঁদের হাট। পাশাপাশি টেবিলে বসা। ফাঁক পেলে ওরই মধ্যে জমিয়ে আড্ডা। গুণগুণ গান।

তার প্রতিভার আবিষ্কার হতে অল্পই সময় লেগেছিল। ছোটবেলা থেকেই গানের গলা ভাল ছিল। তালিম পেয়ে পেয়ে তখন সে বেশ স্বচ্ছন্দ। সবাই শুনত মগ্ন হয়ে। সহকর্ম্মীরা তো বটেই সিনিয়র দাদারাও উপভোগ করত। বড়বাবু, সেকশান অফিসার এমনকি দপ্তরের রেজিষ্ট্রারও কখনো কখনো আসা যাওয়ার পথে খানিক দাঁড়িয়ে শুনে যেত ওই গুণগুন করে গাওয়া গানই। কখনো সখনো অবশ্য প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে বলতো বারে মেয়ে, চমৎকার গলা তো তোর! গাইছি'স গা, তবে সাহেব সুবো সম্‌ঝে কিন্তু।

এভাবেই চলছিল বেশ। এমনই একদিন। সেদিন সম্ভবতঃ কোনো উপলক্ষ্যে রেস্ট্রিকটেড হলিডে ছিল। অফিসে উপস্থিতির হার খুব কম। তবে নিউ রিক্রুটরা প্রায় সবাই হাজির। টিফিনের সময় গান জমে উঠেছে। তোর্সা নিউ নিজেই চোখ বুজে গাইছে। লোকজন কম থাকায় সাহস করে বোধহয় একটু জোরেই গাইছিল। বাকীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওর দিকে মুখ করে একটা গান শেষ করে তোর্সা চোখ খুলে দেখে, সহকর্মীদের পেছন দিকে একটু দূরে দপ্তরের তরুণ আই.এ.এস অফিসার। সদ্য জেলা থেকে আসা। দিব্যজ্যোতি মুখাজ্জী। মুগ্ধ হয়ে গান শুনছিলেন। গান শেষ হতেই ভদ্রলোক যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে নিজরে চেম্বারে ঢুকে গেলন। কিছুক্ষণ বাদেই মুখাজ্জী সাহেবের বেয়ারা কালিপদ এসে তোর্সাকে বলল, দিদিমণি, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

তোর্সা অবাক হয়ে গেল। এমন তো হয় না। গান তো রোজই হয়। কই কোনো অফিসার তো

তার জন্য ডেকে পাঠিয়ে কিছু বলেন না। বেশ ঘাবড়ে গেল সে। কেউ কেউ বলল, যা না, যদি গানের জন্য কিছু বলেন, আমরা সবাই গিয়ে দোষ স্বীকার করব। কিছু হবে না। কেউ কেউ বলল, সত্যেনদাদের মুখেই শুনেছি, ওরাও ওদের সময়ে এমন গান বাজনা করতেন। এটা নতুন কিছু নয়। সেক্রেটারিয়েটে এসব খুব একটা গুরুত্ব দেয় না কেউ। কাজটাই হল আসল। সেটায় তো আমরা ফাঁকি দিই না।

তোর্সা গেল। ভীরু পদক্ষেপ। সুইং ডোর ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বলল, আমায় ডেকেছেন স্যার?

— হ্যাঁ। আসুন। বসুন। আপনিই তো গান করছিলেন, তাই না?

তোর্ষা বুঝে উঠতে পারল না, ঠিক কি বলা উচিত। শেষে সত্যি কথাই বলল, হ্যাঁ স্যার।

— গান শেখেন?

— হ্যাঁ স্যার, শিখি।

— কার কাছে শেখেন?

— ওস্তাদ ... খাঁ সাহেবের কাছে।

— কতদিন শিখছেন?

— বছর চারেক হবে। তার বেশ কয়েক বছর আগে আর একজনের কাছে।

— রেগুলার অফিস করে রেওয়াজ এবং গান করার সময় পান? কোথায় থাকেন?

— সোনারপুর স্যার।

— সে কি? এতদূর থেকে আসা যাওয়া করে....। আচ্ছা, আপনি রোজই এখানে গান করেন, তাই তো? তার মানে প্র্যাকটিশটা এখানেই করেন?

তোর্সা চুপ। কথার স্রোত ঠিক এমনভাবে বাঁক নেবে ভাবেনি। অর্থাৎ এর পরই সম্ভবতঃ আসছে অ্যালিগেশন। হলও তাই মুখার্জী সাহেবের পরবর্ত্তী জিজ্ঞাসা, অফিসে গান গাওয়া ডিসিপ্লিন ভঙ্গের সামিল, এটা জানা আছে? ডবল্যু. বি. এস. আর এর বইটা দেখেছেন কখনো?

তোর্সা মাথা নীচু করে জানাল, দেখেছি স্যার।

— পড়েছেন কিছু? তোর্সা চুপ। পড়বে কখন? কাজের ফাঁকে আড্ডা, গান। সময় কোথায়?

— ঠিক আছে যান।

বাইরে বেরিয়ে দেখে সুইং ডোরের পাশে অপেক্ষমান বিরাট উৎসুক জনতা। তারা কথোপকথনের কিছুটা শুনেছে, বাকীটা আন্দাজ করেছে।

— কি রে, কি হল?

— কি আর হবে? যা হবার তা হল। তোদের আর কি? তোরা তো নির্বাক শ্রোতা। গান গেয়ে অফিসের ডিসিপ্লিন ভেঙেছি তো আমি। এমন হবে জানলে...। তোর্সা প্রায় কেঁদে ফেলে।

— যাকগে। এখন থেকে সাবধান হবে গেলাম। অল্পের উপর দিয়েই গেল বোধহয়।

অতএব গান বন্ধ। আড্ডাও ঠিক জমছে না। কেমন যেন একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব দপ্তরে। কি হয়, কি হয় ধরণের। এরই মধ্যে একদিন আবার কালিপদ

— দিদিমণি, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

তোর্সা কি করবে, সাহেব ডাকলে যেতেই হয়। তার উপর আবার আই.এ.এস। দুরু দুরু বুকে গিয়ে হাজির — স্যার ডেকেছন?

— হ্যাঁ। বসুন। আচ্ছা — আপনি গান বন্ধ করে দিয়েছেন?

— হ্যাঁ স্যার। সেদিনের পর তো আর....।

— গানটা বন্ধ করে দিলেন? যাকগে, আপনার বাড়ীতে আর কে কে আছেন? তাঁরা কে কি করেন? অবশ্য এসব জানতে চাওয়ার কথা নয় যদিও...।

— না না তাতে কি আছে? বাবা, মা দাদা আর আমি। বাবা শিক্ষকতা করেন।"দাদা একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে....। তাকে শেষ করতে না দিয়ে মুখার্জী সাহেব বলে উঠলেন, ঠিক আছে আপনি আসুন।

সেদিন শেষ বেলাতেই ঘটনাটা ঘটল। বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ পিয়ন বুক মারফৎ একটা চিঠি পেল তোর্সা। প্রায় বিনামেঘে বজ্রপাত। বলা হচ্ছে, অফিসের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ, কাজকর্ম্মের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট বিঘ্নিত করার দায়ে তাকে সাসপেন্ড করে হল। আদেশ চিঠি পাওয়ামাত্র কার্যকরী হবে।

চোখ ফেটে জল এসেছিল তোর্সার। এ কেমন ধরণের লোক মুখার্জী সাহেব। নিজে চোখ বুজে গান শুনলেন, অন্তত সে রকমই দেখেছে সে। তখনই ডেকে প্রায় ধমকালেনও। তাতেও হল না, একেবারে সাসপেনসন? এত গোপনতার সঙ্গে অর্ডারটা করা হল? কি এমন অপরাধ তার? সিনিয়ররা কয়েকজন গিয়েছিল তদ্বির করতে। ভদ্রলো নাকি নির্বিকার চিত্তে বলেছেন, বৃথা এসেছেন। যা বলার ওই অর্ডারেই বলা আছে। রুল হ্যাজ টেকেন ইট্স্ ওন কোর্স।

সাসপেনসন অর্ডার একবার ইস্যু হয়ে গেলে, ছুঁড়ে দেওয়া তীরের মত, ওটা আর ফেরানো যায় না সুতরাং করে আর কিছুই ছিল না। তবে তোর্সা ভেবেছিল তার চাকরীটাই বুঝি গেল। তা নয়। বরং বলা হল, প্রথম তিনমাস যে মূল বেতনের অর্ধেক পাবে, তারপর থেকে থ্রী ফোর্থ, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাদি সব। এই নির্দেশ পেয়ে তোর্সা যেন বেঁচে গেল। তার পক্ষে শাপে বরই হল। চাকরীটা তো রইল আপাততঃ। মাইনে কিছু কমে গেল। উলটে সে পরিপূর্ণভাবে গানে প্রাণ ঢেলে দিল।

তারপর দ্রুত সময় কেটেছে। আপীলের ফয়সালা হয়নি। সাসপেনসন পিরিয়ড দীর্ঘায়িত হয়েছে। কোন এক সময় পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীত জগতের একজন হয়ে উঠেছে। ফাংশন, গান, রেকর্ডিং। এক সময় এমন হল যে অফিসে গিয়ে সাবসিস্টেন্স অ্যালউন্সটা আনারও সময় পেল না। অথরাইজেশনে আনতে হোত। ধীরে ধীরে কি ভাবে যে রেডিও থেকে, টি.ভি থেকে ডাক এল, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে ডাক আসতে থাকল... সে এক স্বপ্ন যেন। কি ভাবে তার গানের প্রচার এত দ্রুত পেল, নিজেও সে বুঝতে পারল না।

এক সময় চাকরীর কথাটাই সে ভুলে গিয়েছিল। মনে থাকার কথাও নয়। এরই মধ্যে একদিন পুরানো দপ্তর থেকে তাকে জানানো হল, আপীলে তার জয় হয়েছে। সে যেন শীঘ্রই চাকরীতে যোগদন

করে। মুচকি হেসে চাকরি থেকে রিজাইন করার একটা চিঠি পাঠিয়েছিল অতঃপর, আর একটি বেকারের বেকারত্ব ঘুচুক অন্ততঃ।

.... তোর্সা অবাক হয়ে এসবই ভাবছিল। কতদিন আগের কথা। ভদ্রলোকেরা ডি.জে. মুখার্জীর নাম করাতে কবেকার সেইসব স্মৃতির কপি খুলে বসেছিল সে। উদ্যোক্তারা কখন চলে গেছে। এই মুহূর্তে খোলা জানালা দিয়ে হেষ সূর্যাস্তের ম্লান রক্তিমাভা বড় করুণ মনে হল তার। এইভাবেই কি সময় গড়িয়ে যায়? কর্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে একটা কর্মমুখর দিন কিভাবে সায়াহ্নে এসে উপনীত হল। এখন ঘরে ফেরার পালা। এক ঝাঁক পাখী বিশাল আকাশের পটভূমিকায় নীড়ে ফিরছে। এই অঞ্চলটা শহরের অত্যন্ত অভিজাত এলাকা। এরই মধ্যে তার শিল্পসম্মত সুমজিত বাসস্থান ''নীড়''। শরতের এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই কেন যেন তার মনে হল এই নীড়ে সে বড় একা। পরিপূর্ণ নীড় নয় এ। ব্যস্ততা, খ্যাতি, মান, সম্মান, যশ-সবই হল। নীড়ও তৈরী হল একটা। কিন্তু তা যেন পরিপর্ণতা পেল না। ডি. জে. মুখার্জ্জীর ওই সাসপেনসন অর্ডারটা না হলে বোধ হয়....।

পরদিন তোর্সা নিজে টেলিফোন করল - হ্যালো, আপনাদের ফাংশনে আমি যাব। তবে আমার সম্মান দক্ষিণা দিতে পারবেন তো আপনারা? আপনাদের তো অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

— হ্যাঁ। হ্যাঁ। সে সব কিছু অসুবিধা হবে না। আপনি যে রাজী হয়েছেন...। ভালই হল রাজী হয়ে, তোর্সা ভাবে। বিস্মৃত প্রায় ওই অধ্যায়টা যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল মনের মধ্যে সেটার হয়ত কিছু উপসম হবে। তবে তার দপ্তরটা ছিল অর্থ দপ্তর। আর এটা কি একটা কমিশন। চেয়ারম্যান হিসাবে ওই ডি.জে.মুখার্জীর নাম দেখা যাচ্ছে চুক্তিপত্রে। দেখুক ওই ডি. জে, গান করার জন্য যাকে সাসপেন্ড করেছিল, তাকে সে নিজেই এবার উপযাচক হবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে উমেদারী করে। এও এক মন্দ খেলা নয়।

অনুষ্ঠানের দিন নিজেকে উজাড় করে দিয়ে গান গাইল তোর্সা চৌধুরী। চিনতে পারল বৈকি ডি. জে. মুখার্জীকে। চুলে রুপেলি রেখা দুই এক জায়গায়। গৌরবর্ণ গায়ের রঙে সেই রেখা যেন এক আলাদা আভিজাত্য এনে দিয়েছে। সমস্তক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে সামনের সারিতে বসে গান শুনলেন। কে বলবে এই গান গাওয়ার জন্য সাসপেন্ড করেছিল।

অনুষ্ঠান শেষে ঘোষক ঘোষণা করল—এবার আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান শ্রী দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বাঙ্গালী শিল্পীকে ব্যক্তিগতভাবে সম্মান জানাবেন।

মঞ্চে এ মুহূর্তে তোর্সা একা। দিব্যজ্যোতি ধীরপায়ে এগিয়ে এলেন। কারুকার্যখচিত বড় এক রূপার থালায় একপাশে একগুচ্ছ সুগন্ধী জুঁইফুল অন্যপাশে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার একটি সুদৃশ্য খাম। নীচু হয়ে তার হাতে তুলে দিলেন। করতালিতে হলঘর ফেটে পড়ল। সে সব কিন্তু কিছুই কানে গেল না তোর্সার। তার সমস্ত দেহমন জুড়ে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে দিব্যজ্যোতির কথা, আজকের দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমার মিশন সার্থক। সেকথা তোর্সা ছাড়া আর কেউ শুনল না।

নীড়

এখন গভীর রাত। নীড়ের সব আলো নিভে গেছে। তোর্স চৌধুরী একা পোর্টিকোতে। মাথার উপর মুখবন্ধ খামটা খোলা। ভেতরে আছে একলক্ষ এক টাকার একটি চেক। আর কয়েক লাইনের একটি চিঠি। তোর্সা একটু আগেই সেটি পড়েছে —

দীর্ঘ প্রায় বছর কুড়ি আগে একজনকে প্রায় বিনা দোষে সাসপেন্ড করেছিলাম। এটি করার পেছনের কারণটা জানানো প্রয়োজন মনে করি। আমার মনে হয়েছিল, তোর্সা চৌধুরী নামের এই মেয়ে সারাদিন অফিস কাছারী করে নিজের ক্ষমতা নষ্ট করছে। এ মেয়ে স্বতন্ত্র। একে পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত করার জন্য একটাই রাস্তা খোলা-সেটা হল সাসপেন্ড করে চাকরীটা জীইয়ে রাখার সুযোগ করে দেওয়া। কারণটা বলার জন্য আগেও চেষ্টা করেছি। সুযোগ হয়নি। আমার মিশনকে সার্থক করে তোলার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

তবে শুধু কৃতজ্ঞতায় তো কাজ হয় না। তাই রেডিও স্টেশন, টি.ভি. সেন্টার, রেকর্ড কোম্পানী ইত্যাদির মাধ্যমে সাসপেনসনের অপরাধটা কিছুটা লাঘব করেছি। আরো একটা কথা সারাজীবন ধরেই বলতে চেয়েছি। সেটা সেই সময় আমার পদমর্যাদায় একজন করণিককে বলা সম্ভব হয়নি। আর আজকে নিজের অবস্থান থেকে একজন আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্নাকে বলতে পারলাম না।

মুগ্ধবনত,
দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায়।

মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোর্সা অন্যমনস্ক হয়ে সেকথাই ভাবছিল। শুনেছে, দিব্যজ্যোতিও নাকি বিয়ে করেন নি। সব ঢেউ কুল পায় না, সব পাখীও হয়ত নীড় পায় না, নীড় পেলেও সবাই বোধ হয় পরিপূর্ণতা পায় না। তবুও তো ঢেউয়ের পাড়ের পানেই ছুটে চলা, দিন শেষে গোধুলির রঙ গায়ে মেখে পাখিরও নীড়ের খোঁজেই ধেয়ে যাওয়া...।

দি আইডিয়াল টিউটোরিয়াল হোম

শৈলেন সরকার

রেগে গেলে শান্তিদি এক একদিন ক্লাসশুদ্ধ সবাইকে দাঁড় করাতেন। আঙুল তুলে জানতে চাইতেন, কার কাছে, কার কাছে? অর্থাৎ বাড়িতে কোন স্যার বা দিদিমণি নাকি কোচিং? শান্তিদি নিজে প্রাইভেট পড়াতেন না কাউকে। আর যেন তাই-ই একেকজন বাড়ির মাস্টারমশাই বা কোচিং-এর স্যারের নাম ধরে ধরে বিদ্রুপ করতেন। খাতা খুলে ভুলগুলির উল্লেখ করে বলতেন, সুবোধবাবু? উনি তো প্রাইমারির টিচার, উনি আবার দশ ক্লাসের ইংরেজি কি পড়াবেন? ফনীবাবুর কথা উঠলে দাঁত চেপে চেপে বাড়ি থেকে বাবা বা মাকে ডেকে নিয়ে আসতে বলতেন। ওনার কথায় সংস্কৃতে এম. এ আবার অঙ্ক করাবে কী? আর রাধুদার কোচিং সেণ্টারের নাম শুনলে বিদ্রুপের বন্যাই বইত একেবারে। রাধুদার স্কুল কলেজের শিক্ষা, ওর কথা বলার ভঙ্গী বা কবে কার খাতায় রাধুদার লেখা ইংরেজি প্যারাগ্রাফ দেখে লাইনের পর লাইন কাটতে হয়েছিল ওকে বা ইতিহাসের ওপর ওর লেখা নোট নিয়ে টিচার্স রুমের হাসাহাসি—। মোট কথা, রাধুদার কোচিং সেণ্টারের মেয়েরা সম্ভব হলে লুকিয়েই রাখত নিজেদের।

রাধুদার কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার বছর আমার ক্লাস এইট। সেভেন থেকে এইটে উঠতে হল সেবার বেশ কষ্ট করেই। দু বিষয়ে ফেল। অর্থাৎ আন্ডার কনসিডারেশন। আমার রেজাল্টের জন্য সেবার আমার চেয়ে বাবাকেই গালমন্দ শুনতে হল বেশি। মায়ের কথায়, বিদ্যে তো ক্লাস এইটের— তা দিয়ে বড় জোর ফোর অব্দি চলতে পারে। আর বিশ বছর চায়ের দোকান চালিয়ে সে বিদ্যেও নাকি অবশিষ্ট থাকে না কারুর।

রাধুদার কোচিং ছিল পাশের পাড়ায়। নতুন পল্লী। স্কুলে যাওয়ার পথেই সাইনবোর্ড চোখে পড়ত সবার। 'দি আইডিয়াল টিউটোরিয়াল হোম'। পঞ্চম হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা। যোগাযোগ রাধেশ্যাম কর্মকার, প্লট নং ২৮, নতুন পল্লী।

বাবা আমার মাকে বিয়ে করেছিল জোর করে। সময়কালে লোকটার নাকি নাম ছিল খুব। সিনেমা হলে ব্ল্যাক করত টিকিটের। বনগাঁ না বারাসাতে ডাকাতির জন্য ধরাও পড়েছিল একবার। ঠিকই, এসব জানার কথা নয় আমার। জানতামও না। জানতে পারি মায়ের মুখ থেকে। একেক দিনের ঝগড়ায় যেন ইতিহাস বইয়ের এক একটা পৃষ্ঠা খুলে আসে রোজ। মায়ের পড়ার ইচ্ছে ছিল খুব, স্রেফ বাবার জন্যই—। আমার দাদু ছিলেন স্কুলমাস্টার। মামা কেমিস্ট্রির এম. এস.সি.—ওদের সবার নাকি মাকে নিয়ে আশা ছিল খুব। স্রেফ বাবার জন্যই। বাবার জন্যই নাকি মায়ের এই জীবন। এত হতাশা আর এত গ্লানি। বিয়ের আগে হাজার বড় বড় কথা বলে শেষমেশ চায়ের দোকান। মায়ের নাকি ঘেন্না করে, বাপের বাড়ি যাওয়া যে ছেড়েছেন তা নাকি বাবার জন্যই। যাবেন কোন মুখে।

সত্যি বলতে কি, এই কথাগুলি ওঠা মাত্রই—আমার সামনে এই একটিমাত্র প্রসঙ্গ উঠলেই বাবার যাবতীয় পৌরুষ যেন গুটিয়ে যেত কোথায়। 'আমার তো যা হওয়ার হয়েছে, এবার মেয়ের জীবনটাকে অন্তত—'।

বাবার কম বয়সের গল্প বা মায়ের দুর্দশার জন্য বাবার দায়িত্ব জানা থাকা সত্বেও লোকটার জন্য আমার কষ্ট হত খুব। সেই বাবাই একদিন কথা বলে এলো রাধুদার সঙ্গে। বাবার দোকানে রাধুদা চা খেতে আসে নাকি রোজ। বাবার কথায় আমার যে মাস্টার লাগবে সে কথা আগে বললেই তো হত। রাধুদা নাকি বহু বছর ধরেই খরিদ্দার বাবার দোকানের। আর টিচার হিসেবে রাধুদার নাম নাকি জানে অনেক দূরের লোকও, আর আসেও নাকি পড়তে।

সমরের সঙ্গে আমার আলাপ রাধুদার কোচিং-এই। ও তখন আমার মতোই ক্লাস এইটের। তখনই স্কুল পাল্টেছে দু'বার। মোটকথা ততদিনে বছর দুয়েক নষ্ট হয়ে গেছে ওর। এই সময়ই একদিন ভারী অদ্ভুত কথা বলল একটা। বলল, রাধুদা তোকে ভালবাসে জানিস? আমার তখন ক্লাস নাইন। সমরেরও ও বলল, তুই না এলে যেভাবে খোঁজ করে রাধুদা—।

রাধুদার ঘর ছিল তিনটে। রান্নাঘর বাদ দিলে একটা রাধুদার নিজের। অন্যটাতে ওর মা, দিদি, ভাই। দু'ঘরের মাঝখানে বাঁশের বেড়া ছিল একটা। এছাড়া টিনের দোচালা ছাউনি, নীচে সিলিং। এদিক ওদিক থেকে উড়ে আসা দুটো-একটা কাক হঠাৎ করে টিনের চালে পা দিলেই শব্দ হত খুব। খস-খস-খস। কাকগুলি যেন এক একদিন পা হড়কাবে। যেন গড়িয়ে পড়তে পড়তে সামলে নেবে নিজেদের।

রাধুদার দিদিকে নিয়ে পাড়ায় গল্প ছিল অনেক। বড়রা নাকি ওকে দেখে অনেকেই। কলতলায় গল্প করত পাড়ার মাসিমা, কাকিমা বা মায়েরা। রাধুদার মাকে গালি দিতে খুব। 'ইয়ে' করি অমন পয়সায়। শহরের কোন সিনেমা হলের নীচে নাকি ওকে দেখে অনেকেই। এছাড়া অফিস পাড়ায়, গঙ্গার ঘাট। আর শেয়ালদা স্টেশনে অকারণ একা একা কেন দাঁড়িয়ে থাকবে মেয়েটা? এরকম হাজার গল্প এর ওর মুখ হয়ে আমার কাছে পৌঁছে গেছে সেই কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার আগেই। কোচিং-এ ভর্তি হয়ে রাধুদার সেই দিদি—বীথিদিকে খুব কাছ থেকে সুযোগ পেলাম দেখার। সেভেন-এইটের বয়সে একটা মেয়ে হিসেবে সদ্য জন্ম হচ্ছে আমার। নতুন মন, নতুন শরীর। হ্যাঁ, শরীরও। চারপাশের পুরুষ চোখ। ক্লাসের অনীতা একদিন অদ্ভুত এক ছবি দেখালো আমাকে। অদ্ভুত এক নারী আর তার শরীর। এক পুরুষ শরীরের ছোঁয়ায় নগ্ন সেই নারী কেমন রঙ পাল্টায়। 'হয় কখনও—, এমন—'। আমার গলা শুকিয়ে আসছিল তখন। সেই নারী—, সেই মেয়ে শরীর—আর সেই পুরুষ, পুরুষের চোখ। আমার সেই অর্ধেক করা প্রশ্নের উত্তরে অনীতা বলে উঠেছিল, কেন, বীথিদি—?

হালকা নীলের এক শাড়ি পড়া বীথিদির কথা মনে পড়ে এখনও। নীলের ওপর চৌকোনা ডিজাইনের কথা। আঁচলের নকশা। চুলের কায়দা জানত বীথিদি। কখনও টপনট্, কখনও পনিটেল, কখনও বা এমনি—যেন পাড়ার আর পাঁচটা মেয়ের মতো কাজ করতে যাচ্ছে কোনো প্লাস্টিক কারখানায়। যেন হাতে থাকছে টিফিন বাটি। কোনও কারণে বীথিদির কথা উঠলে মা বলত, লজ্জাও

করে না রাধুর মায়ের। একটু ভয়ের চোখেই দেখতাম বীথিদিকে। এমনকী রাধুদার কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার আগে কোনোদিন কাছাকাছি দাঁড়িয়েছি কি না সন্দেহ। দূর থেকে দেখার ক্ষেত্রে ওর চোখ চোখ পড়ার সম্ভাবনা হওয়া মাত্র বুক কেঁপে উঠত যেন সবারই। ক্লাসের অনীতার দেখানো ছবির সঙ্গে বীথিদিকে মিলিয়ে দেখার ইচ্ছে হত খুব। ওর শরীর থেকে হালকা নীলের সেই নকশাদার শাড়িটাকে শরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে—আমার, হ্যাঁ আমারও ভয় করত একসময়। শিরশির করে উঠত গা। হতে পারে? হতে পারে এসব? এমনকী আমিও—? আমার ভয় দেখে 'ঢঙ' বলে ভাবতো অনীতা, বলত, ন্যকা—।

এই এতদিন পর রাধুদার কথা আলাদা করে মনে করতে গেলে ওর চোখদুটিই শুধু ভাসবে। যেন অনেক প্রশ্ন থাকত কোথাও। কেমন মাদকতাও। স্কুলের শান্তিদি যতই বলুক, পড়ানোটা যেন নেশাই ছিল রাধুদার। বেশি পড়তে চাইলে খুব খুশিও হতো লোকটা। কখনও বই কিনে আনত নিজের পয়সায়, বলত শুধু টেক্সট পড়ে বড় হওয়া যায় নাকি? কেমন এক বিষণ্ণতা মাখা হাসি ছিল রাধুদার। যেন লোকটার কাউকে বলার ছিল না কিছুই। এমনকী কোনও মেয়ে ওর বিরুদ্ধে বা অন্য কোনও দিদিমণির বলা বাজে কথাগুলি প্রসঙ্গ তুললেও কোনও উত্তর দিত না রাধুদা। বড়জোর বলত, তাই?

রাধুদার সঙ্গে প্রথম আলাপে নাম জিজ্ঞেস করেছিল লোকটা। সাধারণ গলাতেই। এমনকী এই কোচিং-এ আমার পড়ার ব্যাপারটাতে ওর যেন খুব একটা আগ্রহ ছিল না। আমার ক্লাস আর সেকশন জানতে চাইলেন সেদিন। স্কুলের নাম নিশ্চিত বাবার কাছ থেকে শুনে রেখেছেন আগে। আর রাধুদার সেই কোচিং-এর মেয়েরা বেশিরভাগ তো এমনিতে ভুবনেশ্বরীর। আমাদের ভুবনেশ্বরী গার্লস-এর। স্কুলের শান্তিদি বা আভাদির মতোই বই না খুলে পড়াতে পারতেন রাধুদা। ভৌত-বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান বা বাংলা। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ বা মধ্য ভারতের মালভূমি। যে কোনও প্রশ্নের উত্তরে ওর ওই এক কথা, খাতা খোল, মুখস্থ করে নিয়ে আসবি কাল। 'ধরব কিন্তু—', বলে সেই ভয় দেখানোও। আর এই পড়া না পারার জন্য সমর একদিন মার খেল খুব। মাধ্যমিকের প্রি-টেস্ট হয়ে গেছে তখন। ওর চুলের মুঠি ধরে রাধুদা সেদিন আমার সামনেই—, ঘর আর বারান্দা নিয়ে আমরা সবাই ছেলে মেয়ে মিলিয়ে অন্তত জনা পনের—কারুর মুখ দিয়েই তখন আর শব্দ ছিল না কোনও। ওরকম চুপচাপ থাকা একটা লোক এত চট করে কীভাবে যে রেগে উঠতে পারে সেটা বুঝেই উঠতে পারিনি ভালো করে। দিন তিন-চার পর সমরই যুক্তি দেখিয়েছিল একটা। বলেছিল, বলিনি, লোকটা ভালবাসে তোকে—।

আমাদের দিনগুলি এখন মোটামুটি চলে যাচ্ছে বলা যেতে পারে। ফ্লাইওভারের নীচে সমর দোকান ঘর পেয়েছে একটা। পার্টির লোকজনকে ধরেই। ও পার্টি করছে সেই স্কুলের দিনগুলি থেকে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত আর দেওয়া হয়নি ওর। ওর কথায়, একজন পাশ হলেই হবে। অর্থাৎ আমি। স্কুলের দিনগুলিতে ওর পার্টির কথা আমাকে তেমন করে বোঝাতে চেষ্টা না করলেও কলেজের দিনগুলিতে চেষ্টা করত বোঝাবার। খোঁজখবর নিত কলেজ ইউনিয়নের। আমাদের তখনকার

ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট টুনুদা ওর খুবই কাছের লোক ছিল একেবারে। রাজনীতি করতে গিয়ে ও শিখেছিল অনেক কিছু। কীভাবে কাছে টানতে হয়, কীভাবে বোঝাতে হবে মানুষকে। এছাড়া নানান সমস্যা। ভালো মানুষ, খারাপ মানুষ। ওর কথায়, চোখ চাই মানুষ চেনার। আর এরকম কোনও প্রসঙ্গেই ও রাধুদাকে নিয়ে আসত ঠিক। বলত, চোখ না থাকলে ও নাকি চিনতে পারতো না রাধুদাকে। ওরকম বাজে একটা লোককে—। রাধুদার প্রসঙ্গ উঠলেই ও ঝাল মেটাতে চাইত মনের। আর তাকিয়ে দেখত আমাকে। সমর্থন চাইত। এমনকী সেই কোচিং থেকে বাইরে বেরিয়েও ও কিন্তু ভুলতে পারেনি লোকটাকে। ওর কথায়, আলুবাজ একেবারে। আমাকে যে ভালাবাসত রাধুদা এতে নাকি কোনও সন্দেহই নেই সমরের। ওর কথায়, তোর মতো এইটুকু একটা মেয়েকে—

মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার পরপর স্রেফ সমরের কথাতে সেবার ছেড়ে দিতে হল কোচিং-টা। বলা যায় এই সমরের জন্যই মাধ্যমিকের ফার্স্ট ডিভিসনটা মিস করলাম সেবারে। ওকে অবশ্য বলা যাবে না সে কথা। বলিওনি কোনোদিন। রেজাল্ট খারাপ প্রসঙ্গে দোষ দিয়েছি ভাগ্যের। রিভিউ-এর ফর্ম ফিল-আপ করেছি দিদিমণিদের কথামতো। আর শেষ পর্যন্ত যা হওয়ার—। ওর ধারণায় উল্টোটাই। রাধুদার কোচিং-এ থাকলে নাকি ফেল প্রায় অবধারিত ছিল আমার। লোকটা নাকি বিরক্ত করেই মারত আমাকে। পড়ানোর নাম করে বাড়ি চলে আসত রোজই। উত্তর লেখানোর নাম করে সারাটা সকাল বা দুপুর হয়ত কোচিং-এই আটকে রাখত। সমরের কথায়, কোনোকিছুই বুঝতে বাকি ছিল না ওর।

কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার বছরই—এইটের হাফ ইয়ার্লির পরপর, একদিন বাড়ি গিয়ে হাজির রাধুদা। আমাদের বাড়ি যাওয়ার সেটাই ওর প্রথম দিন। ডাক নাম ধরেই ডেকে উঠেছিল লোকটা। 'মনি-এই মনি—'। কোচিং-এ বা স্কুলে ছিল আমার ভালো নামই। 'তিতলী'। এমনকী সমরের মুখেও এই 'তিতলী'। আমার পড়াশুনার ব্যাপারে খোঁজ খবর করতেই নাকি সেদিন ওর আসা। মায়ের মুখে আমাকে নিয়ে হাজার অভিযোগ শুনল লোকটা। দিনরাতের টিভি দেখার কথা। সিনেমা আর গানের কথা। আমার পড়ার টেবিলের সামনেই বসতে দেওয়া হয়েছিল লোকটাকে। কাঠের চেয়ার। এরপর টেবিলের ওপর মায়ের দিয়ে যাওয়া চা, বিস্কুট, মিষ্টি। আমার সেই পড়ার টেবিলের সেদিন খুবই প্রশংসা করল লোকটা। আমাদের বাড়ি আসার আগেই উনি নাকি ভাবতে পেরেছিলেন ছবিটা। পড়ার ঘর, চেয়ার, টেবিল। এমনকী দেওয়ালে যে রবীন্দ্রনাথের ছবি থাকবে একটা সেটাও নাকি আগে থেকে জানা ছিল ওর। সেই প্রথম দিনই চলে যাবার আগে আমাকে একেবারে আকাশে তুলে দিলো রাধুদা। আমি নাকি আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতো নই কোনোভাবেই। আমার সাহস, এইটুকু বয়সে আমার ব্যক্তিত্ব, আমার বুদ্ধি আর তর্কে না হারার মানসিকতা। এমনকী জিজ্ঞেস করে বসল আমাকে, পারবি না বড় হতে? সবচেয়ে উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবি না তুই?

লোকটাকে নিয়ে খুবই ভয় সমরের মনে। সেই এইটের গোড়া থেকেই। বারবার জানিয়ে রেখেছে, আমি নাকি সেই প্রথম দেখার দিন থেকেই ওর মনে মনে। অন্য সবার চেয়ে আমাকে রাধুদার একটু বেশি বেশি ডাকাডাকি করা, অঙ্কে ভুল হলে অতিরিক্ত সময় নিয়ে দেখানো—এ সব কিছুই

ওর কাছে তখন বাড়াবাড়ি ঠেকছে খুব। এমনকী রাধুদার কাছাকাছি আমাকে বসতে দেখলেও নাকি রাগ উঠছে তখন। ওর নাকি মনো হতো গন্ধ শুঁকছে লোকটা। শরীরের গন্ধ। ঘ্রাণ। আমার। ও নাকি দেখেছে নিজের চোখে।

রাধুদার কোচিং-এ আমার ভর্তি হওয়ার বছর দুয়েকের মাথায় একদিন হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল পাড়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটা। বীথিদি। কোনোরকম রাখঢাক না করে, নিজেকে একেবারে খুলে দিয়েই গলায় দড়ি দিল মেয়েটা। শীতের কোনও এক সকালই তো। কোচিং-এর জন্য রাস্তায় বেরিয়েই শুনি, সুইসাইড করেছে বীথিদি। আমার পাশে তখন অনীতাও। অদ্ভুত শরীরের সেই বীথিদি আমার শরীরে কেমন এক ভয় তুললেই ওকে দেখার এক ইচ্ছেও জেগে উঠেছিৎ কেমন। অনীতাই বলল, পড়ার শাড়ি দিয়েই—ফিসফিস করে জানিয়েছিল, ঘটনা আছে অনেক। ও নাকি বলবে পরে। বলা যেতে পারে অনীতার সেইসব না-বলা ঘটনাগুলিও যেন টানলো আমাকে। কী হতে পারে, কেমন হতে পারে সেই সব গল্পগুলি?

স্কুলের কয়েকজন দিদিমণি ছাড়া কেউই রাধুদার তেমন বিরুদ্ধে ছিল না কোনোদিন। এমনকী নতুন পল্লীর কালু বা রতনের মতো ছেলেরাও সিগারেট লুকাতো ওকে দেখলে। বীথিদিকে নিয়ে যে যাই বলুক, বাড়ির বা পাড়ার বড়দের কাউকে রাধুদাকে নিয়ে বাজে কথা বলতে শুনিনি কোনোদিন। এমনকী বীথিদি প্রসঙ্গে ওর নাম উঠলেও শেষ পর্যন্ত সহানুভূতিই পেয়ে যেত লোকটা। বড়দের কথায়, কী করবে রাধু? এতো বড় মেয়েকে চোখে চোখে রাখতে পারে কেউ? এত বড় একটা সংসার একাই তো টানছে ছেলেটা। বরং রাধুদার ভাইকেই পাড়ায় সহ্য করতে পারত না কেউ। ওদের কথায় এইসব অপদার্থ ভাই-বোনের পেছনে কেন সর্বস্ব ঢাললো রাধু? সবার কথায় এদের পেছনে পয়সা নষ্ট না করে বরং মাকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেই ভালো করত ছেলেটা। বিয়ে করত। সংসার হত রাধুর। একটা পরিবার। হিল্লেও হত একটা মেয়ের। রাধুদার জন্য ওর মা-ভাই-বোনকে পাড়ার লোকের গালি শুনতে হত অনেক। ওদের কথায়, দুই অপদার্থ ভাই-বোনের জন্য নিজের জীবন কেন নষ্ট করবে ছেলেটি?

কোচিং ছাড়ার পর রাধুদার সঙ্গে কখনও রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। হয়ত ফিরছি কোথাও থেকে, বা স্টেশন রোডে কিনতে গিয়েছি কিছু। লোকটা একবার শুধু তাকিয়ে দেখত আমাকে। একবার শুধু চোখে চোখ। এর পরপরই একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া। যেন চেনেই না আমাকে। যেন দেখাই হয়নি আগে কোনোদিন। বাবার মুখে এক একদিন শুনতাম লোকটা নাকি খোঁজ নিয়েছে আমার। জানতে চেয়েছে, কতক্ষণ পড়ছি। রাত্ত জাগছি কি না। বাবার কথায়, ওর কোচিং না ছাড়লেই পারতিস। বাবার কাছে এমনকী মায়ের কাছেও কোচিং ছাড়ার যুক্তি ছিল না কোনও। ওদের কথায়, ফাইনাল পরীক্ষার আগে আগে এমন করে কেউ? সমরের কথা ওদের কাউকেই অবশ্য বলা যায়নি। বলা যায়নি এই একজনের মর্জিতেই—স্রেফ অকারণেই—। বলতে হয়েছিল টাকা বাঁচানোর কথাই। টেস্ট পরীক্ষার পর কোচিং-এ আর কী-ই বা করার। তখন তো নিজের পড়া—।

মা যদিও ভেবে ছিল অন্য কিছু আর জানতেও চেয়েছিল বারবার, হয়েছে কিছু? অর্থাৎ কোনও ঘটনা? যা ঘটে থাকে পুরুষের কোনও নারীর। যেমন—। যেন রাধুদার বিরুদ্ধেই তখন বলব কিছু আমি। মা যেন আমার কোনও গোপনীয়তাকে স্পর্শ করবে। আর যেন নিজের মনেই সেই গোপনীয়তাকে স্পর্শ করে আমার বিবেচনাবোধকে প্রশংসা দেবে এক সময়। আমার হয়ে সাফাই গাইবে বাবার কাছে। অর্থাৎ তিতলী ভুল করতে পারে না কোন?।

সমর ইদানীং ড্রিংক করছে। কচিৎ কখনওই অবশ্য। বকাবকি করলে থম ধরে বসে থাকবে কিছুক্ষণ। এরপর দরজা বন্ধ করে 'আর হবে না' বলা, ক্ষমা চাওয়া। ছোটবেলা থেকে বাবাকে দেখে আমি জানি, এই-ই শুরু সবে। মায়ের কথা মনে পড়ে। সেই সব কান্না, হাহাকার। আমাকে মানুষ করার কথা ভুলে বাবাকে বোঝানোর সেই সব চেষ্টা।

পড়াশুনো নষ্ট হওয়ার জন্য একেক সময় ওকে গালাগাল করার ইচ্ছে হয় খুব। অনার্সটা কমপ্লিট করতে পারলে একটা কাজ কি জুটতো না? সরকারী না হলেও অন্তত কোনও প্রাইভেট স্কুলের মাস্টারি? মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করে খুব। একেকদিন সমর ঘুমিয়ে পড়লে উঠে বসি। মশারির ভেতর থেকেই তাকাই জানালা দিয়ে। বাইরে আকাশ থেকে নেমে আসা আলো। কখনও বা জ্যোৎস্নার হলুদ। একেকদিন শিউরে উঠি কেমন জানালার বাইরে তাকাতে ভয় হয় খুব। আধা আলো আধা অন্ধকারের বারান্দায় যেন কোনও শরীর। যেন হাজার প্রশ্ন ভরা দুটো চোখ। সেই জেগে ওঠা হাসি। সেই বিষণ্ণতা। যেন একবার কেউ দেখবে আমাকে। যেন একবার মাত্র চোখ তুলেই নামিয়ে রাখবে ফের।

বীথিদির মৃত্যুর দিন অনীতাকে সঙ্গে করে যখন ঢুকতে যাব সেই ঘরে, রান্নার সেই ঘর—যেখানে বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া উনুন, তারের জালওয়ালা ছোট আলমারি, যেখানে বাঁশের বেড়ায় উনুনের সেই ধোঁয়া—ধোঁয়ার ছাপ। হঠাৎ করেই শুনি ডাকছে রাধুদা। 'মনি-'। ফিরে তাকাতেই দেখি দাঁড়িয়ে লোকটা। কখন যেন পার হয়ে এসেছি ওকে। আমাদের সেই কোচিং-এর ঘরের পাশেই পাড়ার দু-একজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাধুদা। যেন অপরাধবোধই কোনও। অনীতা তখন ঢুকে গেছে সেই ঘরে। যেখানে একটা শরীর হয়ে বীথিদি ঝুলছে রাধুদা—? লোকটা চোখ চোখ রাখল একবার। এরপর ফের সেই চোখ সরানো। যেন না করছেন আমাকে। যেন মৃত্যুর কোনও গন্ধ লোকটা শুঁকতে দেবে না আমাকে। আর আমারও সেই দাঁড়িয়ে পড়া। হঠাৎ-ই এরপর অনীতার ফিরে আসা। ঘরের বিবরণ শোনা ওর কাছে। সমর বলছিল, এত ভয়ই যখন, গেলে কেন? সমরের ব্যস্ততা ছিল দিনভর। লাশ আনতে মর্গে যাওয়া। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। দূর থেকে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখা সব কিছু। সবকিছুই। ওর কথায়, বীথিদির শরীরের কোনও আড়ালই নেই তখন। মর্গে নাকি সবাই উদোমই একেবারে। পুঁজ আর রক্তে পিচ্ছিল সেই মেঝে গড়িয়ে একেকটা শরীরকে ডোমের সেই হিঁচড়ে আনা।

কলেজে গিয়ে ইংরেজি নিয়ে পড়ার কথা ঢুকিয়েছিল রাধুদাই। সেই টেন-এ পড়ার দিনগুলিতেই।

কোচিং ছাড়ব ছাড়ব করছি তখন। বৃষ্টির কোনও একটা দিনে এই লোকটাই ইংরেজির কথা তুলল হঠাৎ করে। বলল, বিজ্ঞান নয়, আর্টস নিয়েই পড়িস তুই। ওর কথায়, লিটারেচার। সাহিত্য। কবিতা আবৃত্তি করছিল লোকটি। ঠিক আবৃত্তিও নয়। যেন নিজের মনেই বলা। জীবনানন্দের কবিতার কয়েকটি লাইন। মনে পড়ে এখনও, এত বছর পরেও। 'যারা অন্ধ সবেচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা,/যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই—প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই/পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হওয়া জলকণার মতোই। যেন আমার অগোচরেই এলোমেলো হাওয়া কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে সব শব্দ, ধ্বনি বাক্য। সেই সব ছবি। সেই সব হৃদয়, কান্না, রক্ত।

লোকটার সঙ্গে কাল দেখা হল স্টেশনে। মাথার প্রায় পুরোটাই সাদা। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছিল লোকটা। কোথাও যাবে যেন। যেন টিকিট কেটেই ওভারব্রিজে উঠবে। এরপর অন্য একটা প্ল্যাটফর্ম। অপেক্ষা করা। পাশে মেয়েদের লাইনে দাঁড়িয়ে আমি চমকে উঠলাম হঠাৎ। কেন কে জানে? আমার কোলে তখন রুম্পা—। আমার মেয়ে। কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে। আর একটু হলেই নাম ধরে ডেকে উঠতাম হয়ত। পেছনের মহিলা আমাকে ঠেলে তখন বলে উঠছেন, কী হল? খুব ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটা দাঁড়াক একটু। বা, 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা,/যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই-প্রীতি নেই- করুণার আলোড়ন নেই—'।

কয়েকটা মুহূর্তেই মাত্র। আমার সেই চমকে ওঠা। তাকিয়ে দেখা একবার। চোখে চোখ রাখা। লোকটা মুহূর্তের জন্য থেমে গেল যেন একটু। যেন আধা আলো আর আধা অন্ধকার। কিছু অস্পষ্টতা। এরপর সেই চোখ সরানো। সেই হাঁটতে থাকা। এরপর হয়ত ওভারব্রিজ। প্ল্যাটফর্ম পাল্টানো।

কোচিং-এর দিনগুলি আমি এখনো ভুলতে পারছি না কেন রাধুদা?

নিরাপত্তা বলয়

শুচিস্মিতা সেন চৌধুরী

অংক কষলেন ভদ্রলোক। ছক। বৃত্তের ভেতর আয়তক্ষেত্র। অনেকটা চাকার মতন। এরপর ফাঁকা ঘর ভর্তি হয় শব্দে। এক একটা গ্রহ, নক্ষত্রের নাম। এসবই নাকি দাঁড়িয়ে একটা তথ্যের ওপর। জন্ম তারিখ আর জন্ম সময়। এরপর গ্রহের স্থান। হয়ত শুক্রের ঘরে শনি কিংবা বৃহস্পতি। এতসব কী করে বোঝে কে জানে? নাকি আন্দাজেই!

একরকম টানাপোড়েনের মধ্যেই আজ এখানে আসা জয়িতার। প্রলয় জানে না। ও জানতে পারলে রাগ করবে ঠিক। ওর কথায় এসব ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। কয়েকটা দুর্বল মানুষকে আরও দুর্বল করে দেওয়া। প্রলয়ের কথা এক এক সময় সত্যি বলে মনে হয় জয়িতার। কখনও বা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে সব। অর্থাৎ কোনও পাথর কিংবা শেকড়ে। আসলে কিছু কথা যখন মিলে যায় অবিশ্বাস করার জায়গা থাকে না কোনও। প্রলয়ের কথায় অবশ্য ওটা যে কেউ পারে। এমনকী প্রলয়ও। মাথা খাটাতে হবে একটু। সাইকোলজিটা বুঝতে হবে মানুষের । একটা গ্রহ বা নক্ষত্র কীভাবে পরিচালনা করবে জীবন? সম্ভব কখনও? না, এ তর্কের শেষ নেই কোনও। তাই এক সময় থামতে হবে যে কোনও একজনকে।

এ জায়্যগার ঠিকানাটা মৌমিতার কাছে পাওয়া। ও প্রায়ই আসে এখানে। আর মেলেও নাকি সব। এই ভদ্রলোকের দেওয়া আংটি পড়েই তো সব ঠিক আছে এখনও। জয়িতার শুনতে ভাল লাগে। জানতেও। কিন্তু ওইভাবে আংটি পড়া পছন্দ নয় একদম। জয়িতাকে অবশ্য অনেক ভাল কথাই বললেন ভদ্রলোক। বৃহস্পতি নাকি গার্ড করছে ওকে। মানে, বাঁচিয়ে দিচ্ছে সব বিপদ থেকে। এরপর সংসারের কথা তুললেন। প্রলয়ের কথা। জয়িতার প্রতি ওর বিশ্বাসের কতা। ওর নাকি ব্যবসা ভাগ্যও ভাল। টাকা পয়সার অভাব নেই কোনও। কিন্তু—। সবেতেই কিন্তু থাকবে একটা। অর্থাৎ প্রতিকার। স্টোন নাও এবার। মানে, হাজার হাজার টাকার ধাক্কা। ছেলেবেলায় ছিল কী একটা— মায়ের দেওয়া। একরকম জোর করেই। সেজন্যই নাকি মাধ্যমিকে দারুণ রেজাল্ট । আর যখন খুলে ফেলল জেদ করে, ঠিক উচ্চমাধ্যমিকের আগে , তখনই বলেছিল মা, "দেখে নিস কী ক্ষতি হয়?" হলও তাই। উচ্চমাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন। জয়িতা অবশ্য জানত যে রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কারণ নিজের গাফিলতি, পাথর নয়। ফাঁকিবাজীরও শেষ আছে একটা। জয়িতার তখন উড়ে বেড়ানোর সখ। এ বন্ধু, সে বন্ধু, সিনেমা আড্ডা—।

ভদ্রলোক হাত দেখতে চাইলেন, জয়িতার। অর্থাৎ ছকে মিলছে না সব বা পাওয়া যাচ্ছে না বললেও চলে। সেই কিন্তু উত্তর খঁজছেন ভদ্রলোক। ওনার কথায় খারাপ সময় আসছে এবার। এ সময় নাকি শেষ করে দেয় মানুষকে। সব হারাবে তুমি। মান, সম্মান— সব। যে কাজে হাত দেবে তাতেই অসফলতা। এমনকী প্রলয়েরও নাকি খারাপ হতে পারে কোনও। চরম বিপদ বা অশান্তি। কী

হতে পারে? কী?

--- যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

সত্যিই কল্পনা করতে পরে না জয়িতা। কত খারাপ সময়ই তো গেছে একসময়। উচ্চমাধ্যমিকে রেজাল্টের পর কি ছোটাছুটিই না করতে হয়েছে ওকে। তারপর কলেজে ভর্তি হয়েও ঝামেলা। রাজনীতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে ওঠে। কলেজে যাওয়া আসার পথে তখন ভয় দেখানো হত ওকে। শেষ পর্যন্ত কলেজ যাওয়া বন্ধই হয় কয়েকদিনের জন্য। সামনে ইলেকশন। বোম পড়ছে অনবরত। মারপিট তো লেগেই আছে সবসময়। পড়ে অবশ্য ঠিক হয়ে যায় সব। ভদ্রলোকের কথায়, "এসব তো কিছুই নয়। একবছর দু-বছর নয়, সাত বছর সমস্যার মধ্যে থাকতে হবে।" সুতরাং প্রতিকার। চার রতি নীলা, সাত রতি মুক্তো, মন্ত্র, নীল জামা, নীল চাদর, ইত্যাদি। জামা-কাপড় পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু ওসব পাথর-টাথর পড়া যাবে না কিছুতে।

ভদ্রলোক বিখ্যাত। খবরের কাগজেও নাকি নাম থাকে ওনার। ঘরের বাইরে লোকের ভিড় তারই প্রমাণ। প্রকৃতই পণ্ডিত নাকি তিনি। যা বলবেন মিলে যাবে ঠিক। এজন্যই বারণ করে প্রলয়। সত্যিই দুর্বল করে দেয় মানুষকে। বাড়ি ফেরার পথে একই কথা বারবার মনে হচ্ছিল জয়িতার। কী এমন হতে পারে? আর যদি প্রলয়ের কিছু হয়? তবু বলা যাবে না ওকে। একটু সাবধানে থাকলেই —। অর্থাৎ নীলের নিরাপত্তা বলয়ে। ঘরের পর্দা নীল। ওর নীল শাড়ি আছে অনেক। তারপরও যদি কিছু হয় তাহলে? পাথর নেওযা মানে তো অনেক টাকা। মা'কে কী বলবে একবার? বাস থেকে নেমে আজ আর রিক্সা ধরে না জয়িতা। কিছুটা অন্য মনস্কতার জন্যই। তাছাড়া হেঁটে গেলে ভাবার সময় পাওয়া যাবে অনেক। তাই করে জয়িতা। আর যাই হোক প্রলয়ের কিছু হলে অনুতাপের শেষ থাকবে না কোনও।

প্রলয় রাত করে বাড়ি ফেরে। এরপর এত ক্লান্ত হযে পড়ে যে বলা যায় না কিছু। এরকম হামেশাই হয়। জয়িতা কিছু জানতে চাইলেও কাজের কথা তোলে। প্রচুর চাপ। এমনকী রবিবারও। সারাটাদিন বাড়িতে তো একাই একদম। জয়িতার তাই চিন্তা হয় খুব। এক একসময় জ্যোতিষির কথা মনে পড়ে। হয়ত সবই ঠিক। ওনার কথা অনুযায়ী খারাপ সময়। প্রতিকার চাইলেও তো টাকা লাগবে অনেক। ওই নীলা বা মুক্তোর জন্য। সেটা পাবে কোথায়? এসব কারণেই চাকরি করা দরকার। অন্তত নিজের প্রয়োজনে—। ওর কথায় যতদিন পারবে একাই করবে সব। প্রলয় ভবিষ্যতের কথা তোলে। অর্থাৎ যখন ওদের মধ্যে আসবে কেউ। মা ছাড়া চলবে তার? যাদের মা বাবা দু'জনই চাকরি করে তাদের ছেলেমেয়েরা নাকি তৈরিই হয় না ঠিকমতো। ওর এসব কথার সামনে যুক্তিই দাঁড় করাতে দেবে না কোনও। এখন টের পায় জয়িতা চাকরির কী প্রয়োজন।

জ্যোতিষির কথায় অবশ্য কিছু না হওয়াই ভাল এখন। অর্থাৎ সন্তান। এই সাত বছর যাক। কে জানে কেন, সমসময় ভয় কাজ করছে একটা। কোনও কাজ করার আগে দশবার ভাবে জয়িতা। তবু কোথায় যেন ফাঁক তৈরি হচ্ছে একটা। মৌমিতার কথায় প্রলয়কে বলা উচিৎ সব। তারপর প্রতিকার। অর্থাৎ নীল শাড়ি, চাদর বা নীল ঘর। নীল হার বা চুড়িও চলবে। তাই প্রলয়কে না জানিয়েই সব

কিনতে শুরু করে জয়িতা। ঘরের পরিবর্তন হচ্ছে একে একে। সব কিছুতে নীলের প্রলেপ পড়ছে যেন। প্রলয়ের হয়ত চোখ পড়েনি এসবে।

ইদানীং একটু এড়িয়ে চলছে জয়িতা। এমনকী প্রলয় অফিস থেকে ফেরার পরও বেশিক্ষণ থাকে না একসঙ্গে। ঘুম থেকে উঠেই স্নানে যেতে হয় জয়িতাকে। তারপর পুজো। মানে মন্ত্রপড়া। দশবার। এক এক সময় কম বেশিও হয়ে যায়। তখন প্রলয়ের অফিস যাওয়ার তাড়া। সময় যে কোথা দিয়ে বয়ে যায়! রাতেও এক ঘটনা। সেই কাজ। কিংবা কাজের ভান। এ ঘটনা এখন রুটিন একরকম।

অনেকদিন পর তাড়াতাড়ি ফিরছে প্রলয়। স্নান সেরে কাগজ নিয়ে বসে। সকালে হয়ত পড়া হয়নি ওর। জয়িতা রান্না সেরে খাওয়ার ব্যবস্থা করে। সময়ের আগেই। প্রলয়ের নাকি ট্রান্সফারের কথা চলছে। এক বছরের জন্য। কোথায় পাঠাবে তার ঠিক নেই কোনও। খাওয়ার টেবিলে বসে এ নিয়েই কথা হচ্ছিল ওদের। টিভিটা চলছে সামনে। হাত পা নাড়তে থাকে কয়েকটা ছবি। প্রলয় টিভি দেখে না সচরাচর। খাওয়া শেষ করে প্রলয় শোবার ঘরে চলে যায়। জয়িতা ঘর গোছাতে থাকে। এক একবার চোখ চলে যায় টিভির দিকে। সোফার কভারটা পালটাতে পারলে ভাল হত। এরপর জনালা বন্ধ করা শুরু হয় ওর। পরপর তিনটি। এটা ড্রয়িংরুম। পর্দার আড়ালে ডাইনিংরুমে আরও একটি জানালা। পর্দা টানার শব্দ হয়। প্রলয় হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। টিভিটা বন্ধ করে শোবার ঘরে যায় জয়িতা। ও অবাক হয়েছে খুব। প্রলয় এখনও জেগে। পড়ছে কিছু একটা।

— এখনও ঘুমোওনি?

জানতে চায় জয়িতা।

— না জয়ি, তোমার সঙ্গে কথা আছে কিছু।

আঁতকে ওঠে জয়িতা। বকুনি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবার। তবে কী জেনেই গেল সব? আর ওই ছক? যদি হাত পরে প্রলয়ের! বৃত্তের ভেতর আয়তক্ষেত্র। সেই গ্রহ-নক্ষত্রের নাম। জয়িতা অবশ্য আলমারিতেই রেখেছে সব। নিজের তাকে। শাড়ি ভাঁজে। প্রলয় খুঁজে পাবে না। আর পেয়ে গেলে খুলেই বলতে হবে সব।

শাড়ি পালটে নাইটি পড়ে জয়িতা। এটাও নীল। নতুন একদম। রাতে শোবার আগে মন্ত্র ছিল। আজ বলা হল না। প্রলয় সিগারেট ধরিয়েছে একটা। সামনে বসে ময়শ্চারাইজার মাখছে মুখে। প্রলয় ধৈর্য হারাচ্ছে ক্রমশ।

— তাড়াতাড়ি কর। ঘুম পাচ্ছে আমার।

এরপর উঠতে হয় জয়িতাকে। বিছানার ঠিক পাশেই রাখা অ্যাসট্রেতে সিগারেটটা চেপে ধরে প্রলয়। ওটা বাইরে রেখে মশারি টানায় জয়িতা। একে একে চারকোনা! কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জানতে চায় প্রলয়।

— কী হয়েছে তোমার?

— কই, কিছু না তো।

— কিছু না মানে? মুখ শুকিয়ে গেছে একদম। সারাদিন এত কাজ কিসের তোমার? আজকাল কথাই তো বল না আমার সঙ্গে। অবশ্য দোষ আমারই। এত কাজের চাপ যে—।

— না, না, তোমার দোষ নেই কোনও। কাজ তো করতেই হবে। আর তুমি এত ক্লান্ত হয়ে ফেরো যে আমার কথা বলার সাহস হয় না। বা ভালও লাগে না। তোমার বিশ্রামের দরকার।

কিছুক্ষণ ওদের কথা হয় না কোনও। এখন অনেক কাছে ওরা। একটা শরীর যেন মিশে যেতে থাকে আর একটি শরীরে। ওর আঙুল তখন স্পর্শ করে জয়িতার চোখ, নাক, ঠোঁট—। ঘরময় ছড়িয়ে থাকা আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে না কিছুই। এরকম একটা মুহূর্তে যেন বলা যায় সব। জয়িতা চেপে রাখতে পারে না আর। জ্যোতিষির কথা তোলে ও । সেই বৃত্ত আর ছক। সমস্যা আর সম্ভাবনার কথা। সময়ের সেই জটিলতা। তারপর প্রতিকার। নীলের সেই নিরাপত্তা। মন্ত্রের কথা অবশ্য বলা হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত। আধো ঘুম আধো জেগে থাকার মধ্যেও রেগে ওঠে প্রলয়। ওর হাতের চলাফেরা থেমে যায় হঠাৎই। — ফালতু, সব ফালতু। ঘুমোও এখন।

এরপর আর কিছু বলার সাহস পায়নি জয়িতা। শুধু শুধু বলতে গেল এসব। বেশ তো চলছিল সব। এমনকী চাদর বা নাইটির নীল যখন চোখে পড়েনি ওর। ভুলই হয়ে গেল একটা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চুপচাপই ছিল প্রলয়। জয়িতা প্রলয়ের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পায়নি। প্রলয় চা খেতে খেতে ডাকে জয়িতাকে। এরপর পুরোনো কথা তোলে ও।

— মনে আছে, বিয়ের আগে কে যেন তোমার হাত দেখেছিল?

হ্যাঁ, ভালই মনে আছে ওর। দু'জনের কুষ্ঠি বিচারের কথাও বলেছিল। বিয়ে না হওয়ার সম্ভাবনার কথা। কিংবা হলে খারাপ কিছু—।

— মিলেছে কিছু?

জিজ্ঞাসা করে প্রলয়। জয়িতা মাথা নাড়ে।

— তাহলে?

— না, ইনি যা বলেন তাই নাকি—

— কে বলেছে এসব?

জয়িতা চুপ করে থাকে। ওর আর বলা হয়ে ওঠে না কে বলেছে বা কে দিয়েছে ঠিকানা। এরপর উঠে পড়ে জয়িতা। প্রলয়ের প্রশ্ন এড়িয়ে যায় ও।

— আমি তোমার কাছে চাইব না কিছু। মানে, কোনও স্টোন। তারপর কিছু হলে বলো না আমায়!

— দেবও না। ফালতু যতসব।

জয়িতা জানত এরকমই হবে কিছু একটা। তাই হল সুতরাং যদি কিছু করতে হয় তো নিজেকেই। কিন্তু কীভাবে? একটা চাকরি বাকরি থাকলে ভাবতে হত না এত। সমস্যা যেন বড়ছে ক্রমশ। তবে কি সে সময় এসেই গেল।

নিরাপত্তা বলয়

জয়িতা খবরের কাগজ ঘাঁটছে খুব। একটা চাকরি পেলে খারাপ হয় না। এমনিতে ও বাড়িতে একাই সারাদিন। রান্না হয়ে গেলে কাজ থাকে না কোনও। প্রলয় তো বাইরে বাইরেই। সেদিনের পর থেকে যেন বেহিসেবি হয়ে গেছে আরও। অথচ কিছু বলতে গেলে ফোঁস করে উঠবে একেবারে।

দু-টারটে ইন্টারভিউ দিয়েছে জয়িতা। প্রলয়েকে না জানিয়েই। কারণ, এ নিয়ে এর সঙ্গে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে একমসয়। যদিও কনফার্ম করেনি কেউই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক্সপিরিয়েন্স চাই। কেউ বা জানবে পড়ে। চিঠি পাঠাবে কেউ। সুতরাং অপেক্ষা করতেই হবে তোমায়।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে একটা। টেবিলের ওপরই রেখেছে জয়িতা। আসলে সরিয়ে রাখার সময় হয়নি ওর। স্বভাবতই চোখে পড়ে প্রলয়ের। ঘুমোতে যাওয়ার আগেই জিজ্ঞাসা করে প্রলয়।

— চাকরির চেষ্টা করছ নাকি?

— কে বলল?

চিঠিটা সামনে এগিয়ে দেয় ও।

— হ্যাঁ, করছি।

— কেন? স্টোন কেনার জন্য? নাকি জেদ করে?

— সে তুমি যা মনে কর।

—মানে? তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে। ভেবেছ বলার নেই কেউ?

এরপর জয়িতা বলে ওঠে কিছু! প্রলয়ও। কথায় কথা বাড়ে। তর্ক এড়াতে চেয়েও পারে না জয়িতা। অন্ধকার যেন ঘনীভূত হতে থাকে ক্রমশ। ঘরের ডিমলাইটটা নীল রঙের এখন।

আগেরটা ছিল সবুজের। প্রলয় হয়ত খেয়াল করেও বলেনি কিছুই। আসলে নীল রঙটা ওর পছন্দের। তা বলে এরকম? আজ কিছু না বলে পারল না প্রলয়।

— এসব কী? নীল কেন সব? এই চাদর, তোমার পোশাক, এমনকী ঘরের আলোটিও!

—জানোই তো সব।

—রাবিশ। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

জয়িতা এভাবে তর্ক করেনি কোনওদিন। প্রয়োজনও হয়নি। আর প্রলয়ই বা কী? যতদিন জানত না রঙ নিয়ে মাথাব্যাথা ছিল না কোনও। কিসের এত রাগ? চোখ- মুখে বিরক্তি সবসময়। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না জয়িতা। ঘুম আসে না সারারাত। প্রলয়ের ভালর জন্যই তো সব। কিংবা হয়ত নিজের জন্যই! স্বার্থপরের মতো—ঠিক হচ্ছে না এসব। কিন্তু স্টোন নেওয়া হয়নি একটিও। অন্তত কিছু একটা গার্ড— । শনির দশা না হলে কাটবে কীভাবে? এসব বোঝানো যায় না প্রলয়কে। আবার চুপচাপ বসেও তো থাকা যায় না।

আবছা আলোয় মশারির ফাঁকগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্টই। পাখার অনবরত ঘুরতে থাকা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ছবিটা এখনও নতুনই মনে হয়। এটা বিয়ের ঠিক পরের। লম্বা ছিপছিপে

চেহারার প্রলয়। শ্যাম্পু করা চুল হয়ত হাওয়ায় উড়ছে তখন। লাল রঙের শাড়িতে জয়িতা। একটা নীলচে আভা যেন স্পষ্টই এতে। এমনকী আয়নার শরীরটাও নীলের। প্রলয় ঘুমোচ্ছে এই নীল আলোর ঘরে। হয়ত এখন কোনও স্বপ্নের জগতে ও।

অনিশ্চয়তা যেন চেপে ধরছে জয়িতাকে। সমস্ত ছক যেন ওলোট পালট হতে থাকে ক্রমশ। একটা বৃত্তের মতো জাল। কয়েকটা গ্রহ বা নক্ষত্র। নাকি একটা ভয়? বলয়ের মতো পাখ খেতে থাকা একটা অনিশ্চয়তা। তাহলে কী নীল চাদর বা নীল শাড়ি কিছুই কাজে দিল না? নাকি ভেঙে যাচ্ছে ওর নিরাপত্তা বলয়।

প্রলয়ের ট্রান্সফারের অর্ডার এসেছে। ভুবনেশ্বরে যেতে হবে ওকে। একবছর বা তার বেশিদেনির জন্যও হতে পারে। জয়িতার অনিশ্চয়তার আরও একটি কারণ। এবার কী করবে ও?

—না, যাওয়া হবে না তোমার।

সরাসরি বারণই করে জয়িতা।

—কেন, যাব না কেন? তোমার জ্যোতিষি বলেছে বুঝি?

—সব কথায় জ্যোতিষিকে টেনো না তো!

—মরব না আমি।

—প্লিস, বলো না এরকম। আসলে ভীষণ একা আমি। আর তুমি না থাকলে—

রান্না বসেনি এখনও। ঠাকুর ঘরেও যাওয়া হয়নি জয়িতার। স্নান সারতে দেরি হবে অনেক। জাগতে দেরি হয়েছে জয়িতার। রাতে ঘুম না হাওয়ার জন্যই। জানালায় যখন হলুদ রোদ ঢুকে পড়ে সরাসরি, ঘরের নীল আলো যখন মিশে যায় এই হলুদে তখন টের পায় জয়িতা। সাদা চাদরটা তখন ওর শরীরে। হয়ত বুকের একটু নীচে। প্রলয় ওপাশ ফিরে শুয়ে তখন। হয়ত ঠাণ্ডা লেগে থাকবে ভোরের দিকে। প্রলয় আগলে রেখেছে সারারাত। শীত তাই স্পর্শ করেনি ওকে। শিশির পড়েছে বাইরে। ভোরে ঘুম ভাঙলে কুয়াশাও দেখতে পাবে তুমি।

প্রলয়ের বাইরে যাওয়ার সব ঠিক। আর মাত্র কয়েকদিন। জয়িতার একাকিত্ব টের পায় প্রলয়। তিনবছর হয়েছে বিয়ের, তবুও। জয়িতা ভুলেও স্টোনের কথা তোলেনি আর। ছকে যাই থাক, সাবধানে থাকতে হবে ওকে। প্রলয়কে আড়াল করে মন্ত্রও পড়ে জয়িতা। একটা নীল কলম কিনে দিয়েছে প্রলয়কে। প্রলয় হয়ত বুঝতে পেরেও বলেনি কিছু। জয়িতার শাড়িতে নীলের ছাপ থাকে কোনও-না-কোনও। কিংবা কপালে নীলের ছোট্ট টিপ। অনেকটা কালোই মনে হবে দূর থেকে। চোখে পড়বে না প্রলয়ের।

এক বছরের জন্য ভুবনেশ্বরে যাচ্ছে প্রলয়। জয়িতাও যাবে সঙ্গে। প্রলয়কে ঘিরে জয়িতার নিরাপত্তা বলয় কাজ করবে ঠিকই। তাছাড়া আকাশ তো নীল, সমুদ্রও। পৃথিবীর সাতভাগই তো নীল। সুতরাং ভয় নেই কোনও। নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে জয়িতার। একটা ছক থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না হয়ত। কিন্তু ছক অনুসারে তৈরি তো হতেই পারে মানুষ। একটা অদ্ভুত শান্তি আছে এতে। একটা অদ্ভুত আনন্দ। ক' দিন ধরে এ আনন্দ টের পাচ্ছে জয়িতা। হয়ত কোনও স্বপ্নের জন্যই।

নিরাপত্তা বলয়

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ছিঁড়ে ফেলেছে জয়িতা। ভুবনেশ্বরে প্রয়োজন হবে না এটার। শাড়ির ভাঁজে রাখা সেই ছকেও নেই আর। ওটাও হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় জয়িতা। এসবের এখন আর প্রয়োজন নেই কোনও।

এখানে সমুদ্র কাছে অনেক। একটা বিশাল নীলের পৃথিবী। সময় কীভাবে যে কেটে যায় টের পায় না ওরা। একটা আসন্ন সম্ভাবনার কথা মাথায় ঘুরছে জয়িতার। হয়ত আসছে কেউ। অনেকটা স্বপ্নের মতোই—। এলোমেলো হাওয়া হচ্ছে সব সময়। পর্দায় নীল সাদা প্রিন্ট। প্রলয় এখন বাড়িতেই বেশি সময়। আরও কিছুদিন এখানে। এরপর কলকাতায় ফিরবে ওরা। নিজেদের বাড়িতে। এখানে অফিস কোয়ার্টার। নীল আকাশ স্পষ্ট দেখা যায় জানালা দিয়ে। টুকরো সাদা মেঘের চলাফেরা দেখতে দেখতেই বিকেল হয়ে যায় কখন যেন। প্রলয় না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থাকে জয়িতা। এভাবেই

জয়িতা বেশ অন্যমনস্ক এখন। ভয়ও হয় এক-এক সময়। হয়ত কিছু হারাবার বা পাওয়ার অনিশ্চয়তাও হতে পারে। প্রলয় আশ্বস্ত করে।

—তোমার নিরাপত্তা বলয়েই তো আসছে সে। তোমার নীলের নিরাপত্তা। নীল আকাশের আড়ালে, তোমার নীল আঁচলের ঘেরাটোপে। ভালই হবে সব। দেখে নিও।

এরপর সত্যি চিন্তা থাকেও না কোনও। একলা লাগে না আর। অপেক্ষা করাও যে কত সুখের তা টের পায় জয়িতা। সময় এগিয়ে যেতে থাকে ক্রমশ। জয়িতার নিরাপত্তা বলয় দৃঢ় হয় আরও। অপেক্ষার এই কয়েকটি মাস সাত বছরের অনিশ্চয়তাকে হারিয়ে দেয় যেন। জয়িতার স্বপ্নগুলি দানা বাঁধে একটা নতুন জীবনের চাহিদায়।

অথচ একবার

কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস

শীষের তীব্র ইচ্ছা। মুখোমুখি হওয়ার। অথচ একবারও সম্ভব হয়নি। যন্ত্রণাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে শীষ। তারপর ছেড়ে দেয়। এই খেলাটা নতুন। সামনে কুয়াশা। কোমর ছাপানো কোঁকড়ানো চুল। চিবুকে প্রচ্ছন্ন খাঁজ আর গালের তিল এক একটা রামধনু। অথচ একবারও শীষ হাত বাড়াতে পারছে না। অসহনীয় দুঃখ। আচ্ছা, শীষের ভিতর এখন কতটা জল?

সামনে ঐ যে ভদ্রমহিলা মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গায়ে বিবর্ণ ছাপা শাড়ি, এক-মনে সেলাই করছেন; এক বারের জন্য মুখ তুললেন। তার মধ্যে শুধালেন,'কখন এলি?' অথচ উত্তরের জন্য অপেক্ষা নেই। ইনি শীষের মা। শান্ত সমাহিতা।

খাটে বসা বৃদ্ধ রিটায়ার্ড মানুষটার হাতে বাসি খবর-কাগজ। ইনি শীষের বাবা। বেশি বয়সেই প্রজাপতি বসিয়েছিলেন। এখন পেনশনের টাকাই অক্সিজেন।

খাটের একপাশে অল্প বয়স্কা। এই রমণী শীষের একমাত্র দিদি। দিদির বিয়ের পর বাবা সর্বস্বান্ত। এখন দিদি শুয়ে। চোখ খোলা। কপালে সিঁদুর। সিঁদুর না সুখ। বিয়ের আগে বিল্টুদার সাথে দিদির প্রেম জানাজানি হওয়ার পর, বাড়িতে ভূমিকম্প। মা কপাল চাপড়াচ্ছিলেন। বাবাও বাদ যাবেন কী করে? নিজের চুল ছিঁড়ছিলেন। তারপর তড়িঘড়ি দিদির অন্য জায়গায় সাতপাক।

এখন শীষের অসম্ভব ইচ্ছে দিদিকে শুধতে, 'এ্যাই, তোর সেই হিরো...বিল্টুদার খবর জানিস?' অথচ শীষ কিছুই বলতে পারে না। দিদিকে দেখে। হাতে সিনেমা পত্রিকা। অথচ একসময় বাড়িতে এসব পত্রিকা নিষিদ্ধ ছিল। আচ্ছা, বিয়ে হলে কী সবাই স্বাধীন হয়ে যায়? বেশ মজার। হঠাৎ শীষের শুধানোর ইচ্ছে, 'জামাইবাবুকে তোর ভাললাগে?'

দিদি উত্তর দেবে। নিশ্চয়ই বলবে, 'হ্যাঁ।'

তারপর শীষ অবাক, 'কেন?'

দিদির চোখ অবাক, 'কেন?'

শীষ আঙুল মটকাবে। জামাইবাবু শিক্ষিত সুচাকুরে। অথচ বিয়েতে টাকা নেওয়ার সময় কাবুলিওয়ালা।

ইংরাজি অনার্স পড়ার সময় থেকেই শীষ মহাসঙ্কটে। ডিপার্টমেন্ট এই প্রথম এক জনের জন্য মনটা হু হু। শীষের পক্ষে কাউকে বলা অসম্ভব। একমাত্র বিশেষ ক্লাসেই শীষের দমবন্ধ। ক্লাসে ধীর গানের মতো তার প্রবেশ। তার অনাবিল দৃষ্টি সবাইকে ছুঁয়ে যায়, পড়ানোর সময়। বলার ভঙ্গী অনবদ্য। গলার স্বরও ভারি মিষ্টি। কোন এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়, শীষের কাছে হীরের চেয়েও দামি। তখনই জেগে ওঠে দ্বন্দ্ব ভয় লজ্জা সঙ্কোচ আকর্ষণের অসংখ্য ঢেউ।

যৌবনে এই প্রথম বাথরুমে গোপন কাজের পর, সারাদিন অসম্ভব পাপবোধ আর ঘেন্নার

বুদবুদ। ক্লাসের অন্তরঙ্গ কার্তিককে বলতেই, কার্তিক প্রথমে হতভম্ব। পরক্ষণে বাজ-হাসি, 'মাই ডিয়ার শীষ, এত্তো দিন পর যে সাবালক হলি। ...পুজো দে... পুজো দে। ...তবে বেটার লেট দ্যান নেভার।' তারপর বাঁ চোখের কোন ছোট করে, 'মেয়েদেরও একটা জিনিস হয়।'

শীষের চোখ ছানবড়া। চিন্তা ক্রমশ পাথর। তারপর কার্তিক যা বলল, তাতে পাথরে ফাটল। শীষ ভাবতে পারে না—যাকে ভাললাগে, যার জন্য যখন-তখন মন খারাপ, তার তবে ঐসব মেয়েলি ব্যাপার হয়!

তবু শীষ তার দিকে তাকাতে কেমন যেন অস্বস্তিতে ভোগে। ও কী তবে শীষের সব চিন্তা ধরে ফেলেছে? ফলে শীষ মহা সঙ্কটে।

একদিন ডিপার্টমেন্টের বাইরে দেখা। টুকি-টাকি কথার পর হাসে, 'তোমাকে হাঁ করে বসে থাকতে দেখি। ...তুমি তো পড়াশোনায় খুব ভাল... ক্লাসে নোট লেখ না কেন?'

লজ্জা-লজ্জা। মাথা নামায়। সব ভাবনা কী প্রকাশ করতে আছে? নীরব শীষের লাজুকতা, সরলতা, কোমলতা, এক ধাক্কায় আকাশ ছোঁয়। অথচ শীষ চোখ বুজে বলে দিতে পারে—কবে উজ্জ্বল মসৃণ নমনীয় শরীরকে কী রঙের শাড়ি আলিঙ্গন করেছে, কথা বলার সময় গোলাপী মসৃণ ঠোঁট কতটা কুঁচকে যায়, গালের মোলায়েম চামড়া ক-বার কাঁপে—সবই নমতা পড়ার মতো শীষের মুখস্ত। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, ওর সাদা দাঁতের শরতের হাসি। তখন শীষের শিরদাঁড়া বিপজ্জনকভাবে কাঁপে।

সেই মুখের বিরল পবিত্রতায় শীষ দিশেহারা। মাঝে মধ্যে নিজর ওপর কেন যে অকারণ রাগ হয়! অথচ একবার শীষ সমস্ত কিছু বলতে চায়। অনেক কথা। বুকে জমে ওঠা তাল-তাল কথায় পাহাড়। মনের গোপন ঝর্ণায় শীষ মগ্ন। ওকে জানাতে চায় একান্ত ভালবাসার কথা। জীবনের গোপন মধুর কথা। অথচ এবার বলবে। বললে, খারাপ হবে? খারাপ ভাববে?

কিন্তু শীষের সামগ্রিক স্থিরতা ক্রমশ ভঙ্গুর। একাকীত্বের যন্ত্রণা অসহনীয়। দীর্ঘ উপবাসী যন্ত্রণাকে পুষে রাখাও অসম্ভব। এখন সে কী করবে?

ক্লাসে কার্তিক হন্ত দন্ত হয়ে আসে, 'এই তোকে ডেকেছে?

'কে?' শীষ আনমনা।

কার্তিকের উত্তরে শীষ চমকে ওঠে। চেতনার শেষ বিন্দুতে আলোড়ন। এতদিন পর কী দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান? দু-পা ক্রমশ ভারি। অন্য ঘোরে শীষ এগিয়ে যায়। ডিপার্টমেন্টের দোতলায় এসে থামে। আবার এগোয়। প্রায় বন্ধ দরজা ঠেলে প্রবেশ। সে তখন চেয়ারে। পরনে আকাশী শাড়ি। ম্যাচিং ব্লাউজ। চুল চুড়ো করে বাঁধা। আজ যেন অদ্ভুত ভালোলাগার আমন্ত্রণ নিয়ে বসে আছে। সুন্দর ঝকঝকে হাসি উপহার দেয়, 'বসো'। সামনের ফাঁকা চেয়ারে ইঙ্গিত।

দাঁড়িয়ে থাকা শীষের বুক জুড়ে তুবড়ি। অতি কষ্টে মুখ তোলে। 'ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ।'

মুহূর্তে শীষ ভরশূন্য। চেয়ার ধরে সামলায় নিজেকে। ঘর সম্পূর্ণ ফাঁকা। আর তর সয় না। যাবতীয় সঙ্কোচ থেকে উঠে এসে, পরিস্কার তাকানোর চেষ্টা করে শীষ।

'তুমিতো উচ্চমাধ্যমিকে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলে...।'

শীষ মাথা নাড়ায়। ভিতরে ছটফট করে। সময়টা বড় দীর্ঘ লাগে।

'যেকথা বলছিলাম, মাধ্যমিকেও তো তোমার রেজাল্ট .....আমার ছেলে এবার নাইনে উঠল। তোমার খাতা-পত্তর-নোটস দিলে...ওর উপকার হবে।'

বাকি কথা শীষের কানের পাশ দিয়ে চলে যায়। শীষ নির্বাক। নিশ্চল। চোখের সামনে ওই সাদা সিঁথি, শীষের হৃৎপিন্ডে করাত চালায়। মাতালের মতো।

অন্য মা

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

"ডাক্তার বাবু আমার কিছুই ভালো লাগে না। আমার বাগানের ফুলগুলো সব মরে যাচ্ছে ....।" ধৃতিমান লক্ষ করছিলেন শ্রুতি কথাগুলি বলছে আর তার সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন হতাশ।

"কেন? আপনি তো দিব্যি আছেন। ভালো লাগে না কেন? কথা বলতে বলতে ডাক্তার রক্ষিত প্রেস্ক্রিপ্সনের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন।

"মিসেস ব্যানার্জ্জি আপনার কোনো রোগ নেই। কোনো প্রবলেম নেই। আপনি একজন সুস্থ মানুষ। আপনার চারপাশে যা কিছু আছে সব সুন্দর। সব বেঁচে আছে। আপনার ফুলগুলো সুন্দর ফুটে আছে। আপনি ভাল মন নিয়ে দেখুন দেখবেন স-অ-ব ভাল লাগবে।"

এরপর চেম্বারের ভিতরে নিয়ে গেলেন শ্রুতিকে। ধৃতিমান একা দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখছিলেন। রোজ বসে বসে এই কাজই করেন ধৃতিমান। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার কলকাতায় এই নামকরা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা কাছে নিয়ে এলেন শ্রুতিকে। ডাঃ রক্ষিতের একটা বিষয় খুবই ভাল লাগে ধৃতিমানের। ভদ্রলোক ট্রিটমেন্ট শুরু থেকেই রোগীর সঙ্গে সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। কিন্তু তাতেই বা কি হবে? শ্রুতিকে একরকম জোর করেই এখানে নিয়ে আসতে হয়। একদম ইচ্ছুক নয়। অথচ ইদানিং যে ধরনের জটিলতা দেখা দিচ্ছে তাতে অনেকেরই মত শ্রুতিকে ভালো কোন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। সেই তাগিদেই গত তিন মাস ধরে ডাক্তার রক্ষিতের চেম্বারে আসছেন।

বাড়ি ফিরে শ্রুতিকে ডাকেন — চলো খাওয়া দাওয়া সেরে নিই।

আমি কিছু খাব না। আমার একদম ভালো লাগছে না।

— প্রায়দিন রাতেই খাচ্ছনা। একরকম করলে শরীর আরো খারাপ হবে। প্রেসারে ভাত করেছি। চল ঘি দিয়ে বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে নেবে।"

"বললাম তো খাব না। খাবই না।" গলায় জেদ্ স্পষ্ট। যেদিনই ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় সেদিনই শ্রুতি এই ঝামেলা শুরু করে।

ঘর থেকে বের হয়ে যান ধৃতিমান। টিভিতে খবর হচ্ছে। ছিমছাম তরুণীর ঝরঝরে খবরে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন। নাঃ। অস্বস্তি হচ্ছে একটা। খিদে পেয়েছে। আর একজন মানুষ কিছু খাবে না। ধৃতিমান খান কি করে। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে তারা নিঃসন্তান। সন্তান থাকলে তাদের জন্যই শ্রুতিকে খেতে হত। আর সন্তানহীনতার জন্যই তো তাদের যত সমস্যা।

বাইরের একচিলতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তিন ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ির এক চিলতে বারান্দা বা ব্যালকনিতে শ্রুতির প্রিয় বাগান। একটা সিগারেট ধরালেন। কমই খান। ডাঃ বারন করেছেন। কিন্তু

আজ নানাবিধ টেনসনে সিগারেট বেশি খাওয়া হচ্ছে। শ্রুতিকে যে কিছু বুঝিয়ে বলবেন তার উপায় নেই। ভুল বুঝবে। আজ শ্রুতি সব কাজই কেমন সন্দেহের চোখে দেখে।

এক এক সময় মনে হয় এর জন্য দায়ী কে? আত্ম বিশ্লেষণের মুহূর্ত উপস্থিত বুঝি। সত্যিই তো ধৃতিমান শ্রুতির উপর অনেক অবহেলা করেছেন। নিজের কাজ, পাড়ার ক্লাবের দায়িত্ব, অফিসের কো-অপারেটিভের দায়িত্ব, সর্বোপরি পার্টির দায়িত্ব এসব মাথায় রাখতে গিয়ে শ্রুতিকে অনেক সময়ই সময় দিতে পারেন নি। শ্রুতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেও অনেক সময় স্বীকার করে নেন নি। নিজের কাজে শ্রুতিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শ্রুতি কি চায় তা কখনো বুঝতে চাননি। আজ বড় দেরিই করে ফেলেছেন। পায়ে পায়ে আবারও শোবার ঘরে এলেন— 'শ্রুতি চলো একটু খেয়ে নেবে। অনেক রাত্রি হল। শুধু রাগ করে নিজেরই ক্ষতি করছ।"

— আমার রাগে কার কীই বা যায় আসে।" অভিমানী কণ্ঠস্বর। আজকাল কথায় কথায় অভিমান করে ছেলেমানুষের মত। অথচ নতুন বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীদের কত আব্দার করে। শ্রুতি কোনদিন তেমন কোন আব্দার করে ব্যস্ত করেননি।

শ্রুতির সমস্ত অভিমান ভেঙে দিয়ে বুক নিংড়ানো ভালোবাসায় সমস্ত দ্বিধাকে দূরে ঠেলতে চেয়েও কেন জানি পেরে ওঠেন না। কোথায় আটকায় ধৃতিমানের। বড় যন্ত্রণা। বড় দ্বন্দ্ব।

সংসারের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভুলটা কি তিনিই করেছেন? শ্রুতির শ্যামলা শরীরের কী অদ্ভুত মাদকতা ছিল। সে বয়সও হারিয়েছে। সে কোমলতাও অপসৃয়মান। এতো প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু মনের এত পরিবর্তন কেন? মেনোপোজ হলে কি সব মেয়েরই এমন হয়? কমপ্লেক্সে ভোগে?

ডাইনিং টেবিলে এসে নিজের হাতে ভাত বেড়ে কোনো ক্রমে খাওয়া সারলেন। মশারি টাঙিয়ে বিছানায় এসে শ্রুতির মাথায় হাত রেখে কথা তুললেন —

— "কাল আমি একটু তাড়াতাড়ি বের হব।"

— কেন? কোথায় যাবে?

একটা মিটিং আছে। তোমার তো স্কুল আছে। তুমি তালা লাগিয়ে যেও। আমি ডুপ্লিকেট দিয়ে খুলে নেব। যদি তোমার আগে ফিরি।"

তেরছা চোখে তাকায় শ্রুতি।

—"তুমি তাহলে কাল ছুটি নিচ্ছ?"

— হ্যাঁ, এক কাজ করলে হয় - তোমারও রেস্ট দরকার, কাল তুমিও ছুটি নাও। বাড়িতে বসে গান শুনে আর গল্পের বই পড়ে কাটাও।"

— আমার রেস্ট নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।"

ধৃতিমানের হঠাৎ করেই রাগ হয়ে যায়। তিনি তো যথেষ্ট ধৈর্য্য নিয়ে ভালোভাবেই কথা বলে যাচ্ছেন। শ্রুতি কেন একটা ব্যাপার নিয়েই জেদ্ করে যাচ্ছে?

— " শোনো শ্রুতি তোমাকে ক'টা কথা বলতে চাই। নিঃসন্তান হবার জন্য আমরা কেউই দায়ী নই। ভবিতব্যকে কোন কোন ক্ষেত্রে মানতে হয়। নইলে আমাদের তো কোনো ত্রুটি নেই। যে

ধরণের ট্রিটমেন্ট ডাক্তার বলেছেন আমি তা করাই নি একদম তা তো নয়। তোমার কিছু মানসিক সমস্যা হচ্ছে দেখেই এই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই এ নিয়ে এত কমপ্লেক্সের কী আছে?

— কমপ্লেক্স আমার নয়। তোমার। নিজের কমপ্লেক্স ঢাকতে আমাকে মানসিক রোগী বলে চিহ্নিত করে রোজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছ।"

— "কি বলতে চাইছ তুমি? কোথায় আমার কমপ্লেক্স।

— " তুমি জান না তোমার ত্রুটি কোথায়? বিয়ের পর কয়েকবার প্রেগন্যান্সি এসেছে। তুমি কেয়ার নাও নি। প্রথম দু'বার আমার মত নিয়ে অ্যাবরশন করেছে। তুমি বলেছিলে তোমার থিসিস কমপ্লিট হোক তারপর বাচ্চা আসুক — তোমার থিসিস কমপ্লিট হবার মুখে যখন আবার প্রেগন্যান্ট হয়েছি, তখন ডাক্তার তোমাকে বলেছিলেন আমাকে সম্পূর্ণ বেড রেস্ট দিতে তুমি কোন স্টেপ নিয়েছিলে? তোমাদের সংসারের জোয়াল আমার ঘাড় থেকে নামানোর কোনো চেষ্টাই তুমি কর নি।'

— শ্রুতি, রাতে পাগলের প্রলাপ শুরু করলে নাকি? গলা চড়ে যায় সপ্তমে। ধৃতিমানের এই কথায় অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় শ্রুতির মধ্যে। হঠাৎ দৌড়ে ধৃতিমানের দিকে এগিয়ে আসে শ্রুতি। প্রবল আক্রোশেই বুঝি বুকের কাছে পাঞ্জাবীটা খিম্‌চে ধরে —

— কি বললে তুমি? প্রলাপ? পাগলের প্রলাপ? আমি পাগল? আমাকে পাগল প্রতিপন্ন করে যার সঙ্গে তোমার এত দহরম মহরম তাকে নিয়ে থাকবে? চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। ক্লান্তিকর শুকনো মুখে চোখদুটো যেন জ্বলতে থাকে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ধৃতিমানের বুকের ভিতর যেন হিম হয়ে আসে।

— শ্রুতি তুমি এমন করছ কেন? শ্রুতি শ্রুতি। এতক্ষন ধরে যুদ্ধ করে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে শ্রুতি। কাঁধ দুটো শক্ত করে ধরে জাপটে ধরেন ধৃতিমান। নিয়ে যান বিছানার দিকে। শুইয়ে দ্যান বিছানায়। দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে অবিরাম ঘরের টিউব নিভিয়ে ডিম লাইট জ্বেলে দিলেন। শ্রুতির চিৎকারে চারপাশের ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দারা সচেতন হয়ে উঠেছে বুঝি।

শ্রুতি শ্রুতি কষ্ট হচ্ছে? কোথায় কষ্ট হচ্ছে? আমাকে বলো শ্রুতি।" চোখের জল মুছিয়ে দিলেন পরম মমতায়। সত্যি তিনিও বড় অবহেলা করেছেন শ্রুতির প্রতি। একের পর এক চারবার প্রেগ্‌ন্যান্সি এসেছে....। ধৃতিমান তো যত্নবান হন নি। শ্রুতির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মৃদুস্বরে আশ্বাস টানলেন —

— তুমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ। আমার দিকে তাকাও শ্রুতি। তুমি ছাড়া আমার আর কোনো ভাবনা নেই। তুমি এমনটা করলে আমি কি করে স্থির থাকব বলো তো? একটু হরলিক্স খাও। সারাদিন প্রায় না খেয়েই রইলে।

স্থির তাকিয়ে দেখছে ধৃতিমানকে। কত কথা বলত শ্রুতি। অথচ আজ মুখে কথা নেই। ইদানীং কথাও বলে কম। ধৃতিমানই কথা তোলেন আবার।

পরদিন আর বের হতে পারেন না। খুব জ্বর এসেছে শ্রুতির। ভিতরে ভিতরে অস্থির হন।

আজ বের হওয়া খুব দরকার ছিল। ও ঘরে ফোন বাজছে।

— "হ্যালো। আমি বলছি। আসবে তো? আমি কিন্তু রেডি হচ্ছি।

ধৃতিমানের বুকের ভিতর অজস্র ঢেউয়ের দাপাদাপি কী উত্তর দেবেন?

— আজ যেতে পারছি না। একটু প্রবলেম আছে।

— কী হল? তোমার শরীর খারাপ?

— না গো। পরে ফোন করছি। তড়িঘড়ি করে ফোনটা নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

ফোনটা নামিয়ে রেখে একটু আস্বস্তি হচ্ছে। ও প্রান্তের মানুষের ঠিক অভিমান হবে যে ধৃতিমান কথা বলছে না। কিন্তু ধৃতিমান যে কোন সংকটে আছেন তা বোঝাবেন কি করে?

ততক্ষণে তীব্র দৃষ্টি নিয়ে শ্রুতি সরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কে ফোন করেছিল? মিথ্যেই বললেন, উপায় নেই।

ওই আমার অফিসের নতুন ছেলেটি। কথাটা ছুড়ে দিয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকেন। না জানি শ্রুতি এর পরেও আবার কোন প্রশ্ন তুলবে।

— উঠে এলে কেন? চল শোবে চল। তোমার গায়ে খুব তাপ।

তুমি বের হবে না।

তোমার এ অবস্থায় ...। শোনো শ্রুতি তুমি একটু সুস্থ হও। দুজনেই ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে আসি চল। জলের কাছে বসতে চাও। দীঘায় যাব নয়।"

শ্রুতির চোখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল হল। পরক্ষণেই আবার নিভে যায়।

কদিন পর। ধৃতিমান আর শ্রুতি বসে আছেন বাবুঘাটে। পড়ন্ত বিকেল। জৈষ্ঠের শেষ। শেষ বিকেলে মিষ্টি বাতাস। বুক জুড়ানো। শরীরকে শান্ত করে। মনকে স্বস্তি দ্যায়। কোথায় যাবেন? হঠাৎ করেই মনে হয়েছিল। জলের কাছে বসতে হলে কলকাতার বুকে গঙ্গা বলতে বাবুঘাটে যাওয়া যেতেই পারে। শ্রুতি রাজি। দেরি করেননি আর। দুরে দুরে জাহাজ। জলের উত্থান পতন, ছোট ছোট ঢেউয়ের জলকেলি। কেমন আনমনা হন বুঝি ধৃতিমানও।

চল না আমরা দত্তক নি।" অনেকেই তো দত্তক দিয়ে ভালই আছেন। জল মানুষকে কত সহজ করে। সায় টানলেন।

— নেওয়া যেতেই পারে। তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে খোঁজ খবর নিতে হবে।"

— তুমি তাড়াতাড়ি খোঁজ খবর নাও। ছেলে হোক মেয়ে হোক আমার কোনোটাতেই আপত্তি নেই।' চার দেয়ালের বদ্ধ পরিবেশ মানুষকে গুমরে মারে। একটু সবুজের মাঝখানে জলের সারল্যে শ্রুতি মনের গোপন আকাঙ্খা কত সহজে তুলে ধরতে পারল। স্থির করলেন এবার শ্রুতিকে নিয়ে নয়— সব কথা একা গিয়ে ডাক্তারের কাছে বলবেন।

— আমি যেটা বুঝছি আপনাদের মাঝে একটি শিশু দরকার। সন্তান হবার স্টেজ আর নেই সেক্ষেত্রে দত্তক নিয়ে নিতেই পারেন। মেন্টাল নারিশমেন্ট হবে।"

— কিন্তু ডাক্তারবাবু ওর এখন যা অবস্থা - নতুন প্রবলেম সৃষ্টি হবে না তো। ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা একটা বাচ্চাকে আমাদের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নেওয়া খুব সহজ হবে কি?

আপনি এরকমভাবে ভাবছেন কেন? একেবারে বেবি নিয়ে আসুন। আপনাদের মাঝে থেকেই তার প্রাথমিক স্টেজগুলো, আমি বলতে চাইছি তার মেন্টাল সেট-আপ হয়ে যাবে।"

ধৃতিমান মন থেকে কেন জানি খুব সহজ হতে পারছেন না। কেবলই মনে হচ্ছে তারা দুজনেই চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে পঞ্চাশে এগোচ্ছেন। এই সময় কচি বাচ্চাকে বড় করে তুলতে পারবেন কি? শ্রুতি বছরের দশ মাস অসুস্থ থাকে। মুখে কোন দ্বন্দ্ব প্রকাশ করলেন না। শ্রুতিকে অনেকটা সময় সঙ্গ দেবার চেষ্টা করলেন। প্রতি সপ্তাহে এখানে সেখানে যদি শ্রুতি একটু স্বাভাবিক হয়। ওষুধগুলো কিছুতেই খাওয়াতে পারছেন না। নিজেই মানসিকভাবে ক্লান্ত বোধ করেন আজকাল। এমন সমস্যা কাউকে বলা যায়না। নিজের পরিচয় থেকে বিছিন্ন হয়ে ফ্ল্যাট কিনে ভেবেছিলেন স্বস্তিতে দিন কাটাবেন। কিন্তু এতবড় ফ্ল্যাটে একাকীত্বের যন্ত্রণাই শ্রুতিকে অসুস্থ করে তুলল। কিন্তু শুধু কি তাই? ধৃতিমানের কতগুলি অসাবধানতাও কি এরজন্য দায়ী নয়? প্রথম জীবনেও কোনদিন যা টের পায় নি শ্রুতি মধ্য যৌবন তা টের পেল কি ভাবে?

সুপ্তির কথা কেউই জানে না। সকলে জানে সম্পর্ক মরে গেছে, নাঃ মরে নি। সুপ্তি যার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সখ্য তার বিয়ে হয়েছিল ধৃতিমান নয় এক কলেজের প্রফেসরের সঙ্গে। টিকল না সে বিয়ে। হতাশা আর একাকিত্বে যখন ভুগছেন সুপ্তি তখন পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ভাবেন নি জড়িয়ে পড়বেন। চেয়েছিলেন এদের মধ্যে সমঝোতা আনবেন সুপ্তি ফিরে যাবে নিজের সংসারে। হল না কোনাটাই। মানিকতলায় ফ্ল্যাট নিয়ে সুপ্তি একা থাকে। সরে এসেছিলেন ধৃতিমান। কিন্তু যখন তখন কোন দেখা করার জন্য তাগাদা। ফিরতে পারেন নি। কোনো অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছেন। এ যন্ত্রনা, ও গোপন ভালবাসাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকাশ করা যায় না। কতবার ভেবেছেন শ্রুতিকে হালকাভাবে বলে রাখবেন। কোনদিন শ্রুতি জানলে দুঃখ পাবে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে তাদের দুজনের মধ্যে তো এটুকু একটু করে শ্রুতি দুরে সরে গেছেন আজ শ্রুতি কোন আব্দারই আর করেন না। সংসারে প্রয়োজনীয় কথাটুকু ছাড়া কোনো কথাও বলে না। কি এক নিস্পৃহতার মোড়কে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। এ বোধহয় যোগ্য শাস্তি ধৃতিমানের।

আর সুপ্তি? তার কাছ থেকে কী পেলেন? কেন সেই নারীকে ফেরাতে পারেন না। নরম মনের মানুষ বলেই কি? এক নিঃসন্তান জীবনের শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলেছে সে নারী। সচেতন নয়, অবচেতনে। আর এও তো ঠিক সন্তানের জন্য তেমন ব্যাকুলতা তিনি অনুভব করেন নি। নিজেকে একা মনে হয় নি। চাকরী, নানাবিধ কাজকর্মের ঝক্কি সব সামলাতে গিয়ে জেরবার হয়ে গেছেন। অলস সময়ে সন্তানের জন্য নিঃসঙ্গতা অনুভবের ফাঁকটুকু ছিল না।

অনেকবার ভেবেছেন সুপ্তিকে যোগাযোগ করতে বারণ করবেন। বলতে পারেন নি। একদিকে স্ত্রী অন্য দিকে নিজের কলেজ জীবনের প্রথম প্রেম। দোটানায় পড়েছেন। নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসার

দু'বছরের মাথায় বিপর্যয়। কিভাবে যেন শ্রুতি জানতে পেরেছিলেন সুপ্তির কথা। ধৃতিমান বুঝে পান না এ কাজটি তার চতুরা মেজবৌদি করেছেন কি না? সুপ্তির কথা একমাত্র তিনিই জানতেন। মেজবৌদি কোনদিনই শ্রুতিকে মেনে নিতে পারেন নি। দাম্পত্য জীবনে অনেক অশান্তির সূত্রপাত এই বৌদি।

কেউ একজন ফোন করে জানিয়েছে সুপ্তির কথা।

ম্যাডাম আপনার স্বামীর খবর রাখেন কি? প্রথম প্রথম শ্রুতি আমল দ্যাননি। কিন্তু ধৃতিমানের অনুপস্থিতিতেই ফোন আসে। সুতরাং যিনি ফোন করেন তিনি সব খোঁজ রাখেন। বিভ্রান্ত হয়েছেন শ্রুতি। তারপর দুয়ে দুয়ে চার করে কোন একবার ধরে ফেলেছিলেন। তারপর থেকেই সবকিছুতে শ্রুতির সন্দেহ। ফোন পেয়েও হয়ত কিছু হত না। সন্দেহল জোরদার হয়েছে তখনই যখন শ্রুতি শুনেছেন সুপ্তি সম্পর্কিত ধৃতিমানের কলেজ জীবনের রোমান্টিক অধ্যায়ের কথা। এই পর্ব বেশি জানতে ধৃতিমানের মেজবৌদি। এ নিয়ে কোন বকম জল ঘোলা করেন নি ধৃতিমান। কিন্তু ঐ যে কাঁটা বিঁধেছে শ্রুতির মনে সে কাঁটা থেকে রক্তক্ষরণ হয়েই চলেছে।

— কোন খোঁজখবর নিলে?

— কোন ব্যাপারে?

করে ? এখন তো তোমাকে কোনো বিষয়ে কিছু বলি না। দত্তক নেবার বিষয়ে কিছু ভাবলে কি? কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকলেন।

দেখি এর মধ্যে সময় করে যাব। দু একটা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেয়েছি তবে তাদের উপর আমিই ভরসা করতে পারি না।

এখনও তোমার এ খোঁজখবর নেবার সময় হল না।

— রাগ কোরোনা শ্রুতি। সারা জীবনের ব্যাপার। কেমন হবে কি হবে অন্যের সন্তানকে গড়ে তোলা। একটু ভাবার প্রয়োজন আছে না কি?

— তুমি ভাবতেই থাকো। উষ্মা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ হয়।

শ্রুতি বোঝেন ধৃতিমানের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছেটুকুও তার নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রুতির জীবনে প্রেম বল, অনুরাগ বলো সব তো ঐ মানুষটাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সে মানুষ শ্রুতিকে কি দিলেন?

বাড়ির একমাত্র মেয়ে শ্রুতি বড় শাসনে, বড় আদরে বড় হয়েছিলেন।

ধৃতিমানের সুন্দর চেহারা, সাংস্কৃতিক চেতনা মুগ্ধ করেছিল শ্রুতিকে। শ্রুতির জ্যাঠতুতো দাদার বন্ধু ছিলেন ধৃতিমান। যাওয়া আসার সুবাদে আলাপ ছিলই। বৌদি শ্রুতির পাত্র দেখার সময় কথা তুলেছিলেন।

হাতের কাছে ধৃতিমান থাকতে তোমার অন্য পাত্র খুঁজবে কেন? ভাল ছেলে, ওর কাছে প্রস্তাব রাখ না। তারপর আমি দেখছি ......।

বৌদির মধ্যস্থতায় ধৃতিমান ক্রমেই শ্রুতির কাছে এসেছেন দুজনে দুজনের সাথে সহজও হয়ে

উঠেছিলেন। আর ধৃতিমান? সুপ্তির বিয়ে হয়ে যাবার পর যে হতাশায় ভুগছিলেন শ্রুতিকে নিয়ে ভুলতে চেয়েছিলেন সব প্রকার যন্ত্রণা। শ্রুতির শান্তশী গভীর চোখ, নীরব কথা সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল এ মেয়ের কাছ থেকে কোন দিন আঘাত আসবে না। ফলে বিয়ে হয়ে ধৃতিমানের বিরাট পরিবারে চলে এসেছিলেন শ্রুতি মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই।

বাপের বাড়িতে কোনদিনই তেমন কাজ করতে হয়নি। বিয়ের পর শ্বশুড়বাড়ির বড় সংসারে হাঁফিয়ে উঠতেন শ্রুতি বুঝে পেতেন না কী করলে ভাল, কী করলে খারাপ বুঝে উঠতে পারতেন না। কষ্ট হত তবুও ধৃতিমানের মুখ চেয়ে সব মেনে নিয়েছিলেন। শ্রুতি এম. এ. পাশ করে সে বাড়ির বউ হয়েছিলেন। বাড়ির আর সব বউদের কাছে এই ছিল শ্রুতির অপরাধ। বিয়ে হবার পর থেকেই অহেতুক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বারংবার। সাংঘাতিক কটুকাচালির সামিল হতে মন সায় দেয়নি। ধৃতিমান ধরি মাছ না ছুই পানি গোছের ভূমিকা নিয়ে সরে থেকেছেন, একা ঠোক্কর খেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন শ্রুতি। ধৃতিমান প্রবল ব্যাক্তিত্ববান স্বামীর ভূমিকায় দৃঢ় থেকেছেন? আজ শ্রুতি সহ্য করতে পারেন নি। মেনে নিতে পারেন নি। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের সমস্ত বিশ্বাস বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বিবাহিত জীবনে শ্রুতি প্রথম প্রথম বেড়াতে যেতে চাইতেন তক্ষুনি কোন না কোনো অছিলায় শ্রুতির আবদার টেঁকে নি। হয় পার্টির জরুরি কাজ নতুবা হাত টানাটানি। অথচ সুপ্তির দরকারে অদরকারে ধৃতিমান ঠিক সময় দিতে পারেন। দত্তক নেওয়ার জন্য শ্রুতির মন এখন ব্যাকুল তাতেও মানুষটার গড়িমসি। ধৃতিমান আসলে ধরে নিয়েছেন যে শ্রুতি তার ইচ্ছের পুতুলমাত্র। শ্রুতি স্থির করেছেন এই স্বার্থসর্বস্ব গেছে। সে সুন্দর পরম ভালোবাসায় ভরা শ্রুতির মন আজ শুস্ক মরুভূমি ধৃতিমান কোনদিন তেমন করে শ্রুতিকে গুরুত্ব দ্যান নি। স্বামীর কর্তব্যের মিনিমাম লেভেলটুকু রক্ষা করেছেন মাত্র।

খুব ভোরে উঠে ব্যালকনির গাছগুলোতে জল দেন। গাছেদের সঙ্গে বড় সখ্যা ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে না। শুধু গাছ কেন কচি শিশুকেও বড় করে তুলবেন শ্রুতি। ঠিক পারবেন। একাই পারবেন। প্রয়োজন নেই ধৃতিমানের।

হ্যাঁ, এরপর রোজ বেরিয়েছেন শ্রুতি। খোঁজখবর নিয়েছেন। কাগজপত্র সংক্রান্ত যত কাজ সব সেরেছেন এক এক করে। সই সাবুদের জায়গায় এসে থামতে হল। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মত চাই। ধৃতিমানের কাছে কথা তুলতেই —

সে কি ? আমি জানলামই না। তুমি এতদুর এগিয়ে গেলে?

তুমি ব্যস্ত। আমার পক্ষে আর দেরি সম্ভব নয়। একজন শিশুর কচিকাকলি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আশাকরি এ কাজটুকুতে তোমার আপত্তি থাকবে না।

আবারও জেদি, একগুয়ে, প্রতিবাদি শ্রুতিকে দেখতে পেলেন। সায় না দিয়ে উপায় নেই। মনের ভিতর দ্বিধার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করতেই থাকে। কিন্তু শ্রুতিকে আর ফেরানো যাবে না বুঝতে পারলেন।

মাঝে আরো দুটো দিন বাদ দিয়ে শ্রুতি বের হলেন। মাদারের হাত থেকে নরম তুলতুলে

শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন শ্রুতি। ভোরের পবিত্র আলোর মত স্নিগ্ধ সে মুখ, বুকের ভিতর থেকে কথা উঠে এল বুঝি—

আমি তোর মা'রে খোকন, নিজের সন্তান তার আসে নি। কিন্তু এ শিশুকে পরম মমতায় তিনি একাই গড়ে তুলবেন। দু চোখ বেয়ে নামে জলের ধারা অবিরাম। অনুভব করলেন পৃথিবীর যত প্রতারণা আসুক এ শিশুর কাছ থেকে কোনো প্রতারনা আসবেনা। শ্রুতি ওকে মা চেনাবেন। পৃথিবীর সূর্য চেনাবেন। তিনি যে ওর একান্ত আপনার মা। ধৃতিমানকে এ জায়গা এতটুকু ভাগ তিনি দেবেন না।

অতিথি

দিলীপ চৌধুরী

মধ্য চৈত্রের জ্বালাধরা বেলা দশটা। প্রকৃতির সঙ্গে আমি ঠিক তাল রাখতে পারছি না। আমার মাথার পাশ দিয়ে বাতাসের শনশনানি। রোদের তাপও বাড়ার দিকে। সোনালি থালাটা বেলা বাড়ার সাথে সাথে ফেটে পড়বে। এ-চৈত্রেই এখানে দেখেছিলাম কালবৈশাখির রুদ্র রূপের পরে স্নিগ্ধ দিনান্ত।

এখন আমি আসছি আমার বড় ভায়রা সুখেন্দুদার বাড়ি ব্যারাকপুর থেকে। কাল রাতে বারান্দার আবছা অন্ধকারে আমার কাঁপানো উপস্থিতি দেখে ওর অস্ফুট শব্দ — অতনু, তুমি এখানে, অসময়ে?

হ্যাঁ, আমি চললাম। ওদের দেখবেন।

সুখেন্দুদাই মন্দিরাকে আমার জীবনে বেঁধে দিয়েছিলেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই শোকের খবরটা টেলিফোনে পেয়ে গেছে। অন্য আত্মীয়রাও হয়ত জেনে ফেলেছে।

বাসস্টপ পেরিয়ে বাহ্মসমাজ রোড বরাবর এগিয়ে বাড়ির কাছে পৌঁছতেই আমার চোখে পড়ল একটা ছোটো খাটো জটলা। এত লোকের সমাগম হবে আমি ভাবিনি।

সাধারণত এ এলাকায় দু'পক্ষের রেশারেশিতে বোম পড়তে থাকলে এমন লোকজন দেখা যায়। সবে করপোরেশন ভোট চুকল, মহল্লা একদম সুনশান। শান্ত থাকারই কথা।

এর মধ্যে আমার ষোলো বছরের ছোট ছেলে রাজেশকে কান্নাভরা চোখে দেখে চমকে গেলাম।

একি! এযে আমি। ফুল আর চন্দন নিয়ে খাটিয়ায় খুব সাজিয়েজে আমাকে। বাড়ির সামনে চারপায়ে শোয়ানো অবস্থায় নিজেকে চিনতেই পারছি না। মুখটা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছে। অথচ কাল রাত আটটা নাগাদ যখন বুকে একটা ব্যথা উঠল, খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। ডাকলাম --- রাজু, রা ---- জু। শুনছেই না আমার ডাক। শুধু শোকের কান্না কেঁদে যাচ্ছে।

এবার চমকে না উঠে পারলাম না। ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই আমার বউদি চন্দ্রানি। ইনি কোত্থেকে এলেন বুঝলাম না। মাসের পনেরো দিন দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকেন। এমনকি কালকে অব্দিও। আমার শ্রদ্ধেয় নিরীহ দাদা নিজেই রান্না করে খেয়ে স্কুলে যান। ভাগ্যিস কোনো বাচ্চা হয়নি। নইলে কি যে হত ?

মাঝে মাঝে দাদা দুঃখ করে বলত --- অতু, তোর বউদি আমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারল না।

সত্যিই দাদা, তুমি আলাদা হয়েও শান্তি পেলে না --- আমি বলতাম। দাদাটা কি কষ্ট করেই না আমাদের সংসারটা দাঁড় করিয়েছিল। বউদি একটুও স্বামীর দিকে মুখ তুলে চাইল না। ওদের ইস্যু নিয়ে আমার তেমন কোনো কৌতুহল ছিল না, দাদা একটুকুও সুখী নয়।

আমি কি খুব সুখে ছিলাম সংসারে? প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতাম বলে মন্দিরার চোখে বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই ছোটা নজরে ছিলাম। তাই (অবাঞ্ছিত) রাজেশ পৃথিবীতে আসার পরেও পিসতুতো দাদাকে ধরে আমার অমতেই সরকারি চাকরিতে ঢুকল, রিসেপশনিস্ট হয়ে। অবশ্য ওর ফিগারটাই এ-পদে সহায়ক ছিল। সেটা আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কি বলতে পারব না।

এরপরে মন্দিরা ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল। চাকরির তিন বছরের মাথায় আমার সঙ্গে যেন অচেনা লোকের মতো ব্যবহারে মেতে উঠল। এ ব্যাপারে বড় ছেলেকে সঙ্গী পেল। মায়ের আস্কারা

পেয়ে সমরেশ আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করল। রাজেশ ভয় করলেও ভক্তি তেমন করত না মায়ের প্ররোচনায়। আমাকে এভাবে ছেলেদের কাছে ছোট করে মন্দিরা খুব বেশি হত? সব বুঝেও পারিবারিক শান্তির জন্য চুপচাপ থাকতাম। আমার বউয়ের উল্টোপিঠ বউদির মাতৃরূপ, এখন আমাকে চমকে দিল।

ক্রমাগত রাজেশকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন আমাদের বাড়ির বড় বউ --- শোন বাবা রাজু, বাবা মা কারও চিরদিন থাকে না। রাজু বুক চাপড়ে বলে চলেছে --- জেঠিমা, বড্ড কষ্ট পেয়ে চলে গেল বাবা।

জটলার মাঝে এক বয়স্কার গলাতে শুনতে পেলাম --- ঘোষাল বাড়ির বড় বউটা দেওরের মরার খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে এল বুঝি?

আমি অদৃশ্য থেকেও লজ্জায় অতটুকু হয়ে গেলাম। মরে স্পষ্ট বুঝলাম আমাদের বাড়ি সম্বন্ধে পড়শিদের প্রকৃত ধারণা।

রাজেশের দিকে তাকালাম। ও কেন, আশপাশের কোনো লোকই আমার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে না, পেলেই 'ভুত, ভুত --- ভু ...ত' বলে চেঁচিয়ে উঠত।

রাজুর মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দাদাকে নজরে পড়ল, দাদার কান্নার উচ্চস্বর --- অতু, ছোট হয়ে তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি। স্কুল থেকে এসে কাল চা করে খেয়েছি।

বাবাগো, মাগো --- আমাকে আগে না নিয়ে অতুকে কাছে টানলে কেন গো।

এরপর দেখলাম বড়দি বনগাঁ থেকে বড় ভাগনেকে নিয়ে হাজির। শিলিগুড়িতে ছোটদিকে হয়ত এস টি ডি করা হয়েছে। বড়দি দাদাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বড়দি আমাকে খুব ভালোবাসত। জামাইবাবু মারা যেতেই ছোটভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার টান যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। তার প্রমাণ পেয়েছিলাম বঙ্গশ্রী লটারির ফার্স্টপ্রাইজটা পাবার খবরে এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে পরদিনই চলে এসেছিলেন।

শুধু কি তাই। দু-ভাইয়ের মধ্যে সদ্‌ভাব বজায় রাখতে ভাল উপদেশ দিতেন বাপের বাড়ি এলে। আর মন্দিরাকে বলতেন --- ছোট, তুই যদি অতুর সাথে হামেশা খিটিমিটি করিস তবে যে ছেলে দুটো রসাতলে যাবে। হ্যাঁ, ঐ লটারি পাবার পরেই মন্দিরার সঙ্গে আমার মনের দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল।

এমন পর্যায়ে দু'জনের সম্পর্ক পৌঁছল যা বলে বোঝানো মুস্কিল। অর্থ যে অনর্থের মূল --- আমি তা বুঝতে পারলাম। মন্দিরার মনের দৌড়কে সামাল দিতে ব্যাঙ্কে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট (প্রথমে আমার নাম, পরে ওর নাম) খুললাম।

টাকাগুলো সুদে বাড়তে লাগল।

সাথে সাথে মা ও বড়ছেলের যৌথ মানসিক চাপও আমার ওপর এসে পড়ল। হালফিলে সেটা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

মন্দিরা জানাল --- জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে তোমার নাম পাল্টে সমরেশের নাম বসাও।

জীবিত থেকেও আমি বাড়ির যেন বাইরের লোক ছিলাম। এতবড় অবিশ্বাসের ধাক্কা মনে মনে সহ্য করতে পারিনি। দেখি --- বলে বউকে সাময়িক বুঝ দিলেও মনের ব্যথা ক্রমশ বাড়তে লাগল। এর মধ্যে আমার ফার্ম অংশীদারদের ঝগড়ার দরুণ ক্লোজার হয়ে গেল।

পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠল। দাদা আমার বউছেলেকে বোঝালেও ওরা কানেই নিত না। ফলে আমার প্রেসার প্রচন্ড বাড়ল। সেদিকে কারও নজর দেবার ফুরসত নেই। মাস খানেক আগে সেকেন্ড স্ট্রোকও হয়ে গেল।

ডাক্তারের হুঁশিয়ারী ছিল পরিজনদের প্রতি --- রোগীর অবস্থা ভাল নয়। প্রেসার খুব বাড়ছে।

মন্দিরা এসব নিয়ে অত মাথা ঘামাত না। আমার মৃত্যু কামনা যেন ছিল ওর মনের একমাত্র চিন্তা। সব কিছুই ওর নামে লিখে দিয়েছি। তবুও মন ভরল না। ব্যাঙ্কের হিসেবে সমরেশের নাম না বসানোতে যত আক্রোশ আমার ওপর। শেষ পর্যন্ত সেরিব্রাল অ্যাটাকেই আমি পৃথিবী থেকে ছিটকে গেলাম।

এবার দেখলাম সমরেশ জলভরা চোখে বড়দির পাশে এসে দাঁড়াল। এক দৃষ্টিতে আমার অসার দেহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ও কি ভাবছে নিশ্চুপ থেকে, বোঝা গেল না।

বড়দি বলাতে ও আমার ঠান্ডা পা-দুটোর কাছে বসল। ও ছোটুরে, তুই আমাদের ছেড়ে চলে গেলি কেন --- বলে বড়দি বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

ভাবছি মন্দিরাকে দেখছি না কেন? তখনই দাদার গলা শুনতে পেলাম --- ওরে, বউকে ভেতর বাড়িতে সামলা। ও শুধু জ্ঞান হারাচ্ছে।

এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা। যে স্ত্রী বেঁচে থাকতে বড় ছেলেকে নিয়ে স্বামীকে পদে পদে অপদস্থ করেছিল, সে এখন লোক দেখাতে কান্নায় ডুবে গেল।

এক ফাঁকে বাড়িটাকে একটু ঘুরে দেখে নেওয়া যাক। দাদার ঘর আগোছালো, ওটাই স্বাভাবিক। শুধু বাবা-মার ছবিটা নীরব সাক্ষী থেকে সব কিছু লক্ষ করছে।

আমার বড়ছেলের কামরা একদম টিপটপ। কিন্তু টেবিলের একপাশে এক সুবেশা খোঁটা দিয়ে স্মার্ট মেয়ের বাঁধানো ছবির স্ট্যান্ড। ওই কি সমুর প্রেমিকা রঞ্জনা। যার কথা মন্দিরা খোঁটা দিয়ে আমায় বলত --- তুমি ওর নামে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করছ না বলেই হিল্লে হচ্ছে না সমুর।

পা বাড়ালাম মন্দিরার রুমে।

একি! নিচে শুনে এলাম ও নাকি ক্ষণে ক্ষণে আমার শোকে জ্ঞান হারাচ্ছে। এত শোকের মধ্যেও আলুথালু মন্দিরা কাজের কাজ সারছে। ঘরের ছিটকিনি দেওয়া।

আলমারির লকার খুলে ওর নামে রাখা সমস্ত কাগজপত্র এক পলকে দেখে নিচ্ছে। সব দেখা শেষ হল। নিজেই বলতে থাকে --- মিথ্যে বলে ভাশুরের কাছ থেকে শ্রাদ্ধের অর্ধেক খরচা ম্যানেজ করব।

হায়রে, আমার সতীসাধ্বী স্ত্রীর কথা। তখনই ওর ঘর ছেড়ে আবার আমার ডেডবডির কাছে এলাম।

দৃষ্টিতে এল শান্তিপুর থেকে আসা বোন- ভগ্নিপতি, সুখেন্দুদা, বড়, শালীর আত্মীয়রা প্রায় সবাই চলে এসেছে। ক্লাবের এগ্‌জিকিউটিভ কমিটি সহ অনেক সদস্য ভিড় করেছে। ক্লাব সেক্রেটারি পিকলু নাগ দাদার উদ্দেশ্যে বলল --- অনুপদা, বেলা তিনটে বাজল। এবার যাত্রার ব্যবস্থা করি।

দাদা মত দেওয়াতে পিকলুদা আমার লাশটা বাঁধার ব্যবস্থা করে ফেলল ক্লাবের ছেলেদের সাহায্যে।

সমু দাদার পাশে বসা কান্নাভরা রাজেশের কাঁধে হাত রাখল। অমনি ছোট খোকার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল --- ও জেঠু , দাদা, বাবা আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছে যে।

সুখেন্দুদা ওর কান্না আগলাচ্ছে। দেখলাম মন্দিরা আমার পায়ের ছাপ একটা সাদা কাগজে ধরে রাখল। আদিখ্যেতা! শেষে 'বল হরি হরিবল' ধ্বনি দিয়ে খাটিয়ার সামনের দিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমু কাঁধ দিল।

হরিধ্বনি শুরুর সঙ্গেই শবযাত্রীরাও গলা মেলাতে লাগল। খই আর খুচরো পয়সা রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে সবাই আমাকে চিরদিনের মতো বিদায় জানাল।

ও পিসি, বাবা চলে গেল গো — রাজেশের কান্নার সাথে দেখলাম বড়দিও সতেরো বছরের ছোট ভাইয়ের শোকে ভেঙে পড়েছেন।

নগেন বাড়ৈ-এর শ্বশুরালয় যাত্রা

অরূপ আচার্য

অনেক বছর পর নগেন এখানে এল। সবকিছু নতুন ঠেকছে তার চোখে। কেমন সব পাল্টে গেছে চারপাশ। রাস্তার দুপাশে অনেক দোকানপাট হয়েছে। তেমন গা ছমছমে ফাঁকা নির্জনতা নেই। লোকবসতি হয়েছে ঢের। নগেন সেই সাতসকালে ফিটফাট হয়ে হাড়োয়া থেকে হাসনাবাদ লোকালে চেপে বারাসত ইস্টিশান। তারপর চাঁপাডালি মোড় পায়ে হেঁটে এসে ৭৯ নম্বর বাসে জগদিঘাটায় নেমেছে। সেখানে থেকে প্রায় মাইল দুয়েক ভেতরে বড়া গ্রাম। নগেনের শ্বশুর বাড়ি।

কত বছর আসেনি এখানে নগেন। লক্ষ্মীর অসুখের কথাও জানানো হয়নি এ বাড়িতে। কিভাবে যে বছরগুলো চলে যায়। ফুরসতই মেলে না। লক্ষ্মী অবশ্য নগেনকে যাওয়ার জন্য কতবার তাড়া লাগিয়েছে। নগেন তবু সময় করে উঠতে পারে নি। বিয়ের পরপর কয়েক বছর লক্ষ্মীর বায়না সামলাতে তাকে আসতেই হোত। তাছাড়া নতুন শ্বশুরবাড়ি। বেশ লাগত নগেনের। করুণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এক হাড়ি মিষ্টি কিনে গিলে করা ধুতি পাঞ্জাবী পরে একেবারে ফুলবাবু। দোরগোড়ায় আসতে না আসতেই তিন শালী নগেনের ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবীর খোট ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যেত। একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে শালী। নগেনের কপাল একেবারে তুঙ্গে। সারাদিন গোল হয়ে বসে নগেনের গল্প শুনবে। নগেনও বানিয়ে চুরিয়ে যখন যা মনে আসত বলত। মিনুটা বায়না ধরত মধ্যমগ্রামে রাসের মেলা দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। শালীদের নিয়ে সে কি আনন্দ নগেনের। বলতে নেই পয়সা কড়িও বেমক্কা বেরিয়ে যেত গুচ্ছের। লক্ষ্মী ধমক দিত ঃ তোরা যা লাগিয়েছিস তোর জামাইবাবু আর এমুখো হলে হয়।" নগেন অবশ্য সময় পেলেই আসত। লক্ষ্মীরও বাপের বাড়ি ঘোরা হয়ে যেত। শালীদের ওপর নগেনের বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকবার তো নগেন একা একাই চলে এসেছিল। ঘরদোর সামলে লক্ষ্মীর সব সময় আসার উপায় থাকে না। সংসারের খুটিনাটি হাজারটা কাজ। মাঝে মাঝে লক্ষ্মী টিপ্পনিও কাটত। বউ-এর থেকে দেখছি শালীদের প্রতিই বেশি টান তোমার। মধু আছে নাকি?

নগেন ঠাট্টা করে বলত ঃ মধু না থাকলে ভ্রমর যাবে কেন? গাছেরও খাবো তলারও কুড়োবো, তবে তো মজা।'

—মজা পাইয়ে দেব ভালো করে। তোমার বউয়ের কম কি আছে।

—আরে বাবা বউ-তো আছেই। তা বলে অমন টসটসে শালীদের একটু চেখে দেখব না।

—কে জানে বাবা, তোমার ভাবগতিক ভালো বুঝছি না। দুর্গাটা আবার একটু জামাইবাবুর নেওটা। গীর্জা ফাঁসাও নি তো?

—সে কি আর আমার ধর্মে সইবে।

—আহা-হা আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। পুরুষ মানুষেরা সব পারে।

আসলে দুর্গা লক্ষ্মীর পিঠোপিঠি বলে দুর্গার সঙ্গে নগেনের খুব জমত। সিনেমার গল্পো থেকে শুরু করে পাড়ার কেচ্ছা খেউর নিয়েও হাসাহাসি হোত। নগেন একদিন দুর্গাকে চুমুও খেয়েছিল। সেকথা কি লক্ষ্মীকে বলা যায়! তবে ঐ পর্যন্তই। দুর্গা চেঁচিয়ে বলেছিল ঃ দাঁড়ান, দিদিকে যদি না বলে দিই।' দুর্গা অবশ্য বলে নি। নানান কারণেই নগেন বেশ মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য দুর্গা বলতে ছাড়বে না। 'শালীদের ওপর যদি এতই মায়া তবে এমন ডুমুরের ফুল হয়েছিলেন কেন? নগেন কেন যে ডুমুরের ফুল হয়েছিল সে নগেনই ভালো জানে। আজ একটু নিরুপায় হযেই তাকে আসতে হয়েছে।

দুই

নগেন দেখল ডানদিকের ক্ষেতজমিটায় কতগুলো নতুন বাড়ি উঠেছে। মাঘের বেলা। নগেন তাই বুদ্ধি করে চাদরটা নিয়ে এসেছিল। সন্ধের দিকে ভালোই ঠাণ্ডা লাগবে। চাদরটা সে কাঁধ গলা জড়িয়ে নিল। খুব আমেজে বিড়িতে সুখটান মারছিল আর হাঁটছিলো। হাঁটছিলো আর ভাবছিলো। কতদিন আসা হয়না। ওরা কেমন আছে ভগবান জানে। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল নগেন। ওই যে টালির ছাউনি দেওয়া বাড়িটা—ওটাই তো মনে হয়। টালির ওপর দিয়ে লাউগাছ সাপের মতো ফণা তুলে আছে। একটা কচি লাউ শূন্যে ঝুলে আছে বাদুড়ের মতো। বাঁশের নড়বড়ে ছোট্ট গেটটা বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে বোঝা যায়। বেড়ার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে ছাগলের বাচ্চাটা দিব্যি গাঁদা গাছগুলোকে মুড়িয়ে মুড়িয়ে খাচ্ছে।

বাইরে থেকে মাটির দাওয়াটা দিব্যি দেখা যায়। ওখানে আধময়লা একটা সবজে ফ্রক পরে বসে আছ একটা বাচ্চা কালো মেয়ে। মিনুই হবে বোধাহয়। মিনুকে নগেন খুব ছোট দেখেছিল। কে জানে পাশের বাড়ির অন্য মেয়েও হতে পারে। নগেনের হাতে মিষ্টির হাড়ি নেই। এবার কিছুই আনেনি ওদের জন্য। কেমন একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। বছর কয়েক আগে যেবার পুজোর সময় এসেছিল নগেন তখন ওর হাত ভর্তি জিনিস। শ্বশুরের জন্য একটা কোরা ধুতি, শাশুড়ির জন্য দামী তাঁতের শাড়ী, দুর্গা ও বুলার জন্য সালোয়ার কামিজ, মিনুর জন্য ফ্রক। বিশাল মিষ্টির হাঁড়ি। আসবার পথে আস্ত একটা ইলিশ কিনে এসেছিল। এসব ব্যাপারে নগেনের জুড়ি নেই। বাড়ির সবাই একবাক্যে বলতঃ জামাই হো তো অ্যায়সা। নগেনের মনটা দেখেছ কত বড়, সমুদ্রে মতো। অবশ্য পাশেব বাড়ির পঞ্চানন খুড়ো চোখ উল্টে বলত, নতুন নতুন সব জামাই একটু অদিখ্যেতা দেখায়। অবশ্য গতবার যখন এসেছিল নগেন তো নতুন ছিলো না। পুরনো হয়ে এসেছিল। প্রতিবেশীরা চিরদিনই কারুর ভালো দেখতে পারে না। তা সেবার বাড়ির ভিতর খুশীর বন্যা ছুটিয়ে দিয়েছিল নগেন। সারাটা দিন হুল্লোড় করে কাটিয়েছে। শারীদের নিয়ে 'বিধান' সিনেমা হলে নাইট শো'তে 'দুশমন' দেখে ফিরেছে। পূজোর সপ্তমী বলে কথা। পথে পথে মানুষের উজ্জ্বল চলাফেরা। এই কটা দিন মানুষ যেন চোখে আলোর বাল্ব লাগিয়ে আনন্দে ভেসে যেতে চায়। সকলেরই প্রায় ছুটি। শুধু শ্যালক মহাশয় বিমলের ছুটি নেই। তার তো কাপড়ের বিজনেস। তার জন্যে নগেন এনেছিল একটা অল্প দামী 'লাইটার। তাতেই বিমলের আনন্দ আর দেখে কে। অথচ এই অল্পে খুশি লোকগুলোকে সারা বছর আনন্দে রাখা বিধাতার যেন না পসন্দ্।

মিনু হঠাৎ 'মা জামাইবাবু এসেছে' বলে হাতের শিউলি ফুলগুলো ফেলে দিয়ে নগেনের দিকে এগিয়ে এল। একটু পরে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। নগেনের চিনতে ভুল হোল না শ্বাশুড়ীকে। তিনি বললেন ঃ এতদিনে মনে পড়ল বাবা, লক্ষ্মী আসে নি?'

দরজায় ঢোকার মুখে টালির ছাউনিটা এত নিচু যে নগেনকে বেশ মাথা নুইয়ে ঢুকতে হোল। 'লক্ষ্মীর অসুখ তো লেগেই আছে।' ঘরে ঢোকার মুখে নগেন জবাব দিল। হাতল ভাঙা একটা চেয়ারে বসে নগেন বিড়ি ধরাল। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বুলা ও মিনু। নগেন একপলক ওদের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। বুলার পরনে ছেঁড়া ফ্রক। হাতে কালি ঝুলি। কয়লা ভাঙছিল বোধহয়। দুর্গা পুজো দিচ্ছিল। পুজো শেষ করে বুলা, মীনু ও নগেনকে প্রসাদ দিল। নগেন বাতাসাটা মুখে দিতে গিয়ে দুর্গার মুখের ভিতর এক করুণ অন্ধকার টের পেল। সে আবিষ্কার করতে চাইছিলো কয়েক বছর আগের শালীদের মুখগুলো। তাদের সেই লাবণ্য আজকের মুখগুলোতে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। দারিদ্রের ধূসরতা মাখানো। শ্বাশুড়ী এই ক' বছরেই অনেক বুড়িয়ে গেছেন। সাদা একটা ছেঁড়া থান পরণে। গালের মাংস ঝরে গেছে। ঘরটা কেমন শ্মশানপুরীর মতো লাগছে নগেনের। এই তো বয়েস এদের। অথচ কোন চপলতা নেই। হাসির রেখাটুকু পর্যন্ত বিলীন। সেই আনন্দের উত্তাল ঢেউ যেন কারা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। নগেন ভাবল এই ক' বছরেই পৃথিবীটা কেমন পাল্টে গেছে।

তিন

নগেনকে নিয়ে বসানো হোল ভেতর ঘরে ময়লা বিছানার ওপর। ছেঁড়া ফাটা এক চাদর বিছানো। বিছানার এককোণে বসলেন কুসুমবালা। নগেন জিজ্ঞেস করতে পারল না কেমন আছেন? সেটা উপহাসের মত শোনাতো। কুসুমবালা হঠাৎ বললেন, লক্ষ্মীকে ডাক্তার দেখাচ্ছো না?

—হ্যাঁ, পাশের বাড়ির নির্মল ডাক্তার দেখছে। দেখি কি হয়।

—ফল কিছু হচ্ছে?

—না, তেমন কিছুই তো বুঝছি না। দু'দিন ভালো থাকে আবার যেই সেই। ওর চেহারার দিকে তাকানো যায় না। ভালো মন্দ খাওয়াতে পারছি কই। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখাব তেমন সামর্থও তো নেই।

কুসুমবালা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। 'মেয়েটা কবে যে ভালো হয়ে উঠবে। আমার কপালটাই পোড়া। মেয়েদের একটু সুখে থাকতে দেখব—সে কপাল করে কি এসেছি।

নগেনের হঠাৎ চোখ গেল দেয়ালে টাঙানো ব্রজমাধবের ছবির দিকে। তাতে চন্দনের ফোঁটা। নগেনের দিকেই যেন ভাঙা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে তার শ্বশুর। একটু অন্যধরনের মানুষ ছিলেন। কুসুমবালা কি তাকে কম গালমন্দ করেছে। ঘরে এক মিনিট তিষ্টতে দিত না। শ্বাশুড়ির মুখে অনর্গল মুখখিচুনি 'আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে দিল লোকটা। একেবারে কচ্ছপের প্রাণ, মরেও তো না।' এইসব অতি ভালোমানুষের কপালে ভালবাসা না জুটুক ভুড়ি ভুড়ি গালমন্দ জোটে। এরা কখনো কিছু পায়না। অথচ সারাজীবন খেটে সংসারের হাঁড়িকাঠে শহীদ হয়ে যায়। অথচ এখন কুসুমবালা স্বর্গত স্বামীর

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছছেন। 'লোকটা আমায় পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। কত মুখই না করেছি। টু শব্দ করত না। কত ভালো মানুষ ছিল।' এর উত্তরে নগেন কি আর বলবে। শুধু মনে মনে বলল, বড় দেরিতে বুঝলেন। ক' দিন আগে বুঝলে লোকটা ক' দিন শান্তি পেত। লোকটারও কপাল। লণ্ড্রীর দোকানের কাজটা হঠাৎ চলে গেল। বই বাঁধাইয়ের দোকানে যাও একটা কাজ জুটলো চোখের গোলমালে সেই কাজটাও গেল। কুসুমবালাকেই তো সংসারের সবটা দেখতে হয়। সুতরাং তার আর দোষ কি। অভাবে সেও কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে।

দুর্গা চা এনে দিল। নগেন লক্ষ্য করল দুর্গার মুখটা কেমন পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। কেমন একটা বিষাদের ছায়া। চোখের ভেতর লুকিয়ে আছে স্বপ্নভাঙ্গার ব্যথা। সংসারের লোল ঝরা জিভের নিচে কেমন ডানকাটা পাখি মতো ছটফটাচ্ছে।

কুসুমবালার কাছেই নগেন শুনেছে দুর্গার বিয়ের কথা। এক কাঠের ব্যবসায়ীর সাথে বিয়ে হয়ে ছিল দুর্গার। বছর দুয়েক ঘুরতে না ঘুরতেই আর একটা বিয়ে করে ফেলল মনমোহন। দুর্গার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মরার মতো শুয়ে শুয়ে দিনতার কাঁদত। আর সতীনের সংসারে ঝি-এর মতো খাটত। দুর্গার অধিকার ফলাতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। প্রচণ্ড মারধোর খেয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচল। নতুবা দুর্গাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। এম.এল.-এর সাথে মনমোহনের ওঠাবসা ছিল। তার টিকির নাগাল পাবে কে? দুর্গার জন্যে নগেনের ভেতরটা হু হু করতে লাগল। কিন্তু নগেনের তো সাধ্যি নেই দুর্গার মুখে হাসি ফোটানোর। দুর্গার মুখের ওপর যে জমাট অন্ধকার তার কোনো সুরাহা হবে না। নগেন বড় জোর অনুকম্পা দেখাতে পারে।

হঠাৎ দেয়াল থেকে টিকটিকি ডেকে উঠল।

চার

নগেন আচ্ছন্নের মতো বসেছিল। সে খেয়াল করেনি কুসুমবালা কখন উঠে গেছে। একলা ঘরে বসে বসে নগেন ভাবছিল দুর্গার পরিণতি। দূর থেকে ভেসে আসছিল ঢাকের বাজনা। দশমীর পুজোর শেষ। চারপাশে বিসর্জনের আয়োজন। কান্নার মতো শোনাচ্ছে সেই বাজনা। রোদের তেজ কমে এসেছে বাইরে। হাওয়ায় হাওয়ায় বেড়াচ্ছে শোকবার্তা। প্রতিমার চোখে জল। কেউ কি দেখতে পাচ্ছে সেই দাহ! সেই অন্তর্বেদনা।

দুর্গার কথায় নগেনের ঘোর কাটল। 'পা টা একটু ওঠান নগেন দা ঘরটা মুছে নিই।' নগেন পা তুলে বসল। দুর্গা ভেজা কাপড় দিয়ে মাটির মেঝেটা কাদা কাদা করে মুছে নিল। নগেন দুর্গার মাথায় আলতো হাত রাখলো। দুর্গার উদগত অশ্রু বেরিয়ে পড়ল সহসা। যেন এই টুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। বলল—আমার জন্য দুঃখ করবেন না। নিন্ স্নান সেরে নিন। বেলা পড়ে এল।

নগেন বিছানায় পা টা ছড়িয়ে দিয়ে বলল—স্নান সেরেই বেরিয়েছি'। কি যেন ভাবলো দু মুহূর্ত, তারপর বলল, বিমল কে তো দেখছি না। একথার কোন উত্তর পেল না নগেন। দুর্গা বাঁশের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল হটাৎ ভিতরে চলে গেল। নগেন বুঝল দাদার প্রসঙ্গ এসে পড়াতে দুর্গা বিব্রত বোধ

করছিল। এর নেপথ্যে হয়তো কোন করুণ ইতিহাস আছে।

এইসময় বুলা হাঠ থেকে ফিরল। বুঝল নগেনের জন্য এই আয়োজন। নিজেকে কিছুটা অপরাধী মনে হল তার। সে আঁচ করতে পেরেছে তাকে খাওয়ানোর জন্যে এদের আজ বিপদে পড়তে হয়েছে। মিনুর মুখেই সে শুনেছে তারা অনেক দিন মাছের মুখ দেখে না। ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট নিত্যকার খাবার। বেশির ভাগ দিনই রুটি আর পেঁপে চচ্চড়ি। সে টের পেয়েছিল লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে মাছ কেনার টাকা দেওয়া হয়েছে। অথচ সব বুঝলেও নগেনের করার কিছুই নেই। তাঁর পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে।

নগেন চাদরটা ভালো ভাবে জড়িয়ে বসল। অল্প অল্প শীত লাগছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল বাইরে। একটা রোগা পটকা গরু হাম্বা হাম্বা ডেকে চলেছে। খুটিতে গরুটা বাঁধা। সামনেই ছোট এক চিলতে জমিতে সর্ষের ক্ষেত। কিছু মুলো গাছ। নগেন দেখলো। বুলা নিচু হয়ে মুলো তুলছে। জামার ফাঁক দিয়ে তার পুরুষ্টু স্তন দেখা যাচ্ছে। এত দারিদ্রের মধ্যেও কত সতেজ। জল হাওয়া ছাড়াই তরতর করে বেড়ে চলেছে যৌবন। ছেঁড়া ফাটা জামার ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে স্তনের জ্যোৎস্না এক অদ্ভুত প্রকৃতি। এ প্রকৃতি রক্ষা করবে কে? এ বাড়ির কুকুরটা লেজ গুটিয়ে লকলকে জিভ বার করে দলা পাকিয়ে শুয়ে আচে চৌকাঠের বাইরে।

হঠাৎ মিনুর গলা শোনা গেল। 'জামাইবাবু দেখবে এসে আমার পুতুলের বিয়ে, তোমার নিমন্ত্রণ।'

একরত্তি মেয়ে মিনুটা জগৎ সংসারের কিছুই বোঝে না। শিউলি ফুল নিয়ে পুতুলের বিয়ে দিতেই ব্যস্ত। অথচ তার দিদিদের বিয়ে দিতে গেলে মাথার ঘাম পায়ে পড়তো। বুলা মদন মিস্তিরের ছেলেটাকে দিব্যি পটিয়ে ছিল। বছর খানেক আগানে বাগানে ঘোরাঘুরিও করেছে। কুসুমবালা সবই জানতো। কিছু বলেনি। ভেবেছিল যদি মেয়েটা এভাবে ভালোয় ভালোয় কাঁধ থেকে নেমে যায়, রক্ষে। কিন্তু বিয়ের কথা পাড়তেই একেবারে নগদ দশ হাজার চেয়ে বসল। ব্যাস, ঘরের মেয়ে ঘরে। দিন রাত মায়ের গালমন্দ খাচ্ছে। আর দুবেলা মুখে হাত চাপা দিয়ে ভসভস করে কাঁদছে।

মিনু এইসব ছুট ঝামেলায় নেই। সে পুতুলের বিয়ে নিয়ে মশগুল। দুর্গা, বুলারাও যদি পুতুল হতো তো বেঁচে যেত।

নগেন মনে মনে বলল, তুই এমন ছোটই থেকে যারে মিনু। দিদিদের মতো বড় হোস না। বড় হলেই দেখবি কে যেন তোর নির্মল হাসিটুকু কেড়ে নিয়েছে। সংসারে সরলবাস্তবটা থেকে যতদিন বাইরে থাকবি, ততদিন মুক্তি।

ছয়

মিনুর একটা ছেঁড়া ফ্রক দুভাঁজ করে আসন পেতে দিল দুর্গা। নগেন দেখল বেলা গড়িয়েছে। সজনে গাছটার ডালে দুচারটে কাক অলুক্ষণে ডাক শুরু করে দিয়েছে। নগেন হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল। দেখল এক বাটিতেই চারা পোনার ঝোল। ডাল আর মুলো চচ্চড়ি দিয়ে ঝটপট খেয়ে মাছটা

থালায় ঢেলে নিল নগেন। হঠাৎ চোখ পড়তেই সে দেখল দুর্গা, বুলা, মিনুরা তাকে ঘিরে বসে তাঁর খাওয়া দেখছে। কুসুমবালা একথা সেকথার পর বিমলের প্রসঙ্গ তুললেন।

—বিমলটার কিযে ভিমরতী হল, পাশের বাড়ির বউটাকে নিয়ে ভেগে পড়ল। ছি ! ছি! মুখ দেখানো দায়। দুটো বাচ্চা সমেত বউটাকে বিয়ে করেছে। সংসারটার কথা একবার ভাবল না। কাপড়ের বিজনেসটা ওর ভালই চলছিল। সংসারের একমাত্র সম্বল চলে গেল।

নগেন চোখ তুলে তাকাল কুসুমবালার দিকে। দুচোখ ভরা অসহায়তা ঝুলে আছে কুসুমবালার কুঁচকে যাওয়ার মুখে চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে। নগেন ভাবল, বিমলটা কেমন স্বার্থপর হয়ে গেল। মা এবং তিন তিনটি বোনকে এভাবে ফেলে গেল কার ভরসায়। নগেন আর তলিয়ে ভাবতে চাইছিলো না। সে বেশ বুঝতে পারছিল এই সংসারটার ভিতরে এক গভীর কালো অন্ধকার জমে আছে। এই কটা প্রাণী যেন ক্রমশঃ দুঃখের অনলে ডুবে যাচ্ছে। তার সাধ্যি নেই সেই অন্ধকার থেকে তাদের টেনে তোলার।

সকলেই নগেনের খাওয়া দেখছিলো। নগেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাছের কাঁটা বেছে বেছে সে পরমতৃপ্তি খেয়ে চলেছে। মিনুটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। নগেনের থালার দিকে। ঠিক পাশের বেড়ালটার মতো। মাছের টুকরোটা তার চোখের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখের সামনে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে নগেনের পাশে। মাছ ভাতের স্বাদ টুকুও বোধহয় এরা মনে করতে পারে না আর। এরপর বিছানায় শুয়ে স্বপ্নের ভেতর মাছ ভাত খাবে। ঢেকুর তুলবে। তারপর ঘুমে ঢুলে পড়বে।

মিনু হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'জামাইবাবু, এট্টু মাছ ভেঙে দাও না।' হঠাৎ চকিতে কুসুমবালা মেয়ের গালে ঠাস করে চড় কসিয়ে দিলেন।

—কতদিন বলেছি, কেউ খাবার সময় হ্যাংলামো করতে নেই।'

মিনু কাঁদতে কাঁদতে চোখ ডলতে ডলতে ভেতর ঘরে চলে গেল। নগেন কর্ণপাত করল না। এক মনে খেয়ে চলল। খেয়েদেয়ে বড় করে ঢেকুর তুলল নগেন। দুর্গা জলের জগ এগিয়ে দিল।

—দিদিকে ভাল কোন ডাক্তার দেখানো যায় না?

—'পয়সা কোথায়?' নির্লিপ্তভাবে বলল নগেন।

—রান্নাবান্না কে করে দেয়?

—নিজেই যাহোক করে সামলে নিই। কে করবে বল।

—এ সময় আমিও তো দিদির দেখাশোনা করতে পারি।

—লোকজন বদনাম ছড়াবে। তাতে তোমারই দুর্নাম হবে।

নগেন আর কথা বাড়ালো না। বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কুসুমবালা মাথার কাছে এসে বসলেন।

—একটু ভাত ঘুম দিয়ে নাও। অতটা পথ যেতে হবে সন্ধ্যে নাগাদ বেরিয়ে পড়ো। নগেন মাথা নাড়ল। দুর্গা এসে হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। নগেন আর চোখে দেখল দুর্গাকে। দুর্গার জন্য ভাবনা হয়। মেয়েটা সংসারটাই পেলো না। অথচ সংসারের পক্ষে ওর কোন বিকল্প হয় না। দুর্গার হাতের রান্না মাঝের ঝোল এখন নগেনের মুখে লেগে আছে। এগুণের কে কদর করবে। মানুষ যে কি

চায় কে জানে। দুর্গার এমন শরীর হাত দিলেই দেহে জোয়ার এসে যায়। চোখের পল্লবে দিঘীর নম্রতা। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। এমন রূপ যেন কচুরীপানার ভেতর বিমূর্ত পদ্ম। মনমোহন একটা আকাট মুর্খ। এই মানবীর মর্যাদা দিতে পারল না। নগেন দেখেছে। কত সব মনমোহনের হাতে দেবীর বিসর্জন হতে। দুর্গাকে দেখলে নগেনের মনে পড়ে লক্ষ্মীর আগের চেহারা। যেন লক্ষ্মী বসে বসে তাকে হাওয়া করছে। বিয়ের পর পর যেমন করত। নগেন বেশ বুঝতে পারে লক্ষ্মীকে আর বাঁচানো যাবে না। নগেন ভীষণ একা হয়ে যাবে। লক্ষ্মীহীন তার সংসার তাঁকে ভুতের মতো দেখাবে। নগেনের অসহায়তা কেউ কি টের পাচ্ছে। দুর্গা পেয়েছে বোধহয়। তা না হলে সে যেতে চেয়েছিল কেন? নাকি সে টের পেয়েছে তাঁর নিজের পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে হয়ে আসছে। যত মুখ্যই হোক মেয়েরা ঠিক বুঝে যায় কোন খুঁটি ধরে সে যুঝতে পারবে। এই দূরদর্শীতা যেকোন মেয়েরই সহজাত। লক্ষ্মীও এই খুঁটি ধরেই বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কি বাঁচতে পারলো। এখানেই ভাগ্যকে মানতে হয়।

কুসুমবালা একথা সে কথার ছলে এক সময় বলে বসলেন, 'ভাবছি, তোমার সাথে ক'দিনের জন্য মিনুটাকে পাঠিয়ে দেব। দিদির কাছে থেকে আসুক ক' দিন। দেখছই তো ভালো করে দুটো খেতে দিতে পারি না। আমরা যেমন তেমন, ওইটুকু মেয়েকে কি পারে এত কষ্ট সহ্য করতে। দিদির ওখানে তবু ভালো মন্দ কিছু খেতে পারবে।'

নগেন সে কথার উত্তর দিল না। বলল, 'আচ্ছা মা, উঠোনের সেই পেঁপে গাছটা দেখছি না। খুব ফল দিত গাছটা, কি হল সেটা?'

—না বাবা পরের দিকে আর তেমন ফল দিত না, তাই জঙ্গল বাড়িয়ে কি লাভ। কেটেই ফেললাম। যাকগে, যা বলেছিলাম 'মীনুটাকে তুমি নিও যাও, এক হপ্তা বাদে দিও যেও।'

নগেন উঠে বসে বিড়ি টানছিলো। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, 'বিমল এটা কি করল? সংসারটাকে পথে বসিয়ে গেল। আমরাও খুব অসুবিধের মধ্যে ছিলাম। কোনো খোঁজ খবর নিতে পারিনি।' নগেন লক্ষ্য করল কুসুমবালা কেন গম্ভীর হয়ে গেলেন সহসা। তবে কি বিমলের ব্যাপারটা জানায়নি বড় মেয়ের উপর অভিমান করে? হতেও পারে। সবাই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কেউ কারো বিপদে থাকছে না। যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সব মানুষ তাই আজকাল বড় একা।

নগেনের চোখটা লেগে এসেছিল। গন্ধের আবছা অন্ধকার ঘরময়। দুর্গা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়েছে। নগেন ঝটপট উঠে তৈরী হয়ে নিল। কুসুমবালা মিনুকে একটা কাচা ফ্রক পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, 'মিনুকে সাজিয়ে দিয়েছি ঘুরে আসুক দিদির বাড়ী থেকে।'

নগেন ঘুরে তাকালো কুসুমবালার চোখের দিকে। তার চোখ থেকে এক ধরনের বিপন্নতা নেমে আসছে। অদ্ভুত করুণা হচ্ছিল এই বৃদ্ধার জন্যে। সে যেন এক ভিখারিনীকে দেখছে চোখের সামনে। 'মেয়েটাকে দুটো ভালো মন্দ খেতে দেবে বাবা।' এও এক ধরনের ভিক্ষে। নগনের চোখে কুসুমবালার দেহটা আকাল পীড়ত এক বুভুক্ষু বৃদ্ধার স্ক্যালিটন। সে দেখল ভারতবর্ষের এক দরিদ্র পরিবারের মা মেয়েকে ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্য কেমন নির্লজ্জের মতো ভিক্ষে চাইছে তার জামাইয়ের কাছে। ঘরের

চারটি অসহায় প্রাণী কি করুণ আর যন্ত্রণাকাতর চোখে তাকিয়ে আছে এক পরিত্রাতার দিকে। সে নগেন। মিনুর বালিকা মুখে বয়সের ছাপ ফুটে উঠছে। সে যেন হঠাৎ রাতারাতি কত বড় হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে কখন ফ্রকটা খুলে ফেলেছে। ঘরের কোণে পুতুল নিয়ে বসে গেছে।

নগেন তাকাল, কুসুমবালা এই ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তবু জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি। অসীম সহনশীলতা নিয়ে ভাঙা কুঠির আগলে রাখছেন। যদিও সে দেখতে পাচ্ছে তার দুপাশে দুই বিপন্ন যুবতী অগ্নীকুণ্ডে জ্বলছে। করুণ দাহ নিয়ে পুড়ে যাচ্ছে দুর্গা ও বুলার ভবিষ্যত। এই বৃদ্ধা কে?

নগেন হঠাৎ নীচু গলায় বলল, 'মা, মিনুকে আমি নিয়ে যেতে পারছি না। কুসুমবালার মুখ থেকে কি শেষ আলো টুকু নিভে গেল? অন্ধকারে ডুবে গেল চারপাশ? কটি প্রাণী যেন বারান্দায় কঙ্কালের মতো দাড়িয়ে থাকল অন্ধকারের প্রতীক হয়ে। আশাভঙ্গের বেদনায় মুখগুলো ফ্যাকাসে হয়ে ঝুলে থাকলো শূন্যে।

নগেন খুব সন্তর্পণে গা থেকে চাদরটা খুলে ফেলতেই শতছিদ্র এক ময়লা পাঞ্জাবী বেরিয়ে পড়ল সবার চোখের সমানে। মনে হয় কত কালে এক দুর্গন্ধময় আস্তাকুঁড়ের পোশাক। কুসুমবালা আঁতকে উঠলেন নগেনের এই বেশ দেখে। দুর্গা ও বুলার ছায়ামূর্তি অন্ধকারে কাঁপতে লাগল।

নগেন মৃদুস্বরে বলল, 'আসি মা।' বলে সে আবার ধূসর রঙের চাদর খানা দিব্যি গায়ে জড়িয়ে এক অন্ধকার থেকে আর এক গাঢ় অন্ধকারের দিকে পা বাড়াল।

পিকাসোর ছবি ও একজন যুবকের মৃত্যু

আশিস ভট্টাচার্য

অজয়ের মৃত্যু সংবাদটা একটু দেরীতেই পেল শঙ্কর। চিঠিতে পিন কোড নাম্বারটায় একটু ভুল করে ফেলেছিল আজয়ের মা। অফিস থেকে ফেরার পর টেবিলে মুখবন্ধ খামটা দেখে শঙ্কর বুঝতেই পারেনি তার মধ্যে ওরকম একটা দুঃসংবাদ লুকিয়ে আছে। পরদিন সকালে মাকে অফিসে একটা ফোন করতে বলে দুর্গাপুরে অজয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় শঙ্কর। ট্রেনে যেতে যেতে পুরানো দিনের কিছু স্মৃতি ভেসে ওঠে।

সিনেমা দেখার নাম করে শঙ্করকে শহীদ মিনারের মিটিং-এ একবার এনেছিল অজয়। 'সিনেমা দেখবো, তা এখানে এলি যে? শঙ্কর অবাক হয়। অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে 'মিটিং এর কথা বললে তুই আসতিস না। তোর রাজনৈতিক সচেতনতার দরকার। রাজনীতি না করলে মানুষের পরিপূর্ণ সচেতনতা জন্মায় না। সমর্থন করিস না করিস আমাদের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী— এগুলো শুনলে তোর ভাল লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস।' শঙ্কর একটু হাসে। অজয় যে একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত সেটা শঙ্করের অজানা ছিল না। শঙ্কর অবশ্য রাজনীতিতে তেমনভাবে জড়িয়ে না পড়লেও অজয়ের সঙ্গে কখনও কখনও ওদের মিটিং এ যেত। দলটা খারাপ মনে হত না তার। সেদিনও দু'বন্ধু মাঠে খবর কাগজ পেতে বসে বাদাম চিবোতে চিবোতে পুরো মিটিংটা শুনেছে। অনেক কথাই ভাল বোঝে নি শঙ্কর। আন্তর্জাতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, গণতন্ত্র, নির্বাচন, বিপ্লব, সমাজতন্ত্র এইসব টুকরো টুকরো শব্দগুলোই শুধু মনে রেখেছে। পরে অজয়ের সঙ্গে এ নিয়ে প্রচুর তর্ক-বির্তক হয়েছে।

ছুটন্ত ট্রেনে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে শঙ্করের। প্রায় বছর কুড়ি-বাইশ আগের কথা। উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হবার পর প্রথম যে ছেলেটির সঙ্গে তার পরিচয় হয় সেই অজয় পরবর্তীকালে তার প্রিয়বন্ধু হয়ে ওঠে। 'আপনি কি নতুন?' 'হ্যাঁ।' 'ওয়েলকাম, আমার নাম অজয়, অজয় দে।' 'আমার নাম শঙ্কর মুখার্জী।' দুজনে হাত মেলায়। সেদিনের ক্ষণিক আলাপ ক্রমশঃ এতটাই গভীর হৃদ্যতায় পরিণত হয় যে, রোজ কয়েক ঘন্টা একে অপরের সঙ্গে না কাটালে চলত না।

ছোটবেলা থেকেই অজয়ের নাটকের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। নিজের লেখা পরিচালনা এমনকি অভিনয়ও করতো। স্কুল জীবনের এসব ঘটনা অজয়ের মুখেই শুনেছে শঙ্কর। কলেজ জীবনেও নিজের লেখা বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করে ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যে অনেক তারিফ কুড়িয়েছে অজয়। শঙ্কর ওর লেখা নাটকে দু-একবার অভিনয়ও করেছে। অজয়ের 'লড়াই' নাটকটা দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল প্রচুর প্রাইজ পেয়েছিল। এলাকায় সবাই ওর প্রশংসা করতো, অনেকেই বলাবলি করতো অজয় একদিন ভাল নাট্যকার হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক; হয় আর এক। 'লড়াই' নাটকটার পর অজয়ের জীবনের গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। আসলে জীবনের কথ এতই বাঁকা, কখন কে যে কোন্‌দিকে যাবে বলা খুব

মুশকিল। অজয়ের জীবনের গতিও হঠাৎ ভিন্ন খাতে বইতে লাগল।

নাটকের সুবাদেই অজয়ের বেলগাছিয়ার মন্দিরার সাথে সম্পর্ক গভীরতর হয়। একাধারে চৌখস রাজনৈতিক বক্তা, অন্যদিকে আদর্শ অভিনেতা ও নির্দেশক অজয়ের সাথে মন্দিরার সম্পর্কটা জমে উঠতে বেশি সময় লাগেনি।

অজয়-মন্দিরার নাটক ছাড়াও আর এক ব্যাপারে মিল ছিল। দুজনেই পাবলো পিকাসোর ভক্ত। পিকাসোর ধ্বংসের ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে অজয় বসার ঘরে রেখেছিল।

শঙ্করের সঙ্গে ইদানিং আর তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয়না আজয়ের। রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে। যে নাটক ওর প্রাণ ছিল তার সঙ্গেও আর সম্পর্ক নেই বললেই চলে। দু-একটা টিউশানি যাও বা করত, সেখানেও হাজিরা খুবই অনিয়মিত। শঙ্করের দেখে দেওয়া টিউশানি বাড়ি থেকে অজয়ের অনিয়মিত হাজিরায় অভিযোগ আসতে লাগল। শঙ্কর পাড়ার দু-একজনের মুখে শুনলো অজয় নাকি মদ খেতে শুরু করেছে। বাড়িতে ভীষণ চেঁচামেচি করে অনেক রাত অব্দি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় শঙ্কর অজয়ের বাড়িতে যায়। অজয় শুয়ে ছিল। 'কিরে। কি খবর?' 'এতদিন পরে তোর খবর নেবার সময় হল?' শুয়ে শুয়েই উত্তর দেয় অজয়। অজয়ের মুখ থেকে মদের গন্ধ পায় শঙ্কর। 'আমার আর খবর!' ব্যঙ্গ করে অজয়। 'তোরাই বেশ আছিস। আমার মত বেকারের কথা আর নাই বা মনে রাখলি।' আজয়ের বক্রোক্তি শঙ্করকে লক্ষ্য করে। শঙ্কর প্রতি আক্রমণ না করে বলে, 'এখনই এত হতাশ হচ্ছিস কেন? ডি পি এল -এ একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলি, কি হল?' 'রেজাল্ট বেরোয়নি।' নির্লিপ্ত উত্তর অজয়ের। কথায় কথায় রাত বাড়ে। শঙ্কর বাড়ি যাবার জ্য উঠে পড়ে। হঠাৎ অজয়ের মা ঢোকে। ধরা গলায় বলে, 'শঙ্কর তোমার বন্ধুর মধ্যে নতুন কিছু দেখলে? ভাবতে পারো এত বড় বংশের মান সম্মান কি ভাবে নষ্ট করছে ও। সবচেয়ে বড় কথা নিজের জীবনটাই নিজে নষ্ট করে দিচ্ছে, 'মা চুপ করবে।' অজয় ধমক দেয়। শঙ্কর খুব অস্বস্তি বোধ করে। 'হ্যাঁ তা তো করবই। ছাই পাঁশগুলো গিলে আসবে আবার মেজাজ দেখাবে।' পরিস্থিতি উত্তোরোত্তর ঘোরাল হতে দেখে শঙ্কর অজয়কে সহানুভূতির গলায় বলে, 'দ্যাখ অজয়, তোর কত নাম ছিল। তুই না একদিন আমায় বলেছিলি, রাজনীতি মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ সচেতনতা আনে। তার তোর এই মদ্যপানও কি তোর সচেতনতারই বহিঃপ্রকাশ! কেন তুই নিজেকে এভাবে নষ্ট করছিস বলতো'! অজয় হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে— 'ভালমন্দ তোর চেয়ে আমি কিছু কম বুঝি ভাবিস? প্লিজ ডোন্ট এ্যাডভাইস্ মি। কেন ড্রিঙ্ক করি জানতে চাইছিস, এইতো? মদ খেয়ে আমি ভীষণ আনন্দ পাই। কোন দুঃখ ভোলার জন্য খাইনা। কোন আনন্দকে মনে রাখার জন্যও নয়। মদ খেলে নেশা হয়, তাই খাই। ব্যস্। আর কিছু শুনবি? যা বাড়ি যা। তোর সংসার আছে। আমার তো ওসব ঝক্কি নেই। আমি একা। আমার কথা কেউ ভাবে না। আমারও কারুর কথা ভাবার প্রয়োজন নেই।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাতে থাকে অজয়। ওর কথার ধরণ দেখে শঙ্কর অবাক হয়ে যায়। এ কোন্ অজয়? কিছু না বলে ধীরে ধীরে বাইরে আসে শঙ্কর। কথায় কথায় বেশ রাত হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালায়। সারারাত ঘুমুতে পারে না শঙ্কর। অজয়ের উপর রাগ-দুঃখ-অভিমান মিলিয়ে একটা প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করে সে। মাসখানের পরে একদিন অজয়ের মায়ে সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে যায়

শঙ্করের। 'মাসীমা ভাল আছেন?' শঙ্কর প্রণাম করে। 'হ্যাঁ বাবা, বেঁচে থাকো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক। অজয়ের কথায় কিছু মনে কোরনা বাবা। ও আর মানুষ নেই। বাড়ি ফেরার ঠিক নেই। রাত বিরেতে ঐ অবস্থার দু-একজনকে বাড়িতেও নিয়ে আসে জানো? সারারাত চেঁচামেচি করে। কি বলবো বাবা, সবই আমার কপাল।' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আশালতার। শঙ্কর নিরুত্তর। আশালতা বলে—'হাল ছেড়ো না। দেখ তোমরা অন্ততঃ ওর কিছু পরিবর্তন করতে পারো কিনা।' 'চেষ্টা করবো মাসীমা'— উত্তর দেয় শঙ্কর। তারপর আর অজয়দের বাড়ি যায়নি। রাস্তায় অজয়ের মুখোমুখি হয়েছে কখনও সখনও। কিন্তু গাছ, পাখি, আকাশ, মাটি দেখতে দেখতে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, পাছে অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

ইতিমধ্যে অজয় ডি পি এল-এ চাকরী পেয়েছে। চাকরী পাওয়ার পর কিছুদিন নাকি মদ খাওয়া ছেড়েছিল। মন্দিরাকেই বিয়ে করেছে। ওদের একটা মেয়েও হয়েছে। কিন্তু তারপর আবার পূর্বের অভ্যাসে ফিরে যায় অজয়।

দূর্গাপুর স্টেশন এসে যাওয়াতে সম্বিত ফেরে শঙ্করের। তাড়াতাড়ি স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা ধরে। শঙ্করকে দেখে আশালতা ডুকরে কেঁদে ওঠে। শঙ্কর কিছু বলতে না পেরে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। বাচ্চা মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মন্দিরাও কাঁদতে থাকে। 'কি হয়েছিল অজয়ের?' বেশ কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর জিজ্ঞেস করে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আশালতা বলে 'ডাক্তার মদ ছুঁতে বারণ করেছিল জানো; শুনতো-তো না-ই-ই উল্টে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল আজকাল। শেষ ছ-মাস ও 'লিভার ক্যান্সারে ভুগছিল।' কান্না জড়িত কণ্ঠ আশালতার।

শঙ্কর মন্দিরাকে অজয়ের মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ জানতে চায়। অজয়ের মনের কোন শূন্যতা আবিস্কার করতে পেরেছিল কিনা। বিয়ের পর মন্দিরা হঠাৎই যেন তার চিন্তার সব তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে। নিপাট গৃহবধূ হয়ে ওঠায় কোন মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ছিলনা মন্দিরার।

— আমি কি বলবো বলুন তো শঙ্করদা?

— তুমি অন্ততঃ ওর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা, ওর কথাবার্তার যদি কিছু বলো।

— ওসব বলে এখন-আর কি লাভ? আপনার বন্ধু কি আর ফিরে আসবে?

— মন্দিরা, আমি অজয়ের পোষ্টমর্টেম করতে চাই।

— কি লাভ শঙ্করদা?

— আমি তো কিছু নতুন তথ্য পেতে পারি। ওর স্খলনের উৎসমূল আমার মধ্যেও তো জন্ম নিতে পারে।

— ওর মধ্যে এক তীব্র হতাশা কাজ করতো। ওর প্রিয় রাজনীতি, নাটক সর্বত্রই স্বার্থান্বেষীদের ভীড় ওকে ভীষণ ভাবাতো।

— তুমি কি করে বুঝলে?

— ও প্রায়ই বলতো এদেশে কিস্‌সু হবে না। সব ধান্দাবাজ। বিপ্লব, সংস্কৃতি এগুলো সব

ধান্দাবাজদের আখড়া।

— তুমি বোঝাওনি কেন?

— আপানার বন্ধুকে বোঝানোর ক্ষমতা আমার ছিলনা শঙ্করদা।

— আসলে ও একজন আদর্শবাদী। আদর্শের স্খলন ওকে পীড়া দিত। যার পরিণতিতেই...

চার বছরের দোলন কেঁদে উঠল। 'মা রোজ রোজ আলুসেদ্ধ ভাল লাগে না।' —'ছাই খাও।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মন্দিরা।

শঙ্কর নিশ্চুপ। দেওয়ালে টাঙ্গানো পিকাসোর ধ্বংসের ছবিটার দিকে তাকিয়ে।

জীবন মৃত্যু

আনন্দী বসু

রাসেল স্ট্রীটের এই দশতলার ওপর থেকে, বাইরের কলকাতাকে স্বর্গের মত দেখায়। এখানে আমি সর্বময়ী ঈশ্বরী।

হেসে ফেলি। তা-ই বটে। নিজেকে বলি, কোথায় আমার ঈশ্বর? ঈশ্বরও কি আমার মত ঘুমহীন?

আমার হাতের কাছে ফ্রয়েড, শেক্স পীয়র, কম্প্যুটর গ্রাফিকস্, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, গীতবিতানের একটা খন্ড আর তার দেড় ইঞ্চি নিচে কাঠের হাতলে টান মারলেই, আমার পরম আকাঙ্ক্ষিত -- ঘুম!

টেবিল থেকে ফাঁকা গ্লাসটা তুলে নিই। জলের বোতলটা গ্লাসের ওপর কাত করতেই, ওটা আমার মন হয়ে যায়। একটা কাচের শরীরের ভেতর, প্রচন্ড আবেগের সমুদ্র, যেন ক্রমশঃ বাড়তে থাকা কষ্টের ঝড়ে টর্নেডো হয়ে যায় ---- সমুদ্রের জলে শীভাস রীগাল-এর গন্ধ, বীয়ারের তেতো স্বাদ ---- তেষ্টা মেটে না, জীবন বিস্বাদ হয়ে যায় ---- তুমুল ঝড়ে ওলট-পালট হয়ে যেতে থাকে সব, আছড়ে পড়তে থাকেএকটার পর একটা ছবি।

স্মৃতির ঘূর্ণিতে ভেঙে যাওয়া দামী হুইস্কির বোতলের কাচ, আমার পাঁচবছর বয়সী হাতের নরম তালু কেটে ঢুকে যায়। জন্মদিনের নিষ্পাপ, আকাশী রঙের ওপর শুকিয়ে যায় রক্তের ছোপ!

মায়ের গলা রেকর্ডের মত বেজে চলে ---- 'ইউ বিচ্! কে ওখানে ওকে ঢুকতে দিয়েছে?'

লজ্জায় কুঁকড়ে যাওয়া একটা ছোট্ট শরীরের ওপর, বাবার লাল চোখ স্থির। উপেক্ষায় আর অনাদরের নেশায়, তখন পৃথিবী পাক খেতে থাকে, টলতে থাকে, দুলতে থাকে একটা অনিয়শ্চতার নৌকো।

এ সময় আশ্বাস ছিল। সরিতা দিদির নরম ছোঁয়ায়, ডেটলের ঘ্রাণে ছিল সান্ত্বনার প্রলেপ। 'মত্ রোউ বেবী, মত রোউ---'

সরিতাদিদি আমায় বুকে তুলে নেয়। ওর চোখের কোণে অনেক মুক্তোর ঝিক্‌মিক্!

সরিতাদিদির দুটো ছোট ছোট মেয়ে ছিল। তারা ছিল তাদের দিদিমার কাছে। নিজের মেয়েদের ছেড়ে পরের মেয়ে মানুষ করতে কলকাতায় চলে এসেছিল সরিতা। কেন সে দেশে যায় না, এ প্রশ্ন বহুবার করে করেও কোন উত্তর পাইনি। আপনমনে যখন ও জানালার পাশে বসে থাকত --- আমার নাক খ্যাঁদা ছোট্ট পুতুলটাকে বুকে চেপে হয়ত বা মনে করত ওর মেয়েদের মুখ --- তখন ওর চোখে ফুটে উঠত একটা অপার্থিব কষ্ট!

বাবার বন্ধুর চা-বাগানে কাজ করত সরিতাদিদি। ওর চোখে চোখ রাখলে পাওয়া যেত পাহাড়ের মত বিশাল একটা মনের আভাস, ওর বুকে মাথা রেখে আমি বহুবার শুনেছি এক নাম-না-জানা পাহাড়ি ঝর্ণার গান। বৃষ্টি মানেই সরিতাদিদির ছলছল করে ওঠা চোখ, আর নেপালী সুরের এক হয়ে যাওয়া যুগলবন্দী -----

জীবন মৃত্যু

' অসার মইনমা, পানি পরেঁও রুমিঝুম একলো য়ো মেরো মন, কসরি বিতাউনে -----'

সেই ছিল আমার সঙ্গীতের প্রথম পাঠ।

সা-রে-গা-মা, ডো-রো-মি'র পাগলা হাওয়া আমায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। রেখে যায় শুধু আঠারো বছর বয়সের বর্ষায় ভিজে থাকা কলেজের মাঠ। সেই সোঁদাগন্ধমাখা মাঠের সবুজ কচি ঘাস মাড়িয়ে যেতে যেতে, একটা অদৃশ্য শক্তি আমায় চুম্বকের মত পেছনে টানে, আমায় আটকে রাখতে চায় বৃষ্টিধোয়া দিনের অ্যালবামে।

আমি হাত ছাড়িয়ে নিতে চাই, ছুটতে থাকি প্রাণপণে ---- ছুট্, ছুট্, ছুট্! তবু এগোতে পারি না একটুও ---- মাথার ওপর একই আকাশ, পায়ের তলায় একই মাটি ---- পা দুটো পাথরের মত ভারি হয়ে আসে।

তারপর? এই তো জীবন! আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, গাঁজার ধোঁয়া, বাংলা মদের গন্ধ ----

তবু ছিল। এক ঝলক পরিষ্কার হাওয়া ছিল ---- একটা গীটারের সুর ছিল।

ক্যাম্পফায়ারের সামনে পার্থর ঝকঝকে চোখ, প্রোলাইন টি শার্ট, সুরেলা গলা ---- আর গীটারের তারে আমার সুর!

মগজের মধ্যে হাজার হাজার ঝিঁঝিঁপোকার উৎপাত শুরু হয়ে যায় ---- মাথার ভেতরটা কেউ যেন কুরে কুরে খেতে থাকে।

না --- না, না, না ---- আর ভাববো না। পার্থ এখন আমার জীবনের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা মাত্র!

আমার স্টেটাস্, চেহারা, বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স — যেগুলোর পেছনে ছুটেছিল বহু ছেলে, সেগুলোকেই উপেক্ষা করত পার্থ। সযত্নে। আর ঐখানেই আমি ভুলটি করেছিলাম ---- একটা মারাত্মক ভুল! পরে বুঝেছিলাম শুধু পার্থ নয়, অনেক বড় বড় ভন্ডদের সাধনার ফসল এই ছদ্ম-নিস্পৃহতা। এ এক অভিনব স্ট্রাটেজির খেলা!

পার্থ আমাকে কোনদিন ভালবাসেনি। ভালবাসা! ওয়ান ওয়ার্ড ইজ ট্যু অফ্‌ন প্রোফেইন্‌ড! কলেজের লবিতে বসে থাকা বহু ছেলের মতই 'প্রেম' শব্দটা ওর কাছে নিছকই একটা টাইম পাস। গভীরতাহীন অভিজ্ঞতামাত্র।

পার্থ এখন এ শহরে নাম করা পাগলদের একজন। অনেক অভিনয় করে ওকে অর্জন করতে হয়েছে সেই পাগলামো --- যার ওপর পড়ে গেছে এইচ-এম-ভি এবং আর-পি-জি'র দুর্লভ ছাপ। ওর ঝাঁ চকচকে মিথ্যের ইমারত দেখে দূর থেকে অসুখী মানুষদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় রঙিন স্বপ্নে! কেন তুমি বিদ্রোহের গান গাও পার্থ? জীবনের নেশা তোমায় অনুপ্রাণিত করতে পারেনি, গাঁজার ধোঁয়ার মেবি নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে, তবেই তুমি গানের জাল বোন --- কোন্ সাহসে মানুষকে স্তোক দাও তুমি? অর্থ খ্যাতি, সম্মান?

ধুর! পার্থকে নিয়ে আর বেশিক্ষণ এ গল্প চলে না। মোর স্টোরিজ, মোর!'

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিকের মত মামের হাইলাইটেড চুল। ভাবনার গতি রুদ্ধ করে দেয় অলোক

কাকুর নোংরা হাসি। মামের লাল রঙের জর্জেটে পুড়ে যেতে থাকে আমার হাজার রাতের ঘুম!

এখন সেই ঘুমের চাবি আমার হাতের মুঠোয়। কার যেন একটা কবিতা না কবিতার বই পড়েছিলাম --- ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম?

স্কুলের ডায়রীর 'পার্সোনাল মেমোরান্ডা' লেখা পাতাটায়, বাবার পেশা ---- 'বিজনেস', ব্যবসা। সে ব্যবসাটা যে কি, কোনদিন বুঝিনি। আমাদের বাড়িতে ম্যাকডাওয়াল-এর পোস্টার, ব্লু-রিব্যান্ড-এর অজস্র পকেট ক্যালেন্ডার আর ফাঁকা, ভর্তি নানারকম মদের বোতল বোঝাই থাকত। ব্যবসার সমনাম আমার কাছে অনেকদিন অবধি ছিল কাঁচের বোতল আর পার্টি। পার্টি ছাড়া কোনদিন কিছু দেখিনি। তাই ছোটবেলায় বন্ধুদের নিয়ে পার্টি-পার্টি খেলাটা আমি বহুবার খেলেছি। আমন্ত্রিতরা কেউ হত পুলিশ কমিশনার, কেউ সাজত উকিল, কেউ বা অবাঙালি ব্যবসাদার। এ খেলায় আমি সাজতাম 'বাবা'। বিদেশী খেলনার প্ল্যাস্টিক টি-সেট বের করে সাজাতাম হুইস্কির পেগ।

খেলায় 'আমি' সাজত তিতলি। ঠান্ডা জলে কফি মেশানো মদ খেয়ে যখন আমরা বেসামাল, তখন আমি তিতলিকে বলতাম, 'এবার তুই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদবি --- ঠিক আমি যেমন কাঁদি ----'

পার্টির খেলা জমে ওঠে পুরোদমে, তিতলি তারস্বরে কেঁদে ওঠার ভান করলে, আমার চরিত্র বদলে যেত। তখন আমি মাম হয়ে যেতাম -- ছুটে এসে তিতলিকে জড়িয়ে ধরতাম, কোলে নিতাম, আদর করতাম।

কিন্তু সত্যিই যেদিন হুইস্কি, শ্যাম্পেন-এর ফোয়ারা উঠত আমাদের বাড়িতে ---- সরিতাদিদি আমায় শুইয়ে দিত তাড়াতাড়ি।

'সরিতাদিদি, মাম কি খাচ্ছে, গেলাসের মধ্যে লাল লাল ---'

'বিটের স্যপ বেবি, তুমিও তো খাও ---'

সরিতা আমায় গল্প বলে বলে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে। গান গায়, ছড়া বলে --- 'টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিট্‌ল স্টার .....।'

তারারা ঝিকমিক করে ওঠে, মামের কানে, গলায় , হাতে --- মামের হাতে গেলাস, সেই গেলাসে রহস্যময় বিটের স্যপ! কৌতূহলে ঘুম ছুটে যাওয়া আমার দুচোখ তখন জেগে থাকে --- 'আপ এ্যাবাভ দ্য ওয়ার্ল্ড সো হা---ই ......' নার্সারি রাইম আমায় বিদ্রুপ করে চলে --- আমি বায়না ধরি ----

'মামের কাছে যাব ---'

'লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই ----' মাম তখন অন্য আকাশে, মাম তখন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সরিতাদিদি আমার মুখে হাত চাপা দিত ----

'ঘুম কর বেবি, ঘুম কর।'

আমি মনে মনে চিৎকার করে কাঁদতে থাকি। আমার ছোট্ট মনের ভেতর, একা কষ্টটা ধাক্কা খায়, বুমেরাং-এর মত ফিরে ফিরে আসে, কাটা ঘুড়ির মত লাট খায় --- তারপর একসময়, গাঢ় ঘুমের মধ্যে থিতিয়ে যায়।

কিন্তু সকলের অজান্তে আমার ভেতর একটা খোলস তৈরী হয়ে যায় --- একটা শক্ত দুর্ভেদ্য খোলস।

ঘুমভর্তি শিশিটা এখন আমার হাতের মুঠোয়। জলের ফাঁকা গ্লাসটা টেবিল-এর এক ধারে রেখে দিই। জানালা দিয়ে আলোয় মোড়া কলকাতা। এমন মধ্যরাতেও কি উজ্জ্বল ---! বিদ্যাসাগর সেতুর আলোর মালা আস্তে আস্তে প্রলয়ের সাদার্ন এভিন্যুর ফ্ল্যাটে সাজানো, ছোট ছোট মোমবাতির সারি হয়ে যায়। আমাদের প্রাইভেট ক্যান্ডল্ লাইট পার্টি! হা! ঘুমিয়ে পড়ার আগে আবছা আরও একটা গল্পের রেখা .... কিন্তু গল্প মানেই তো আলো। নাহ্! আমি আলো চাই না। আমি চাই গাঢ় অন্ধকার। যে অন্ধকারে জীবনের মুখ দেখা যাবে না। সেই মায়া ---- সেই ইলিউশন! আই হেট ইলিউশন! বাট দ্যাট মায়ামারীচ!

আমার প্রয়োজন শান্ত, সমাহিত ঘুম। ঘুমের মধ্যে আমার গান, গানের মধ্যে ঘুম ....

শিশির মধ্যে থেকে সমস্ত ঘুমটুকু ঢেলে দিই আমার হাতের মুঠোয়। কতটা ঘুম আছে আমার জন্যে? মাপতে থাকি ধীরে ধীরে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় .....

বকের সারি উড়ে যায় ---- আমার মাথার উপরে নীল আকাশের সামিয়ানা।

সুন্দরবনের খাঁড়িতে, জল কেটে এগিয়ে চলে এম-ভি চিত্ররেখা। জঁ ল্যুক গডার্ডের ছবির মত জাম্প কাট্ করে মনটা চলে আসে নিচের কেবিনে। যেখানে সাদা পোর্ট হোলের ফাঁক দিয়ে ভেসে যায় সুন্দরী গাছের সার, হোগলার জঙ্গল ----

ডেকের উপরে সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে চলে ঐ বাঁকের মুখটার জন্য। মিষ্টি জলে বাঘ আসে --- হয়ত সেখানে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে বসে আছে কোন রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

আমার মাথার মধ্যে আবার ভয়পোকার নড়াচড়া শুরু হয় ---- ভুল, ভুল --- হিংস্র জানোয়ারটা আমার সামনে --- আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে পিছু হটতে থাকি --- প্রচন্ড ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ছে সব ---- বাঘটা তৈরি হতে থাকে, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য --- নরম থাবার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে লুকনো ছুরির ফলা, ঝক্‌মক্ করছে ওর লোভী শ্বদন্ত -- আমি শিউরে উঠি, ও আমায় শেষ করে ফেলবে! মানুষখেকোটার সারা শরীরে ডোরাকাটা ল্যুই-ফিলিপ, ওর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ওল্ড ট্যাভার্ন-এর গন্ধ, আর চোখদুটো আমার ভীষণ পরিচিত একটা একটা ঘৃণার মত। অলোক কাকু!

লালবাজারে একটা বিশেষ পদের সুবিধে নিয়ে, ঐ লোকটা আমার মা-বাবার সঙ্গে নিঃশব্দ ব্যবসা চালায়। তাদের সমস্ত কালো কাজগুলোকে সাদা করে দিয়ে, অলোক সাহা পায় লাভের একটা মোটা অংশ এবং ---

লোকটাকে কোনদিনই আমার ভাল লাগেনি। ছোটবেলা থেকেই ওকে যাতায়াত করতে দেখি আমাদের বাড়িতে। ওকে দেখলেই আমার শরীর খারাপ হয়, বমি পায় -- ওহ্ অসহ্য। হাতে ধরা জলের গ্লাসটা ছাঁড়ে দিই জানালা লক্ষ্য করে --

ঘরের চার দেওয়ালে শুধু আতঙ্কের মুখোশ। বারান্দার দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। কেউ নেই

কোথাও। শুধু হাজার হাজার মাইল জুড়ে ভয় আর একাকীত্বের পোকা! তবু কলেজে ওরা আমায় ঈর্ষা করে।

থাক্‌গে, আমি আর একটু বাদেই ওদের ঈর্ষার বাইরে। আদার্স উইল অ্যাবাইড দেয়ার কোয়েশ্চেন, আই শ্যাল বি ফ্রি! বাট বিফোর দ্যাট। এই শহরটাকে আর একবার দেখি।

দশতলার বারান্দা থেকে নিচে তাকাতে বুকটা ছাঁত করে ওঠে। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে কাঁচের গ্লাসটা। এখান থেকে মাটির দূরত্বে একটা মোমেন্টাম-এর অঙ্ক কষে দেখলে কেমন হয়? একটা জ্যান্ত পঞ্চাশ কিলোগ্রাম মানুষের তালগোল পাকানো রক্তমাংসপিন্ড হয়ে যাবার সোজা হিসেব! কতটা কষ্ট হয়েছিল সেই ক্লাস সেভ্‌নে পড়া মেয়েটার? বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেনি বলে!

স্কুল ফাইনালে ভাল রেজাল্ট-এর টোপ দিয়ে আমি আদায় করেছিলাম মারুতি-৮০০-এর চাবি। ততদিনে হিসেব কষতে শিখে গিয়েছিলাম আমি! মা-বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিছক একটা হিসেব-ই ছিল!

আমার ড্রেস কোডে সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে মিনিস্কার্ট আর স্প্যাগেটি টপ-এর হিসেব -- জিঞ্জার স্পাইস-এর মত চুল দেখে রাস্তার ছেলেরা যখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তখন বুঝি হিসেবটা মিলে যাচ্ছে -- আমার ভীষণ ভাল লাগে। দারুণ লাগে, কলেজের গেটে গাড়ি থেকে নামতে নামতে যখন উড়িয়ে দিই সুস্মিতা সেনের ঠোঁট বাঁকানো মাপা হাসি -- আশপাশের সমস্ত মানুষ তখন অসহায়, আক্ষেপের ঢোক গিলতে থাকে। যতই বাঙালীত্বের ঘোমটা টানুক, আমি জানি -- আড়চোখে ওরা আমায় দেখছে। দেখবেই! ওরা আমায় উপেক্ষা করতে পারে না। ওদের জন্য তখন আমি দু'হাতে করুণা ছড়াই। এটা আমার একান্ত নিজস্ব বিলাসিতা।

আমায় নয়, আসলে ওরা ঈর্ষা করে আমার হাতখরচের টাকার পরিমাণটাকে, এই সৌন্দর্যের প্লাস্টিক চেকনাই -- ইনকগনিটো, সাম প্লেস এলস্‌ বা ইকুইনক্স-এ গিয়ে রাতের পর রাত কাটানোর স্বাধীনতা।

বোকা -- ওরা ভীষণ বোকা, তাই আমার বেঁচে থাকার কষ্টটাকেই ঈর্ষা করে ওরা। আবার কেন মাথার ভেতরে অসংখ্য ছেনি হাতুড়ি? প্রচন্ড বেদনায় আমার ভেতরে ককিয়ে ওঠে কেউ, কবরে ঘুমিয়ে থাকা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে........

"সরিতাদিদি তুই কোথায়? সরিতাদিদি আমায় বাঁচা!

কেন এমন হল? এ ডাক কি আমার? কিন্তু এ ডাক তো আমার হওয়ার নয়! এ কি তাহলে অন্য কারুর -- দা আদার সেল্ফ অফ্‌ মী? ধুর! আই অ্যাম আ ম্যাড ম্যাড গর্ল। আমি বারবার নিজের ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি -- ইজ দেয়ার এনিবডি দেয়ার?

জটিল ভাবনাগুলোকে নীল-নীল আকাশে সাদা পায়রার মত উড়িয়ে দিতে চাই -- হয়না। ওরা এখন উড়তে ভুলে গেছে -- খাঁচায় বন্দী পাখিরা এখন একা। আকাশটা ক্রমশই একটা বিশাল মাকড়শার জালে জড়িয়ে যেতে থাকে। আহ্‌! সরিয়ে নায় এই লালা, এই জাল। আমাকে একটু আকাশ দেখতে দাও!

জীবন মৃত্যু

সুন্দরবনের খাঁড়িতে আমায় শেষ আকাশ দেখিয়েছিল সেই ছেলেটা। কি যেন নাম? অয়ন, সায়ন —?

রাতচরা পাখিটা ঘড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে -- একবার ডেকে উঠে জানান দিয়ে দেয় সময়ের গতি। আমার টাইম মেশিনে সময় পিছিয়ে যায় -- ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর দিয়ে ৮০ কিমি. বেগে ছুটে যায় রুপোলী ওপেল অ্যাস্ট্রা -- সময়ের স্টিয়ারিং ধরে ঋতেশ খন্না!

ঋতেশের বাবার আটটা ফ্যাক্টরী সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। তাই ওর ভাবভঙ্গীটা ভীষণ দামী। ঋতেশের পাঁচহাজার টাকা দামের সানগার্ড --

একহাতে বীয়ার ক্যান, ঠোঁটে শাহরুখ খান হাসি।

'মৈ তুমসে বেহদ প্যার করতা হুঁ -- সচ্‌ -- আই লাভ ইউ!'

বেঘাটে হাত ফেলেছে ঋতেশ! আমার নিষ্প্রাণ, ঠান্ডা হাসির দেয়ালে -- ঋতেশের নাটকীয় আবেগ ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে -- 'কিঁউ, কয়্যা কমী হ্যায় মুঝমে?'

এ খেলার উদ্দেশ্য আমি জানি ঋতেশ, তাই আর ও ফাঁদে পা দিইনি।

এমন মেকি, স্বার্থপর, বস্তাপচা একটা জগতের মধ্যে যখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তখন সেই ছেলেটা আমার পাশে এসে বসে। আই ফর্গট টিয়ারস -- কিন্তু ঐ ছেলেটা হঠাৎ হঠাৎ আমাকে কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যায়। রাতের বালিশে উপুড় হয়ে চোখের জল আটকাতে থাকা আমার এলোমেলো চুলে সে হাত বুলোয় —

'বল, বল -- কোথায় তোমার কষ্ট?'

বলতে চেয়েছি সায়ন, কতবার জানাতে চেয়েছি তোমায়। কিন্তু ঐ যে, আমার সামনের ঐ দুর্ভেদ্য দেওয়ালটা!

সেদিন ডেকের ওপর তুমি যখন গুনগুন করে গান গাইছিলে, খুব ইচ্ছে করছিল টাইট স্ল্যাক্স আর টি-শার্ট এর মোড়ক থেকে বেরিয়ে -- একটা শাড়ি পরি। অবাধ্য হাওয়ায় উড়ছিল তোমার চুল -- জ্যোৎস্নার রঙে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল পাঞ্জাবীটা। ইচ্ছে করছিল, তোমার চোখে নতুন করে পৃথিবীটা দেখি। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন দেশ রাগে সেতার বাজছিল --

''এই তোর লাইটারটা একটু দে তো !'

ছিঁড়ে গেল চিকারীর তার।

মামের পরণে লাল রঙের জর্জেট, দু-আঙুলের ফাঁকে একটা বিড়ি। জলন্ত বিড়ির ছ্যাঁকায় নষ্ট হয়ে যায় সুন্দর ছবিটার ক্যানভাস --- একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে সায়নের শরীর!

মনে হয় ধাক্কা মেরে মামকে সরিয়ে দিই ঐ ছবিটা থেকে --- কিন্তু মামকে যে সরানো যায় না, কিছুতেই না।

বাবাও পারেনি। যুক্তি দিয়ে বাবা মামকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, একই পরিবারে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামেই, দু'দুটো মদের দোকানের পারমিট পাওয়া সম্ভব নয়। মামের ভরুর ওপর খেলে গিয়েছিল কৌতুক ও আত্মবিশ্বাসের অহঙ্কার। মাম বলেছিল 'শুধু বুদ্ধি নয়, আরও অনেক কিছু খাটিয়ে তবেই

মানুষ সাকসেসফুল হতে পারে।'

'সাকসেস' ব্যাপারটা আমার কাছে একটা ধাঁধা। প্রচুর টাকার মানেই কি সাকসেস? মামের চাওয়ার পরিধিটা অদ্ভুত। একটা মদের দোকানের লাইসেন্স কি কোন চাওয়া হতে পারে? অথচ এই মামের লেখা-ই একটা বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত বের হয়। কি করে লেখে মাম সেসব? তার ভাষা, তার ভাব, তার জীবনদর্শণ আর মামের প্রাত্যহিক জীবনে ----- কেন হয় এত আকাশ-পাতাল তফাৎ?

আমি তল পাই না! মাঝে মাঝে মনে হয় একটা দুঃস্বপ্নের ছাদ থেকে কেউ যেন আমায় অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে ---- আমি পড়ছি, পড়ছি, পড়ছি ....

বাথরুমের আয়নায় আমার মুখ। কত রকমভাবে বদলে যেতে পারে এই মুখটা? কসমেটিক সার্জারি, মেক-আপ, ফেস-লিফটিং -- এক কোণে রাখা লম্বা গলা বোতলটার হলুদ তরলের দিকে চোখ পড়ে যায়। গৌতম কাকুর মেয়ে মুন্না! স্বেচ্ছায় ডিভোর্স দেয় নি বলে ----- ওর বাইশ বছরের মুখটাকে, ওহ্ নো-ও-ও।

মাম কিন্তু স্বেচ্ছায় ডিভোর্স দিয়েছিল বাবাকে। কারণ? লাইসেন্স! ছ'মাসের মধ্যে আর একটা মদের দোকান, আর যতদিন না সেটা হয়, ততদিন অলোক সাহার কসবার ফ্ল্যাটে থাকবার লাইসেন্স। ছ'মাস পর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার মা-বাবা আবার হয়ে যাবে আইনত স্বামী-স্ত্রী। স্ট্রেঞ্জ! ইজ দিস্ রিলেশন?

বাবার ওপর আমার প্রচন্ড রাগ হত। একটা মেরুদন্ডহীন লোক। মদ আর টাকার বাইরে কিছু বোঝে না, সে দায়ও যেন নেই! তা না হলে সুন্দরবনে সেই ঘটনাটা ঘটে যাবার পরও অলোক নামের লোকটার সঙ্গে, ওদের সব সম্পর্ক চুকে যায় নি কেন?

সায়ন তখন হঠাৎই আমার কেবিনে এসে পড়েছিল, না হলে ....। মাতাল লোকটাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছিল সে। তীব্র বিবমিষায় আমার চেতনা তখন আচ্ছন্ন। আমার চোখে জল ছিল না। এ যে ঘটবে, তা যেন আমার জানাই ছিল।

গভীর মমতায় আমার হাত ওর শক্ত মুঠোয় নিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিল সায়ন নামের ছেলেটা। সেদিন রাতে মাম ও বাবার মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। দুজনেই নেশার ঘোরে আচড়া-কামড়া করতে থাকে। সায়ন ওদের থামাতে গেলে --- মাম সপাটে একটা চড় কষায় ওর গালে। আমার মনে সেই পাঁচ আঙুলের দাগ এখনও স্পষ্ট।

সায়ন, তুমি অভিমান করোনা। আমার এই নাইট ড্রেসের আড়ালে যে বিষাক্ত সাপগুলোকে দেখছ --- ওগুলো কিছু নয় --- বেল্টের ছোবল। আমার প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর! এ আমি মুখ বুজে সহ্য করে গেছি, শুধু তোমার কথা ভেবে। একবার, মাত্র একটিবার তুমি ভুল করে চলে এস আমার জীবনে ---- আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ঠিকানা পেলে, হয়তো আমি আজকের এই চরম সিদ্ধান্তটা নিতে দেরি করতে পারি!

আচ্ছা, নাইট গাউনের বেল্টটা খুলে যদি একটা ফাঁস ....? মন্দ নয়। ফাঁস নয় মণিহার। টু বি, অর নট টু বি? ডেনমার্কের রাজপুত্রও কি এভাবে — বেল্টের প্রান্তে টান বাড়াতে থাকি, একটু - একটু -আরও

একটু-কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, হাতটা নেমে আসে ক্লান্তিতে। নাহ্ এভাবে নয় -- ব্যাপারটাকে আরোও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

কিন্তু তার আগে যদি একবার এখান থেকে ছাড়া পেতাম! যদি একবার আমাকে বলা হত, যাও তোমার প্রিয় শত্রুটিকে হত্যা করে এস -- তাহলে আমি তাকে..... তাকে একটু একটু করে মোলেস্ট করতাম ..। একটু একটু করে তাকে আমি ভাঙতাম, ছিঁড়তাম.......

এইতো সেদিন! মামকে একটা জরুরী কাগজ পৌঁছানোর কথা ছিল। অলোককাকুর কুসবার ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল টিপতেই, আশা করিনি বারমুডা পরা অলোককাকু নিজেই দরজাটা খুলবে।

'হ্যাল্লো ইয়ং লেডি -- '

ওকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতেই অভ্যর্থনা করে দুটো অপেক্ষমান শূন্য কাঁচের গ্লাস, ডিপ্লোম্যাট-এর বোতল আর তন্দুরী চিকেনের বোল।

হঠাৎই আমার ছোটবেলার কিছু পর্দাটানা দুপুর, দরজার পেছনে ফিসফাস, অলোক সাহার 'মিঃ হাইড' চোখ, মামের সঙ্গে ওর বিশেষ বন্ধুত্ব -- দুই আর দুইয়ে মিলে বিশাল একটা ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হয়ে যায়।

আমার ঠোঁটের কোণে শ্লেষ ঝরে পড়ে -- 'ভুল সময়ে এসে পড়লাম তো?'

'ওহ্ নো না! নট্ অ্যাট অল --'

অলোককাকু আমার কাঁধে হাত রাখে -- আমি এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিই।

মাম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে, আমাকে নয়!

'মাম কোথায়?'

'চেঞ্জ করছে।' অলোককাকু গ্লাস ভর্তি করতে থাকে।

'এই কাগজগুলো মামকে দিয়ে দিও-- '

আমি উঠে পড়ি। 'এত তাড়া কিসের 'সুইটি পাই'?' অলোককাকু আমার হাতটা ধরে ফেলে -- 'আর একটু বসে যাও।'

মাম এসে যায়।

' কি ব্যাপার?'

'নাথিং --' অলোক সাহা আমার গাল ছুঁয়ে যায়।

'তোমার মেয়েটা খু-উ-ব কিউট --'

ওহ্ অসহ্য!

আমার বিরক্তিটা মামের চোখে পড়ে না। 'কার মেয়ে বল?' মামের চোখে টানটান হাসি। 'অফ কোর্স-- ' আলোক সাহার একটা হাতে রঙিন গ্লাস, আর একটা হাত ময়াল সাপের মত পেঁচিয়ে ধরে মামাকে -- আমি থমকে যাই! সুন্দরবনের বাঘ এখন ময়াল সাপ হয়ে মামাকে গিলছে --

জানোয়ারটার হাসির ফুলকিতে নিমেষে ঘটে যায় এক বিশাল অগ্নিকান্ড! কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডিপ্লোম্যাট-এর বোতল উঠে আসে আমার হাতে, একটা প্রচন্ড আওয়াজে চুরমার হয়ে যায় অলোক

সাহার নেশা। বোতলের বাকি অর্ধেক আমার স্বাধীনতার শপথ। চোখের সামনে হাজার হাজার বন্দুক বিদ্রোহী গর্জন করে ওঠে, লক্ষ লক্ষ শেকল ভেঙে পড়ে সশব্দে।

যাহ্! পালাও হে ঘটনারা! অন্ধকারের বুক চিরে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পাই আমি। সায়ন! সায়নের স্পর্শ আমার কপাল ছুঁয়ে যায়। কখন এলে সায়ন? সায়ন হাসে। ওর ফোঁটা ফোঁটা হাসি ঝরে পড়তে পড়তে একটা আলোর পথ তৈরী হয়ে যায়। আর সেই পথ ধরে এগিয়ে আসে -- সরিতাদিদি।

সরিতাদিদি আমার যন্ত্রণার ঘামে ভিজে ওঠা মুখ মুছিয়ে দেয় যত্ন করে। সন্তর্পণে আমার মাথাটা টেনে নেয় ওর বুকে। তোমার ঘাম ঘাম গন্ধমাখা আঁচলটা, যেন চা-বাগানের সুবাস মাখা পাহাড়ী আকাশ -- আমার ভীষণ ভাল লাগতে থাকে স--ব কিছু।

সেই গানটা একবার গাও না সাওন,

'কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে,

মন তরে কে বা পার করে --'

আমি পাগল নই সরিতাদিদি, বিশ্বাস কর! ঠান্ডা মাথায়, ঐ অলোক সাহাকে আমি -- না, মরেনি। 'মিঃ হাইড'-রা মরে না। মাম অনেক টাকা দিয়ে আমার ইনস্যানিটির সার্টিফিকেট-টা কিনেছে। ওরা বলে আমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে -- তাই তো আমার জেল হয়নি।

আমি উন্মাদ নই! সেটা প্রমাণ করতেই তো সব ভাঙচুর করেছি। ওরা আমায় থানা থেকে ফিরিয়ে আনার পর ভেঙে টুকরো টুকরো পোর্সিলিনের ফুলদানী, মামের শখের ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি, এমনকি পুরনো চীনেমাটি স্যুপ বোলগুলোও। মনে আছে, ছোটবেলায় লাল বিটের স্যুপ নিয়ে, তুমি ঐ বোল হাতে আমার পেছনে পেছনে সারা বাড়ি ঘুরতে।

বেশ করেছি ভেঙেছি, আরও অনেক কিছু ভাঙবো। মাম সেজন্য বাবার বেল্ট দিয়ে মেরেছে -- বারবার, বারবার -- যতক্ষণ না আমার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

তবু দেখ, আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, ৩০ টা ভ্যালিয়াম ও আমার একা শরীরের বিরুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। আসলে আমি যে অন্ধকারের উৎসে পৌঁছে গেছি!

সরিতাদিদি আমার মাথায় হাত বুলোয়, আমার চেতনা ভাসিয়ে নামে -- পাহাড়ী বর্ষার ঢল, ঝাপসা হয়ে আসে চার দেওয়ালের খাঁচা, মামের ঝিলিক দেওয়া হাইলাইটেড চুল, মিঃ হাইডের চোখ -

বিশাল উচ্চতা থেকে যেন আমি দেখতে থাকি মানচিত্রের মত ছোট্ট পৃথিবীটাকে। তারপর সমুদ্রের মাথায় ফেনার মত দুলতে দুলতে চলে যাই একটা পাহাড়ী নদীর ধারে, যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপোলী মুকুটে ঠিকরে পড়ে আলোর হাসি। আর তার পাশেই পাহাড়ী বস্তিতে, একটা কাঠের বাড়ীর দাওয়ায় সরিতাদিদি আমায় লাল রঙের ধোঁয়া ওঠা স্যুপ খাওয়ায় -- একপাশে খেলা করে চলে দুটো ছোট্ট নেপালী মেয়ে।

সায়ন আসে। সায়নের শক্ত মুঠোয় আমার হাত..... ভ্যালিয়াম রাখা আমার হাতটা কাঁপছে কেন?

জীবন মৃত্যু

সরিতাদিদি আমায় ঘুম পাড়াতে থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশির মত ওর গানের সুর বদলে যেতে থাকে -- বদলে যেতে থাকে পার্থিব সুর। পৃথিবীর সব ছন্দোবদ্ধ হয়ে যায় --

আমার কি তবে চলা শুরু হল? অন্ধকারের ভেতর দিয়ে -- অন্ধকারের ভেতর দিয়ে -- নৈনং ছিদন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো, ন শোষয়তি মারুতঃ।

এক বিস্তীর্ণ আলোর উপত্যকার ধারে এসে দাঁড়াই আমি -- আলো এমন মোহময়ী, অনিবার্য! আমি জানিনা আলো হন্তারক কিনা, শুধু জানি আলোর ভেতরে, আলোর আরও ভেতরে গভীরতর আলোর রাজ্যে চলে যাচ্ছি আমি।

আমি অমৃতা।

শিলালিপি

দীপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

গিয়েছে আর সব, কেবল বাকি
বুকের ভিতরের মোরগঝুঁটি
— শঙ্খ ঘোষ।

তোর মনে পড়ে 'কজিনুকের' দরজা দিয়ে ভালভাসা কেমন উড়ে উড়ে যাচ্ছিল? আকাশনীল মেখলায় ঘাঘরায় সে তখন এক গোটা আকাস। বাইরের রোদের মত তুই সবে ডানা মেলতে শুরু করেছিস। বুকের মধ্যে কাঁপন। সাদা পর্দার ফাংক দিয়ে অজগরের মাথা ছাড়িয়ে বন্দুকটা চোখ রাঙাচ্ছে।

তুই ঐ বন্দুক, খড়পোরা অজগরের পেটের মধ্যে যেন শকুন্তলার আংটি খুঁজছিস।

কলেজমাঠের যে কোণটায় শিরীষ গাছের ছায়ার কোটর, ওইখানে যে ডালিমদানা ভেঙে ভেঙে হেসে গড়িয়ে যেত এতদিন বন্ধুদের সঙ্গে তাকে যে এই রেল লাইনের ধারে ঢালু হযে নেমে আসো বাসায় অজগরের নিচে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে দেখবি, ভেবেছিলি কী? সে হাতের কাচের চুড়িতে রিণ রিণ শব্দ তুলে ওগর করছে। আর তুই? চিনি আর দুধের সর দিয়ে আগের রাত্তিরের বাসি রুটি খেয়ে হাইস্কুল-লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষার শাসন জড়ানো বইএ মুখ ডুবিয়ে।

মুখ ডুবিয়েই কী? নদী ফুলেছে তেরো দিন। কদিন এতটুকু সে নড়েনি। ঘাটের বাজু পর্যন্ত ডোবা। তার মধ্যে কচুরি পানা, মরা মাছের চারা। খলবলিয়ে জলঢোঁড়া। চেরাস্রোতের সেই নদী আপনপর চেনা না। মাথার ওপর ঠা ঠা রোদ। তবু সে ছুটে বেড়ায়। এঘর সেঘর উঁকি দিতে দিতে ঢোকে। তোদের ঘরেও। প্রতিভাদ্রেই। তালের গন্ধ ছড়িয়ে যেতেই তোরা ভয় পেতিস। ওই আসছে — আসছে। তারপর সে উঁকি দিতেই হাঁড়ি কুড়ি, জনতা স্টোভ.......। প্রতিবারইতো শিশুপাঠশালা, নিউনিসিপাল স্কুল, কোন উঁচু কোঠাবাড়ি। সেবারই হঠাৎ.........

মাঠের আল ভেঙে রেলের লাইন ট পকে একটা মিছিল। সেই মিছিলে তোরা। মনে পড়ে তোর মাথায় বড় চায়ের ব্যাগ তেকে খোচা মারছে খুন্তির কোণা, যা নড়লে শোল মাছের রাঙা ঝোল, বৈরালির চচ্চরি? তোরা দুই ভাই বোন ভাড়া বাসার পড়ার টেবিলে গন্ধ নিতে নিতে দ্রুত পড়া সেষ করছিস?

বোঝা নামিযে মাথার হাত দিয়ে দেখছিস কোথাও বুঝি নরম মাটি।

ব্যাগে খুন্তির পাশাপাশি যদুবাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — উপক্রমণিকা, হাতি ছাপ দোমড়ানো খাতা। মনে পড়ে যায় মেডিকেল বিলের ফাউ টাকায় খাতা এনে বাবা কেমন নারকেল ভাঙার শব্দ করে বলেছিল কাগজ নষ্ট করলে......। বাকি কথা উহ্য থাকলেও বুঝতে পেরেছিলি পায়ের গোড়ালিতে লকড়ির দাগটা শুকিয়ে গেলেও আবার যখন খুশি কাঁচা হতে পারে। আর তুই এমন অন্যায করতেই

ভালবাসতিস। তখন তোর ক্লাস সিক্স। সেদিন কী মনে পড়েনি ঘরে ঝুলিয়ে রাখা কাঞ্চীর পুতিগন্ধময় কোট হাতড়ে বিড়ি চুরি করে, একদিন ভোর ছটায় জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় হাফপ্যান্ট পরে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছিস? খেয়াল করিসনি লাবান স্কুলের হেড স্যার কৈলাস বাবুর নেহেরুটুপিটা কেমন নেমে এসেছিলো তাঁর হাটুর কাছে। ধপ ধপে ধুতির সাদা জমিতে পোড়া বিড়ি, টেক্কা দেশলাই ..... কানটা কী সেদিন তোর মাথায় ছিল? সেচখালের মত হাঁ হয়ে যাওয়া পায়ের গোড়ালি যখন ডঃ নাথের ডাক্তারখানায় বুজে যাচ্ছে সেদিনও বুঝিস নি বাবার হৃৎপিন্ডটা কতটা কমজোরি --- পায়ে পায়ে পাহাড় ভেঙে ঢালু জমির নদী উপত্যকায় ভারী শিলার মত দাঁড়িয়ে যাবে কোনদিন। তোরা জড়িয়ে যাবি শ্যাওলায়।

সেই শিলার ইতিকথা শুরুইতো হয়েছিল সেই নদী থেকে। যদিও সেই নদীকেও ফিরে যেতে হলো একদিন, এটা জানাই ছিল, শুধু তুই বুঝিস নি। তাই ঘুরে ফিরে কেরোসিনের কটু গন্ধ ভেসে যাওয়া রান্না ঘরের এক কোণে কুপি নিভিয়ে অপেক্ষা করেছিস কখন তার গোলাপী পা জানান দিয়ে ঢুকে যাবে ঘরে। আর বুক কাঁপিয়ে দিনান্তের একমাত্র মিটারগেজের কাঠের বগির ট্রেন আরও একবার চলে যাবে ---- মানে আরও একটা দিন ধরা পড়ার ভয় নিয়ে অপেক্ষা ......।

সে ঢুকে যায় ঘরে। আর বয়সের ঈষৎ ভাঙচুর নিয়ে তার শিক্ষক বাবা তাঁর প্রিয় ছোয়ালির কাছে স্যাঁকরার ধৈর্য্যে একটু একটু করে গড়ে তোলে দুর্গ, যার কুঠিতে কুঠিতে অহম জীবনচর্চার সোনালি পাড় লাগা বহি। তুই এসব কিছুই বুঝিস না তখন। ডিমাছাদের (নদীর সন্তান) সঙ্গে কেমন করে শতাব্দী পর শতাব্দী তারা যুদ্ধ করেছে। বাঁশ বেত গুয়াপানের দেশে অরণ্য কন্দর ভাঙা সে লড়াই এর কাথায় তোর দরকার কী? আলমারির কাচে সাত্ত্বিক মত দাঁড়িয়ে আছে লক্ষীকান্ত বেজবরুয়ার 'জয়মতি কুমারী', 'চন্দ্রধ্বজ সিংহ', হিতেশ্বর বরুয়ার 'অহমের দিন'। ওই বন্দী কাচঘরে কী তার ছায়া পড়ে? তুই সেসব ভাবার অবস্থায় ছিলি না। তোর মনে হচ্ছিল কী দরকার তার বিনুনির অহংকারে ঢেকে থাকা কর্মশালার হাপরের শব্দ শোনার? তুই তখন শুধু আকাশ দেখিস। এক সমুদ্র আকাশ। নীল নিয়ে সিঁদুররাঙা। পর্যায় ক্রমিক পাঠ। তাতে বুঁদ হয়ে আছিস। আর চড়া রোদে ক্লান্ত হয়ে বাবা খবর নিয়ে আসে --- আজ দু'ইঞ্চি, কাল আরও দু'ইঞ্চি। জল কমছে।

আকাশচারী তোর সাহস বাড়ে। বুঝতেই পারছিস বাবা অস্থির। ছোট্ট বোনটি, যদিও তখন নয়, তবু রাবার ক্লথে অভ্যস্থ সে অজানা বিছানা ভিজিয়ে ফেলে। ছাদে তোষক মেলতে মেলতে মা রাঙা হয়ে যায়। এমনই একদিন তোদের ঘরে তখন হাঁটুডোবা জল, বাবার মুখে হু-হু জ্বরে লাল। বাবা প্রায় জোর করে পাঠাল তোকে। তোদের ভাড়া বাসায় তখনও ছিট কাগজে সাজানো লক্ষীর আসন খাটের ওপর, তাতে খলসের কঙ্কাল। খসে যাওয়া কাগজের ফাঁকে কোথায় তিনশ টাকা --- তুই খুঁজতে গেছিস। বাবার মাস মাইনে তিনশ সতেরো। কোন এক রাতে ঘুমের ভানের মধ্যে বাবার মুখে শুনেছিলি। মাকে আদর করতে করতে বাবা প্রায় ফিস ফিস, আর একজন কেউ এলে কেমন করে সংসার চালাবো? মাত্র তিনশ সতেরো টাকা হাতে পাই .....। মাস মাইনে থেকেও মাসের শেষে তিনশ! কিন্তু তুই কি জানতিস, দেখেছিস কি কখনও মা ফ্যান ভাত খেয়েও ....? আসলে একটা মরা গাছও যে ঘাসে

ছায়া দেয় তুই তখন বুঝবি কী? তুই ভাবছিস তেগুলো টাকা! তোর দু হাতের ফাঁকে!

তুই গন্ধ শুঁকছিস ...... ভেজা ভেজা ---- কচুরিপানার আঁশটে গন্ধ।

মেথরপট্টির রাস্তা ধরে হাঁটছিস তুই। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শুয়োরের খাবারের বর্জধারায় মিশে আছে কাদার আঠা। পা পিছলানোর অভ্যাস তোর। সেদিনও পড়লি। উঠলি। যখন, ঝনঝনে হাতে --- মনে হল কেউ খাটের পায়া ভেঙে বাসা পাল্টাচ্ছে।

সেই রাতে বাবার পাশে শুয়ে আছিস। হঠাৎ কী কেন স্বপ্ন ভেসে এল?

--- কিমান লাগিছে? তার বাবার গলা। তোর চোখ বুঁজে এল। প্রথমে দেখতে পেলি অজগরটা। আর তারপর .....? চোখ খুললেই তাঁর পেছনে সেই গোলাপী হাত।

সেদিন ঠিক সেই সময় ট্রেনটা চলে গেল। পাহাড়ি বাঁশি অনেকক্ষণ বাজল যেন দূরে। ওই রেলের লাইনে তোর বুকের শব্দ।

সেই প্রথম দিন। দিন নয় রাত। দুদিন কেটে গেছে। পাশাপাশি দুটো গন্ধরাজগাছের ফাঁকে ছোট ঝোলানো তারে তার ছোটজামা লুকিয়ে জ্যোৎস্না খায়। আগে কখনও খেয়াল করিসনি। বোধহয় নিত্য-নতুন। সেদিন হঠাৎ তোর মুখ লেগে গড়িয়ে পড়ল তোর পায়ে। বেশ আচমকাই। তুই ঝুঁকলি। এক হাতে ব্যান্ডেজ। অন্য হাতে যেন এক ভীরু পাখির ছানা। হঠাৎ পেছনে কানের খুব কাছে পরিষ্কার বাংলায়, এখানে কেন? তারপর, আই শ্যাল কিল ইউ ....।

সারারাত ঘুমোলি না। কানের কাছে বাজছে ----- আই শ্যাল কিল ইউ .....আই শ্যাল কিল ইউ .....।

বছর দুয়েক আগে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলি। ভুলভুলাইয়ার ঘের সেঘর সেদিন তোর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। আর সেই সেদিনও মেন মনটাকে নিয়ে ঘের সেঘর খেলা। যমুনাবতী ঢেউ বুকের সব নুড়ি পাথর ছুঁয়ে ছেনে চলে যাচ্ছে। অথচ তোর চেনা নদী? সে তখন একতারা তুলে নিয়েছে। এবার ফেরা। আবার সেই বোঝা মাথায়। এবার কিন্তু মিছিলে নয়। বড় চুপি চুপি --- যেমন মাঝে মাঝে নদী হারিয়ে যায় কোন বিলে। বিলে আকাশ উঁকি মারে। হাওয়ায় চারপাশে নেচে ওঠে কাশফুল। তখন আশ্বিন।

পাশের বাড়ির চাতালে হারাণদা দোতারায় রামপ্রসাদী সুর তোলে, এই সংসার ধোঁকার টাটি/ ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি। ......একদিন তুই বললি, হারাণদা তুমি প্রতিবার কোথাও যাও? তিন চারমাস আস না?

হারাণদা হাসে। সে হাসিতেও এক চোরা নদী। হারাণদা বলে, পোলাপান মানুষ, তোরে কি সব বোঝান্ যায়! নামটাই যে হারাণ! বড় হ। তখন বুঝবি ....। আপন মনে গেয়ে ওঠে , ভরা গাঙে পাল তুইল্যা যাও/ কোন দেশেতে নাইয়াম/ আপর দুফর কাইজা অরি/ হায়রে ..../ ।

তুই হারাণদাকে বুঝিস না। তোর ইচ্ছে করে ওর পায়ের ঘুঙুর হয়েও যদি .....। আবার ভাবিস বড় হওয়া, সে কী ঐ গোঁফদাড়ির জঙ্গলের কোন রহস্য? কোন এক সকালে চমকে উঠিস নিজের প্যান্ট মেলতে গিয়ে ....। বড় হওয়ার রহস্য কী তবে শরীর আর তার শাখাপ্রশাখার সালোক-সংশ্লেষে?

কলেজমাঠের সেই শিরীষ গাছের ছায়া তখন মুখ বদলেছে। তবু তুই রোজ আসিস। গাছটা

দেখিস বাবাদের কথাবার্তায় শুনেছিলি দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে মিশনের পঙতি ভোজনে সে আসে। তুই দাঁড়িয়ে রইলি মিশনগেটের খানিক দূরে। তোর গায়ে ময়ূরকণ্ঠী জামা। তাতে আলো ঠিকরোয়। আর সেই আলোয় প্রায় দেড়মাস পরও যে সে চমকে যাবে এমনটি ভাবিস নি।

তার মুখে তখন বাসন্তী রোদ। তোকে বাইরে রেখে সেই রোদ মিশে গেল শিউলি চন্দনের গন্ধে।

সেই গন্ধ যে কিছুদিন পরই বারুদে মিশে যাবে তখন কেই-ই বা জানত!

তার চমকানো দৃষ্টির এক বুক বাতাস নিয়ে ছ'ঘণ্টা পর যখন ঘরে ফিরলি, ঘরময় স্পিরিটের গন্ধ। দুই ইঞ্চি সরু ফাইল দিয়ে জলের শিশি কাটছেন ডাক্তার। হাতের সিরিঞ্জে উঠে আসছে সাদা দুধের মত ওষুধ। বুকে যেন হাপর নিয়ে বাবা পিঠের নিচে তিনটে বালিসে হেলান। তোর এক পা চৌকাঠে। তোর পায়ের শব্দ দুটো চোখ ভেসে এল দরজায়। এক মরা গাছের।

ডাক্তার চলে গেলে ফাটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলি ইনজেকশনের শিশি। চব্বিশলাখ পাওয়ারের পেনিডিওর। ডাক্তার যাবার আগে বলে গেলেন বাবাকে বুকের ডাক্তার দেখাতে। মা বললেন, আখতার কাকুর কাছে যা। ততদিনে জেনে গেছিস আখতার কাকুর ছেলে ডাক্তারী পড়ছে। আখতার কাকু এই শহরের অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁর সাথে বড় বড় ডাক্তারের যথেষ্ট সম্পর্ক।

কজিনুকের সেই দরজায় সেদিনের রাত যেন পাকে পাকে অজগর। আখতার কাকু প্যাডে হার্ট স্পেশালিষ্টকে বিশেষ চিঠি লিখছেন। ঝুঁকে দেখলি .... বিয়িং আ ভেরি পুয়োর পেইড গভঃ সার্ভেন্ট হি ইজ আনেবল টু .....। আর পড়া গেল না। কতকগুলো বিষমাখা তীক্ষ্ণ তীর অন্ধকার জঙ্গল থেকে ছুটে এল। মেঝে থেকে চোখ তুলতেই তার মুখোমুখি। হাতের ডিশে দরবেশ, বোঁদে। তোর মুখের বিষাদ ওঠে এল চোখে। দেখল সে। তার চাহনিতে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। মৃত অজগরের শুকনো আঁশের মত গুটিয়ে গেল তোর চোখ। সে তার প্যাড গুছিয়ে পড়ার টেবিলে চলে গেল। আখতার কাকু বললেন, এভরিথিং উইল বি অলরাইট।

আখতার কাকু যাই-ই বলুন, ঠিক কথাটা বলল বোধহয় হারাণদা।

--- তোর বাপের এখন দক্ষিণে পা। ঝোলাটা দেইখ্যা রাখ।

কার ঝোলা দেখবি তুই? সেখানে তো মার বৈধব্যের নিমন্ত্রণ পত্র, কুন্ডলী পাকানো সরীসৃপের মত বোনের বেড়ে ওঠা শীত ঘুম! হার্ট স্পেশালিষ্ট বললেন তোর বাবার অলিন্দ নিলয়ের পাটাতন অনেক আগেই ভেঙে গেছে।

ঝঞ্ঝায় দুলতে থাকা জাহাজের ডেক কেবিনে কোন তফাৎ নেই। একই মরণ জল।

নদীরপাড়ের শ্মশানে ভোগালী বিহুর ঝলমলে রাতে জানতে পারলি নদী কেমন দক্ষিণে যায়! সেদিন পায়ে পায়ে সাথে হাঁটলেন আখতার কাকু।

তোদের বাসাবাড়ির দোরগোড়ায় এসে থমকে গেলেন আখতারকাকু। বললেন, তোমাক্ মুই মোর ভাবা পারে। চারদিকত্ বেয়া কাজিয়া দেখিছা না? তাত্ মাতিবা না। মাক্ কবা সকল কথা। প্রয়োজনত্ ঘর আহিবা। লাজ না করিবা।

আখতার কাকুর কথার ইঙ্গিতে অনেক কিছু ছিল। শান্তিক্লাবের কাঠের প্ল্যাংকিম এর নিচে বেশ

কয়েকদিন যাবৎ তখন অনেক কিছু মজুত হচ্ছে। তোদের উৎসুক চোখ ঘুরত প্ল্যামকিংএ। তোরা ছোট বলে প্রথম তাদের কেউ গা করত না। পাড়ার মধুদা, অসীমদা, শ্যামলদা তোদের সব কথা বলত না। শুধু বলত, শোন, তোরা পাড়ার বাইরে বেশি যাবি না।

বাবার মৃত্যুর সেদিন আখতার কাকুর কথায় যেন সেই সুর। তোদের ঘরের দুই সেলের ছোট ট্রানজিস্টারে তার আগের বছরগুলোতে যে কত খবর ভেসে আসত তার ছোঁয়ায় গ্রাম শহর নগরে তাজা ফলের লালিমা। তবু তোর চন্দনদার কথা মনে পড়ে। তোদের বাড়িওয়ালার ভাই-এর ছেলে। পালিয়ে এসেছিল কাকার কাছে। শুনেছিলি ফিরে গিয়ে পিঠে পুলিশের গুলি খেয়ে মারা যায়।

আখতার কাকু মধুদাদের কথায় যেন চন্দনদার কোন যোগসূত্র তুই সেদিন খুঁজে পেলি।

ঘরে এলি। সাদা এক দেয়ালে ন'বছরের শিশু সেঁটে আছে। দেওয়ালের পায়ের নিচে শঙ্খের কুচি, পলার রক্তবমি। নিঃশব্দে দরজা ভেজালি তুই।

ঠান্ডা মেঝেতে এবড়ো খেবড়ো চাটাই এ তোর পিঠ শক্ত হল।

একদিন তোর পিঠে চাপড় মেরে মধুদা বলল, তুই এবার পরীক্ষাটা দিতে পারলি না, ভালই হয়েছে। এই সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই, বুঝলি। এরা বাংলাটাকে তুলে দিতে চাইছে এখান থেকে। ওরা ইউনিভার্সিটি কলেজে বাঙালি স্টুডেন্টদের মারছে। এবার ওরাও মরবে। কিরে তোর সাহস আছে তো?

তোর মা যায় বাবার অফিসে। পেনশন গ্রাচুইটি ..... ততদিনে তুই জেনে গেছিস তোর মার একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে। বাবুদের জলদেওয়া, চা আনা, ফাইল খুঁজে দেওয়া .. ...। তোর চোয়াল শক্ত হল। মনে পড়ল তোর বাবার মুখ। পায়ের শুকিয়ে যাওয়া দাগটা স্পষ্ট দেখলি। মাথা নাড়লি তুই।

মধুদা বলল, আজ আমরা একটা অপারেশনে যাব রাতে। রাতে পাড়াটা তোরা লক্ষ্য রাখবি।

সেই শুরু। শকুনের ক্ষুধার্ত চোখের সামনে কবরে লাশ পোতা হয় কাকভোরে। গভীর রাতে চিতার কালো কাঠে নদীর বুকে অনেক ভেলা ভেসে যায়! ছোট্ট জনপদে পাড়ায় পাড়ায় সি আর পি'র ভারী বুটের আওয়াজ। হাড়-হিম সাইরেনে কারফিউএর ঘন্টা বাজে। মধুদা তোদের আর ছোট দেখেনা। এরইমধ্যে একদিন তাকে দেখতে পেলি। কলেজমোড়ে। দু'ঘন্টার কারফিউ বিরতিতে অস্থায়ী মঞ্চে তার উত্তপ্ত ভাষণ ঘিরে জনা পঁচিশ। ততদিনে তার চোখে নতুন চশমা। সোনালি আভার আদেশে সেই সান্ত্রীরা সজাগ যারা পাহারা দিত তাদের বৈঠকখানার কাচের আলমারি।

মধুদারাও শুনেছে। ক্লাব ঘরের সেদিন রাতের গোপন মিটিংএ তোদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। পরদিন মধুদা সি আর পির চোখ এড়িয়ে অন্ধকারে কি করে যেন তোদের বাসায় এল। তোকে জিজ্ঞেস করল, আখতারদের বাসায় যখন ছিলি, ওর ছেলেকে তোরা দেখেছিলি ? তুই না বলতে মধুদা বলল, চ্যাংড়াটা মেডিকেল কলেজে দুটো বাঙালি স্টুডেন্টকে মেরে এখানে পালিয়ে এসেছে। এখানেও ..... শোন, কারফিউ উঠে গেলে বাজার ফাজার যাবি না। তোকে ঠিক চেনে। আমাদের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে। আর শোন .... আজ থাক। মধুদা কথাটা শেষ করল না। যেমন পালিয়ে এসেছিল,

তেমন চলে গেল।

তুই মধুদার আগুনে চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারলি না। দেখলি দরজার পর্দা ছেড়ে মা ভেতরে চলে গেল। গভীর এক যন্ত্রণা বিন বিন করে ছড়িয়ে গেল দু'ঘরে।

তার বোধহয় দুদিনও যায় নি। অনেক রাতে সেদিনের মত নিঃসাড়ে ঢুকল মধুদা। তোরা পাড়ায় আক্রমণের ভয়ে পালা করে রাত জাগিস। কেউই ভাল করে ঘুমোতিস না তখন। মধুদার নিচু স্বরে ডাক শুনতে পেলি। দরজা খুলতেই মধুদা বলল, কাকিমা জাগা?

তুই জানতিস বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা কখনও রাতে ঘুমোয় না। তোর হ্যাঁ বল মধুদা শুনলই না। সটান ঢুকে গেল ঘরে। মা উঠে বসেছে। মধুদা বলল, কাকীমা, ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি। কেউ এলে কিছু বলবেন না। ভয় নেই, ওর কিছু হবে না।

মা নেমে এল বিছানা থেকে। অনেক দিন পর এক কঠিন না শুনতে পেলি মার মুখে। পিছিয়ে এল মধুদা। মা এবার বলল, তুমি যাও মধু .....আরও অনেকে আছে --- তাদের বলো।

একটা মশাল নিভে গেল সহসা। মাথা নিচু করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মধুদা। মা তোকে একটা কথাও না বলে দোর ভেজিয়ে দিল। সারারাত ঘুমোলি না। পরদিন কারফিউ উঠে যেতেই তোকে বাজার যেতে হল। তোর বোনের জন্য ওষুধ আনতে। রাস্তায় আবার মধুদা ধরল। বলল, কাকীমার ভয় আমরা বুঝি। কিন্তু অমলের ডেডবডিটা দেখেছিস ......?

দিন পাঁচেক আগেই পাড়ার অমলদাকে বিদ্যাপাড়ার খেলার মাঠে গোলপোষ্টের নিচে পাওয়া যায়। সারা মুখটায় ছুরির ঘা। চেনাই যাচ্ছিলনা। ভাল গাইয়ে অমলদার গলার নলীটাই দু'টুকরো করে দিয়েছিল।

তুই মাথা নাড়লি। মধুদা বলল, একমাত্র তুই সেফ। আখতারের ছেলে মিশনরোড দিয়ে এই সময় কোথায় যেন যায়। তোকে চিনিয়ে দেব। তুই শুধু ফলো করবি।

তুই বললি, ফিরতে ফিরতে কারফিউ পড়ে গেল?

মধুদা বলল, কারফিউ পড়ার আগেও ফিরবে।

মধুদা চলে গেল হঠাৎই। তুই দ্রুতগতিতে দোকান বাজার করা মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে রইলি আনমনা। বুঝতে পারছিস না কি করা উচিৎ। মধুদার চোখের ভাষা বোঝা যায় না। একদিকে মধুদা তোর আদর্শ, অন্যদিকে মা'র তীক্ষ্ণ 'না', আখতার কাকু .....। তুই দোলাচলে দুলছিস। শরীর কাঁপছে। শরীরের কম্পন কারফিউ এর তীব্র সাইরেনে সহসা মিশে গেল। উর্দ্ধশ্বাসে ছুট লাগালি। হঠাৎ মুখোমুখি ধাক্কা লাগল যার সঙ্গে সেই মানুষটা যে সকলকে ছুরির ফলার ঘায়ে রক্তাক্ত হয়ে ছুটছিল, বুঝতে পারিস নি। দীর্ঘ বাহু যুবকের বেশী দূর যাওয়ার ক্ষমতা নেই। হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে শুনতে পেলি ---- ইন্‌সাল্লা।

কয়েক জন ছুটে আসছে। আগে আগে মধুদা। তোর সাদা জামার বুকে তাজা লাল রক্তে অদ্ভুত মানচিত্র। মধুদার গলা, পালা যত জোরে পারিস।

বাজার ছাড়িয়ে তোরা ছুটছিস। পেছনে অচেনা তিনজন। মধুদা রানে ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান। তুই

পারবি কেন মধুদার সঙ্গে! রেল লাইন টপকে ইঞ্জিন শেড, মেথর পট্টি নিমেষে পার হয়ে গেল। পেছনের তিনজন তোকে ছুঁয়ে ফেলল। ততক্ষণে সব শুনশান। ওরা তোকে নিয়ে গেল ইঞ্জিন শেডের ভেতরে। মাটিতে বসে যাওয়া মালগাড়ির এক কামরায়। স্কুলে যেতে বহুবার তোরা ঐ কামরাটা দেখেছিস। কিন্তু সেদিন দেখলি তার ভেতর। ভেতরে দুজনের হাতে দুটো ছুরি। কিছুক্ষণ পর অন্ধকার নেমে এলে ওরা তোকে নিয়ে বেরিয়ে এল। এ গলি সে গলি করে ওরা তোকে যে বাড়িতে নিয়ে এল , সেখানে ঘুমন্ত এক লাশ। চেনা না অথচ খুব যেন চেনা। লাশ ঘিরে কতকগুলো ছবি। নির্বাক। কয়েক জোড়া চোখের মধ্যে দুটো চোখ তোর চোখে আটকে গেল। চোখের জলে করুণা ঘেন্না কতটা মিশতে পারে তার পাঠ তোকে এর আগে শেখায়নি কেউ। তুই দু'হাতে তোর চোখ ঢাকলি। বাইরে তখন জীপের চাকার আওয়াজ। আওয়াজে গুঁড়িয়ে গেল অজস্র শীলমোহর। তোর বেঁকে যাওয়া শিরদাঁড়ার মই বেয়ে উঠে এল একের পর এক হাতকড়া।

তারও কয়েকমাস পর সে আওয়াজ যেদিন থামল, চাঁদমারির মাঠ ছুঁয়ে নদীর লএএকতারায় কাফী রাগ। তার কিছু দিন আগে সার্কিট হাউস, টেনিস মাঠের দক্ষিণ কোণের খেয়াঘাটে রে বিধবা মায়ের দু'হাতে দুটো বোঝা। অন্ধকারের দাঁড় বেয়ে কত নদী পার হল, তা কেউ জানে না।

আজ সে নদীর বহুদূরে নিমগাছের ছায়ার আড়ালে দক্ষিণের জানালায় বাতাসে কোন সুর? প্রায় তিরিশ বছর পরে আজও কি সেই নদীর একতারায় ইমন কাফী বাজে? জানিস না তুই। শুধু টের পাস সেই নদী ছড়িয়ে গেছে আরও দূর। তোর ভেঙে যাওয়া শিরদাঁড়ায় এখন যে গভীর ক্ষত ..... শত কেমো .... রঞ্জন রশ্মির নীলচে আলো ----- তা ছাপিয়ে ওই যে দু'চোখ যাতে লাবণি প্রদোষে সন্ধ্যারাগ তাতে কি সেই চোখ দু'খানি দেখতে পাচ্ছিস না? ঠিক এরকমই তো সে কুড়ি একুশ তখন। কলেজ থেকে বের হত তোকে শিরীষ গাছের আড়ালে রেখে। আজও তো সে হেঁটে গেল নিজের মনে। সেই এক গোলাপী হাত। সেই হাতে চুলের অহঙ্কারকে শাসন করে সে কেমন তার বন্ধুদের বলছে, হিজ ডেজ আর রিয়েলি নাম্বার্ড।

সে কথাগুলো খুব আস্তে বললেও তুই তার ঠোঁট নাড়া বোধহয় ঠিক মেলালি। না হলে হারাণদাই বা কেন কানের কাছে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, ঝোলাটা ঝাড়রে ছোঁড়া।

গণতন্ত্র, একটি লিটলম্যাগের গল্প ও মণীষা

সুরঞ্জন প্রামাণিক

আজ তাহলে সুবিমল আর এল না। প্রায়ই নটা, সাড়ে নটা নাগাদ আসে। এগারোটা বাজতে দশ। মণীষার মন খারাপ আরও ছড়ালো।

দিনদিন আমি বোধহয় খুব রুক্ষ হয়ে পড়ছি। ওভাবে না বললেই হ'ত। আর সত্যিই তো, আমি কী বুঝি! কতটুকুই বা জানি! পাঠ্যবইয়ের বাইরে খবরের কাগজ — আর কী পড়েছি? সুবিমলরা কত জানে!

তবু, গণতন্ত্র বলতে যে একটা পরিচালন পদ্ধতি বোঝায়, এটা যে তার মাথার মধ্যে কবে, কিভাবে ঢুকে পড়েছিল — একেবারে মগজে গেঁথে আছে।

তখন উন্নয়ন নিয়ে কথা হচ্ছিল। সুবিমল আর কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত তুমুল তর্ক। সুবিমল বলছিল, 'দশ বছর আগে, এ গ্রামে কটা পাকাবাড়ি ছিল, আর এখন?'

অর্ণব বলেছিল, 'পাকাবাড়ি দেখে উন্নতি বুঝলে মুশকিল—'

সুবিমলের পক্ষে একজন বলল, 'বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে না, আগের মতো ভিখিরিও দেখতে পাবে না—'

তখনই মণীষা বলেছিল, 'এটাও উন্নতি বোঝায় না—'

সুবিমল উত্তেজিতভাবে বলেছিল, 'কিসে বোঝা যাবে?'

মণীষা বলেছিল, 'প্রতেকটা মানুষ যখন সম্মানজনক কাজ করতে পারবে—'

সুবিমল দৃঢ়ভাবে বলেছিল, 'সেটা কখনও সম্ভব না—'

মণীষা ততোধিক দৃঢ়তা স্বরে এনে বলেছিল, 'সম্ভব! যদি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক হয়।'

—'তুমি কি জানো, চিনে ওই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক কোটিরও বেশি মানুষ এক সময় দুর্ভিক্ষে মারা গেছে?'

মণীষা চুপ ছিল। উত্তেজিত সুবিমলের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল।

—'তুমি কি জানো, অমর্ত্য সেন সেই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সেখানে গণতন্ত্র না থাকা?'

তখন একটু চুপ থেকে মণীষা বলেছিল, 'সেটা সমাজতন্ত্রের দোষ নয়—'

—'কী বলছ পাগলের মতো। গণতন্ত্র থাকলে অমনটা হ'ত না — যেমন ভারতে হয়নি— বিহার, মহারাষ্ট্র কিংবা বাংলায়—'

তখন অর্ণব বলল, 'তুমি কি জানো সুবিমল, চিনের গরীবেরা এদেশের গরীবদের থেকে অনেক বেশি খেতে পরতে পায়—এটা কিন্তু আমার কথা নয়, অমর্ত্য সেনেরই মন্তব্য—'

তখনই মণীষা বলে উঠেছিল, 'গণতন্ত্র একটা পরিচালন পদ্ধতি, চিনে হয়ত সেই পদ্ধতি সেভাবে

ব্যবহার করা হয়নি—'

তখন আর একজন বলেছিল, 'এদেশে আর কিছু নাহ'ক দুর্নীতির যে গণতান্ত্রিকীকরণ হয়েছে— এটা কিন্তু বেশ বোঝা যায়—'

ওই কথায় হঠাৎই যেন সবাই চুপ হয়ে গেছিল।

সবার আগে সুবিমলকে চলে যেতে দেখেছিল মণীষা। তারপর দুজন কেনাকাটি করেছিল কিছু। চতুর্থজনের মুখ তখনও খবরের কাগজে ঢাকা।

কারও সঙ্গে মণীষা খারাপ ব্যবহার করতে চায় না। খরিদ্দারের সঙ্গে তো নয়ই। তাতে তার ব্যবসার ক্ষতি। ধার-বাকি দিয়ে ভালো ব্যবহার করেও খরিদ্দার ধরে রাখা যাচ্ছে না। যদি কখনও, সেরকম ঘটেও যায়, দেখা হলে পর, সে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অথবা বলে, 'কিছু মনে করবে না— কথার কথা মাত্র।' কিন্তু সুবিমলকে কী বলা যায়? সুবিবলের সেই চলে যাওয়ার পর থেকেই মণীষা ভেবেছে। তাতে ওই ভাবনায় ঠিক মতো ঘুমও হয়নি। সুবিমল তার একজন খরিদ্দার ঠিকই. তারও চেয়ে'বড় কথা, বন্ধু—আরও একটু এগিয়ে মনের গোপন কুঠুরি খুলে দিয়ে তাকে প্রেমিক ভাবতে ভালোই লাগে—যদি সে প্রেমিক হয়ে উঠত! এরকম ভাবনায় খুব দীর্ঘশ্বাস জমে বুকে। মণীষা ভেবেছিল সুবিমল এলে বলবে, 'সুবিমলদা, রাজনীতির কী বুঝি আমি—জানো তো এর চেয়েও আমরা খুব গরীব ছিলাম—সবাই কাজ পাবে, খেতে পাবে—জামা-জুতো—বাবার মুখে এরকম শুনতে-শুনতে সমাজতন্ত্রের প্রতি একটা বিশ্বাস—কিছু মনে করো না তুমি।'

তখন হয়ত সুবিমল বলবে, 'ঈশ্বর বিশ্বাসের মতো!' ব্যঙ্গ, তবু মণীষা বলবে, 'তা বলতে পারো—তেমনই মনে হয়, সমাজতন্ত্রে তুমি আর বেকার থাকবে না কিংবা আমাদের সন্তানেরা।' তখন সুবিমল কী বলবে কে জানে!

খরিদ্দার না-থাকলে এরকম নানান ভাবনা মণীষাকে জাপটে ধরে। লেখা-পড়া শিখতে শিখতে অদ্ভুত এক কল্পলোক গড়ে উঠেছিল। হায়ার সেকেন্ডারীর গন্ডিটা পার হতে পারলে কী হ'ত কে জানে! পার না হতে পারায় ফানুসের মতো চুপসে গেল সব। তার পর-পরই বাবার মৃত্যু—দোকানে বসা শুরু। রান্নাবাড়ি, পুতুলখেলা আর 'শ্বশুরবাড়ি' শুনতে শুনতে মণীষা আরও যে একটি কল্পলোক পেয়েছিল, সেখানে দোকনদারি ছিল না—এ তল্লাটে সে-ই একমাত্র মেয়ে মুদি। এখন নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলেই সামনে সব অন্ধকার, তখন মা আর ভাইকে নিয়ে তার যত ভাবনা। তারই মাঝে এক-একদিন সুবিমল ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে মাত্র। কোনো কল্পনা জাগে না যা স্বপ্নে রূপান্তরিত হতে পারে।

অল্প পরিমাণ জিনিস দেওয়ার জন্য যে কাগজ-বই দাঁড়িপাল্লার কাছে রাখা আছে অন্যমনস্কভাবে মণীষা তার থেকে কাগজ নিতে গিয়ে একটা ছেঁড়া বই উঠে এল। পিনটা তোলা হয়নি। তুলতে গিয়ে প্রথম লাইনে তার দৃষ্টি আটকে গেল...একটা অনুচ্ছেদের শুরু—

প্রথম কুঁকড়ো বাক্ দিলে নমিতার চোখের পাতা একটু নড়ে ওঠে।

মণীষার মনে পড়ল, এটা তারও হয়—প্রায়ই মোরগের ডাকেই তার ঘুম ভাঙে।

প্রায়ই ভোরের দিকে কী সব হাবিজাবি স্বপ্ন—সবই তার শরীর ঘিরে— পিন তোলার ছুরিটা

পাশে সরিয়ে রাখল। সাপ উঠছে গা বেয়ে—ফণা হয়ে যাচ্ছে হাত, তার স্তন চলে যাচ্ছে হাতের মধ্যে, একটু যেন শিহরণ। রুদ্ধশ্বাস। আরও কত কী—সিনেমায় যেমন ধর্ষণের দৃশ্য—অনেকটা সেরকম। নমিতা অবশ্য তাতে ভয় পায় না। কুঁকড়ো ডাকে ওই সব স্বপ্ন মিলিয়ে যায়। ঘুম ঘুম ঘোরের মধ্যে সে তার মন খারাপ টের পায়।

মণীষা যেন নমিতার মন খারাপ ছুঁতে চাইল।

একই সঙ্গে আগের পৃষ্ঠার জন্য একটা দুঃখ। বইটার পেছনের মলাট দেখল—এঠা ঠিক বই নয়, পত্রিকা—সে আবার গল্পে ফেরার কথা ভাবল। কোনো এক নমিতার গল্প — গল্পের শুরুটা জানলে ভালো হ'ত—কিন্তু তার আর উপায় নেই, সে যে কেন পণ্যে মোড়ক হয়ে কার কাছে চলে গেছে! কয়েকটা পাতা উল্টে সে ঘড়ি দেখল বারোটা বাজতে যাচ্ছে। লেখায় চোখ ফেরতেই একজন খরিদ্দার। বইটা সরিয়ে রাখল। ভাবলে, দুপুরে খাওয়ার পর পড়া যাবে নিরিবিলি।

হেমন্তের এই সময়টা বড় বিষণ্ণতায় ছেয়ে থাকে—রোদ্দুর যেন ততো উজ্জ্বল নয়, সবুজ পাতায় মধ্যে হলুদপাতা চোখে পড়ে বেশি; একটু হাওয়া দিলে পাতা খসে পড়ে—দুপুরের এই সময়টাতে পুকুরঘাটে বসে মণীষা প্রকৃতিকে যেন দু'চোখ ভরে দেখে। এখন যেমন বিষণ্ণতা, বর্ষায় এবার তেমনই উচ্ছল মনে হয়েছিল চাদ্দিক—বৃষ্টি শুরু হতেই সব শুনশান—মণীষার দোকানে তখন সুবিমল আর একজন আটকেপড়া মানুষ—বৃষ্টি একসময় একটু কম হতেই সেও বাড়ির পথ ধরেছিল। তারপর সুবিমল আর সে। বৃষ্টির ছাট রুখতে আগে থেকেই একটা ঝাঁপ ফেলে দিয়েছিল।

কোনো কথা ছিল না। কেবল বৃষ্টির শব্দ। মণীষার বুকের ভেতর বৃষ্টি-বৃষ্টি—কী অদ্ভুত গুনগুনিয়ে উঠেছিল—আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়—

তখন একসময় সুবিমল বলেছিল 'এবার বন্যা হবেই—' কেমন একটা ঘোরের মধ্যে মণীষা বলেছিল, 'ভেসে যাবো।'

সুবিমলের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা লক্ষ করে সে বলেছিল, 'মানে—জানো তো সেবার জল আমাদের উঠোন ছুঁয়েছিল। যা বৃষ্টি! এভার ঘরে উঠবে। আমাদের তো আর পাকাবাড়ি না— তাই বলছিলাম।'

তারপর, অনেকক্ষণ পর মণীষা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী ভাবছ?'

—'তেমন কিছু না।'

—'তবু।'

—'তোমার ভয় করছে কি-না।'

—'কেন? কিসের?'

মুহূর্ত কয়েক মণীষার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সুবিমল বুঝি বুঝতে চেয়েছিল, সত্যি কি সহজ-সরল, না কি ভান—বোধহয় বুঝতে পারেনি কিছুই কিংবা বুঝেছিল সহজ সরল— আমি তো এক মেয়ে দোকানদার, ওসব ভয় আমাদের থাকতে নেই কিংবা ওসব ভয়ের যোগ্যতাও হয়ত বা নেই—তবু, সুবিমলের মনে ওই 'ভয়' ঢুকেছে জেনে, সমস্ত বর্ষাকালটাই কী দারুণ কেটেছে। আবার যদি অমন

বৃষ্টির মধ্যে কখনও আসে মণীষা বলবে, 'সুবিমলদা, আমার খুব ভয় করছে।'

সুবিমল বলবে, 'কেন? কিসের।'

সে বলবে, 'জানি না।'

তখন কি সুবিমল বলবে, 'আমাকে ভয় পাচ্ছ না তো?'

যদি বলে, মণিষা বলবে, 'তোমাকে? ভয়? কেন?'

—'যদি আমি—'

—'সে সাহস তোমার নেই।'

তখন কি সুবিমলের পৌরুষ আহত হবে আর সে জাহির করবে তার বিক্রম? এরকম কত ভাবনা বিগত বর্ষা জুড়ে—তেমন সন্ধে আর আসেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মণীষা জলে নামল।

'...ঘুম-ঘুম ঘোরের মধ্যেও সে তার মন খারাপ টের পায়।' মণীষা এবার নমিতার মনখরাপ ছোঁয়ার কথা না-ভেবে পরের অনুচ্ছেদে ঢুকে পড়ল ঃ

দ্বিতীয়বার কুঁকড়ো ডাকলে, তাকে চোখ খুলতেই হয়—অন্ধকার। চোখের পাতা আপনা থেকেই বুঝে আসে, তারমন কিন্তু ভাবে, উঠতে হবে। না হলে ছটা বাইশের ট্রেন ধরা যাবে না।

এখান থেকে দু কিলোমিটার হাঁটপথ। তারপর পাকা রাস্তা। সেখান থেকে বাসে বা ভ্যান রিকশা—ভ্যান রিকশায় গেলে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। বাসে গেলে হাঁটতে হয় পাঁচ-সাত মিনিট।

সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে বাজারে নিজেকে না-তুলতে পারলে বিক্রি হওয়া মুশকিল আছে—তাতে আবার নমিতা ঝড়তি-পড়তি মাল বলতে যা বোঝায় তাই—আগে ভাগে বাজারে উঠলে টানের মুখে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে— রং মিস্ত্রির, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে, জঙ্গল পরিষ্কার করা কিংবা ঘরগেরস্থালির অন্যকাজে—তারপরও যে কাজ জোটে না তা নয়, তবে ফিরেও আসতে হয় কোনো-কোনো দিন।

তাকে ধরতেই হয় ছটা বাইশ। তবু উঠতে ইচ্ছে করে না।

যদি কাজে না যাই? একা একটা পেট। কী হবে? তবু যায়। কাজে বের হওয়া যেন একটা নেশার মতো। ছটা বাইশের সঙ্গীসাথীরা—হাসিঠাট্টা, ইয়ার্কি মস্করা—বেশ তো কেটে যায় সময়। মনের ভারও। কেমন হাল্কা লাগে। তার এই ছোটোখাটো শরীরের কোল আর কতটুকু, তবু এই যখন শ্যামল বসে পড়ে, কই তেমন তো ভার মনে হয় না। — কোনো পুরুষের সঙ্গ ঠিকভাবে পাওয়া হল না এ জীবনে — বাবা বড়দির বিয়ে দেবার পরপরই পটলডাঙ্গায়, ভাইরা কাজের খোঁজে কে কোথায় চলে গেল—পড়ে থাকল মা আর মেয়ে—ছোট ভাই কলকাতায় পাতাল রেলের কাজ করতে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে মরল, বড়দার কোনো খোঁজ নেই, আগে মাঝেমধ্যে দু একটা চিঠি আসত—মা, কত দুঃখ-শোখ বুকে নিয়ে মরে গেছে—কে আর বিয়ের কথা ভাববে—অনেক বয়েস হয়ে গেল। তারই বয়েসী অষ্টমী, এবার তার মেয়ের বিয়ে।

নমিতা মাঝেমধ্যে ভাবার চেষ্টা করে। বেঁচে থাকার দরকারটা কী। এক-একদিন রোজ সকালে শূন্য এই ঘর ফেলে যাওয়া আর ফিরেও আসা সেই ফাঁকা ঘরে একা। একা।

কী যে মানে ছাই বেঁচে থাকার।

মণীষার মনে হয় এরকম কথা যেন সেও কখনও না কখনও ভেবেছে নমিতার বয়েস আন্দাজ করল সে—ত্রিশ বত্রিশ হবে, তার সাতাশ—কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাল আবার পড়তে থাকল :

তবু বেঁচে থাকার নিয়মে বেঁচে থাকা। পোকার মতো। কুকুরের মতো। না। কুকুরের তবু ভাদ্দর মাস থাকে। সে যত খেঁকি হ'ক না কেন, কত মদ্দা তার চারপাশে ঘুর-ঘুর করে, পছন্দমতো একটাকে বেছে নেয় সে—না, এ জীবন কুত্তিরও অধম। তবু বেঁচে থাকা—এও যেন এক নেশার মতো—ছটা বাইশ তাকে ধরতেই হবে, ওইখানে বেঁচে থাকার একটু আনন্দ—

সেই যে বাবুদের গান আছে—একটুকু ছোঁয়া লাগে—সেইসব ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে বেঁচে থাকা—

প্রতিদিন ভোরের আলোমাখা মুখ হাত-আয়নায় দেখে নমিতা মুগ্ধ হয়। এই তো গালটা একটু ফোলা-ফোলা মনে হচ্ছে না! চোখের কোল ভরাট।

বাড়ির কাজকর্ম করানোর জন্য যেসব পুরুষেরা, মেয়ে মজুর কিনতে আসে তাদের চোখ দেখে আর কারও-কারও অভিজ্ঞতার কতা জেনে নমিতার মনে হয়, তার শরীরটা যদি একটু ভরাট হত, দেখতে তো সে একেবারে খারাপ না সেই উঠতি বয়সে মা-পিসিরা বলত, ওই মুখে সর্বনাশা হাসি—বাঁ গালে কেমন টোল! টোলে কি টাল খায় পুরুষের মন? কে জানে—এখন হাসলে চামড়া কেন কুঁচকে যায়— যদি মুখটা ভরাট হয়ে উঠত আবার — কাজের অভাব হ'ত না — একটু মজাও—

শেষ পর্যন্ত নমিতা মশারির বাইরে আসে। মশারি ভাঁজ করে চাটাই গোছায়। তখন মধু গোঁসাইর করতাল ধ্বনি দূর থেকে ভেসে আসে। করতাল বলে জয় রাধে জয় রাধে—মধু গোঁসাই গায়, রাই জাগে রাই জাগো — কখনও শচী রানির আঙিনায় গৌরচাঁদ—

নমিতার উঠোন বাদলা ঘাসে ঢেকে যাচ্ছে।

দুই

আট ক্লাস পড়া মন্টু মস্তান এখন মন্টু ডাক্তার। অবাক কান্ড। যারা জানে তারা জানে। আর যারা জানে না, তাদের কাছে মন্টু ডাক্তার ডাক্তার, মান্যিগন্যি — ধন্বন্তরি। নমিতা জানে তবু ধন্বন্তরি মানে -- মন্টু ডাক্তারের কাছে এমন ওষুধ আছে, যা নাকি যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারে। শোনা কথা।

তবে এ বয়সেও তার যা চেহারা, দেখে সত্যি মনে হয়। বলতে গেলে মন্টুডাক্তার তার বাপবয়েসী অথচ, বাপ সেই কবে ভূত হয়ে গেছে। ইদানিং প্রায়ই ভোরবেলা দেখা হচ্ছে। মন্টু ডাক্তার ভোরবেলা হাঁটতে বেরোয়। বেশ গম্ভীর রাগী মানুষ। পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। আবার সে যখন ফেরে,তার ওষুধের দোকানে খরিদ্দার, ইয়ারবকসিদের ভিড় - সেই যৌবন ফিরে পাওয়ার ওষুধের কথা বলা যায় না - দু একটা গ্যাস অম্বলের বড়ি নিয়ে ফিরে আসে।

ডাক্তারের দোকানের দিকে যেতে যেতে নমিতা লক্ষ করেছিল, দোকানের সামনে দুজন দাঁড়িয়ে -- দোকানে পৌঁছতেই কেউ নেই। একা মন্টু ডাক্তার। তিনদিকের শো-কেস ভর্তি নানা ওষুধের মোড়ক -- কিছু কিছু মোড়কে দারুণ সব ছবি - সুখের ছবি, নারী-পুরুষ – মা-বাবা ছেলে মেয়ে - নমিতা কোনোরকম ইতস্তত না করে বলে ফেলল, 'ডাক্তারকাকা, গা-গতরে একটু তেলমাংস লাগার ওষুধ দিতে পারো?

মন্টুডাক্তার কয়েকপলক নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। নমিতার যুবতী বয়সের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। চোখ বন্ধ করে ভাবল। তা পারি। কিন্তু ভেতর থেকে ক্ষয়ে আসা ওই শরীর কি নিতে পারবে সে ওষুধ?

না। মন্টু ডাক্তার চোখ মেলে বলল, 'না।'

—'কেন?'

--'সেরকম কোনো ওষুধ নেই।'

--'কিন্তু লোকে যে বলে--ওষুধ আছে, তুমি জানো –'

--'ওসব রটনা। ভালো করে খা -- দেখবি ঠিক হয়ে গেছে সব'।

খুব মন খারাপ হয়ে গেল নমিতার। তার শরীর ভালো হওয়া মানে, এই রুগ্ন বাবু দেখানোর ওপর নির্ভর করছে একটা কাজ পাওয়া। রুমকির একটা বাধা বাবু আছে - বুড়ো, পয়সাওলা - রান্নাটান্না করে দিতে হয়, আরও টুকিটাকি কাজ। রত্না ফিচেল হেসে বলেছিল।'এক কথা, বউ যা-যা করে আর কি'।

রুমকি একটু মুখ বাঁকিয়েছিল। আর তাতেই ওরকম একটা কাজ পাওয়ার বাসনা। জানিয়েছিল ওই রুমকিকেই। রুমকি বলেছিল 'টিবি রুগীর মতো এই শরীর, কেউ রাখবে বলে মনে হয় না - তবু দেখব -'

জোছনা ছড়ানো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নমিতা ভাবল, মন্টু ডাক্তারকে বলতে ভুলে গেলাম - আমার খিদে পায় না, নাকি খেতে ইচ্ছে করে না - ঠিক বুঝি না।

মণীষা ভাবল, অদ্ভুৎ তো, এরকম হয় নাকি - খুব মন খারাপ থাকলে অবশ্য খেতে ইচ্ছে করে না - যেমন আজ, এই একটু আগে, আমার খেতে ভালো লাগছিল না -

তিন

আজ মধ্যবয়সী একটা লোক নমিতাকে কিনল। লোকটা তারই মত রুগ্ন। মুখ একেবারে ভাঙাচোরা। তার বাড়িতে কিছু কাজ আছে। ধোয়া কাচা করা। যাওয়ার পথে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রান্না করতে পারো?'

-- 'পারি।'

– 'তোমার আর কে আছে?'

—'আমি একা।'

লোকটা বোধ হয় বিশ্বাস করেনি। নমিতার মুখের দিকে বারকয়েক তাকালো।

জিজ্ঞেস করল, 'কেন নেই - তোমার বর কি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে?'

-- 'আমার বিয়েই হয়নি।'

লোকটা কিছুক্ষণ আর কিছু বলেনি। যেন কিছু ভাবছিল। এক সময় বলল, 'আমিও একা।'

নমিতা ভাবল এবার জিজ্ঞেস করা যায় না - কেন?

লোকটা ইংরেজিতে কিছু একটা বলল। পরক্ষণেই যেন ভুল হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমার বউ, আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

এটা দুঃখজনক ঘটনা। এরপরে কী বলা উচিত নমিতা বুঝতে না পেরে চুপ থাকল।

লোকটা বলল, 'ভালোই করেছে' --

লোকটার জন্য নমিতার দুঃখ বোধ জাগছে।

লোকটাকে দুখী মনে হচ্ছে।

একটা মাংসের দোকানের সামনে লোকটা দাঁড়ালো।

বলল, 'তুমি যখন রাঁধতে পারো, একটু মাংস নিই। তোমার আপত্তি নেই তো?'

নমিতা সংকোচে মাথা নাড়ল।

কাচাকাচি তেমন বেশি কিছু ছিল না। সাড়ে দশটা মধ্যে সব শেষ। নমিতার কাপড় ভিজে গেছিল। লোকটা দেখে বলল, ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে একটা কাপড় দেয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে-' বলে সে আলমারি থেকে একটা কাপড় বের করে বলল, 'তুমি চান করে, এটা পরো-'

—'এত দামি কাপড় —'

—'এটা! আমার বউ-এর ছিল-তুমি পরলে কোনো অসুবিধে নেই —'

তার পুরনো ব্লাউজ আর নতুন প্রায় কাপড়ের ঠিক ম্যাচিং হয়নি এটা বুঝতে পারছিল নমিতা তবু, বাবুবাড়ির বড় আয়নায় নিজেকে একবার দেখল আর তাতেই অদ্ভুৎ এক কান্না - বুক উথালপাথাল - গুমরে উঠতে চাইছিল।

মণীষা চেপে রাখা কান্নার দাপটে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া নমিতাকে কল্পনা করতে পারল কিন্তু কান্নার কারণটা যে ঠিক কী - অপমান, মিথ্যে পাওয়ার জন্য - নাকি আরও অন্তর্গত কিছু?

চার

লোকটা তার নাম জিজ্ঞেস করছিল। তা নাম শুনে সে বলেছিল, 'আমার বউ-এর নাম ছিল অর্পিতা।'

দীর্ঘশ্বাস পতনের শব্দ শুনে নমিতা বলেছিল, 'দিদিমনি এত সাজানো গোছানো ঘর ছেড়ে চলে গেল কেন।'

—'পাওয়ার বোঝে, পাওয়ার — ক্ষমতা — সে তুমি বুঝবে না, বনিবনা হয়নি আর কি?

লোকটার নাম জানা হয়নি। আর কি আসবে কখনও তাকে কিনতে -- মাংসটা নাকি দারুণ রান্না

হয়েছিল--

লোকটার বাড়িটা যে ঠিক কোথায়, যাওয়ার সময় কিছুটা অটোয়, তারপর হাঁটা পথ, এগলি সেগলি হয়ে সাদা রঙের একটা বাড়ি --

ওই লোকটা তো তাকে রাখতে পারত। লোকটা অবশ্য বার বার লক্ষ করছিল। হয়ত তাকে সেভাবে পছন্দ হয়নি। মাংস আর একটু চনমনে ভাব থাকলে হয়ত -- এসব ভাবনায় আজ আবার নমিতা মন্টু ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ভাবল। কথা সাজাতে থাকল মনে-মনে ঃ ডাক্তারকাকা, জানো তো গতর খাটিয়ে খাই -- শরীলে শক্তপোক্ত একটা ভাব না থাকলে কেউ কিনতে চায় না -- দ্যাও না তেমন কোনো ওষুধ -- যাতে শরীলটা একটু চাঙ্গা হয় –

কেমন যেন মিনতি, কাঙাল-কাঙাল – তারপরেই ভাবল, কোথাও কোনো স্বজন-বন্ধু নেই – ছটা বাইশের শ্যাওলার মতো কয়েকজন - কী হবে বেঁচে থেকে - বিষণ্ণ নমিতা তবু, মন্টু ডাক্তারের দোকনের সামনে, ফাঁকা হওয়ার অপেক্ষায়। সব কথা শুনে মন্টু ডাক্তারের যেন একটু মায়া হল। সেরকম মনে হতেই নমিতা বলল, 'বেঁচে থাকার কোনো মানে বুঝি নে।'

ডাক্তার যেন একটু চমকে উঠল। নমিতা ন-পার্টের বাসিন্দা। একটা ভোট। মহামূল্যবান। এবার মন্টু ডাক্তার পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়াচ্ছে। মৃত্যুর কথা ভাবছে নাকি মেয়েটা?

ডাক্তার বলল, 'এ জীবন পরম করুনাময় ঈশ্বরের দান - আছে রে আছে - মানে আছে। বোস।

নমিতা বসল।

মন্টু ডাক্তার এক পাতা ওষুধ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দিনে একবার - পেট ভরে খাবি–'

ডাক্তার মনে-মনে ভাবল, আত্মহত্যার চেয়ে খুব বেশি ক্ষতি হয়ত হবে না।

ওষুধটা হাতের মুঠোয়। হাঁটতে-হাঁটতে নমিতা ভাবল, তা থাকতে পারে, কোথাও একটা মানে থাকাটাই স্বাভাবিক।

মণীষা বইটা রেখে চিৎ হয়ে শুলো। তার কিছু ভাবতে ভালো লাগছিল না। মন খারাপের ওপর আর একটা মন খারাপ। বেঁচে থাকার এই গল্প সুবিমলকে পড়ানোর কথা ভাবল একবার।

সুবিমল সন্ধ্যের পর মাঝে মধ্যে আসে। কাল সন্ধেয় তার না আসাটা মণীষাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। একটা খরিদ্দার নষ্ট হয়ে যাওয়ার থেকে বড় কথা, জীবন থেকে একটা বন্ধু হারিয়ে যাওয়া। মনে হল, রাজনৈতিক আলোচনায় তার না-যাওয়াই ভালো। রাজনৈতিক বিশ্বাস এক একজনের এক-এক রকম, কে যে কিসে আহত হয়।

সকালের দিকটা খরিদ্দার সামলাতে বেশ ব্যস্ততায় কেটেছে। তারই ফাঁকে চোখ সুবিমলের আসার পথে ছুটে গেছে বারবার।

সাড়ে নটার পর সুবিমল এল। খবরের কাগজটা চাইল। মণীষার একবার বলতে ইচ্ছে হল, –

আগে এটা পড়ো – সে বইটা তুলে নিয়েও রেখে দিল। ওর ইচ্ছের জোর খাটানোর মতো সম্পর্কের কোনো ভিত সে খুঁজে পেল না। খবরের কাগজটাই দিল তাকে।

অন্যদিন সুবিমল বেশ খুঁটিয়ে কাগজ পড়ে। আজ যেন কেবল চোখ বোলানো। কত সময়? মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে। কাগজটা রেখে, কোনো কথা না-বলে চলে যাচ্ছিল সে। মণীষা ডাকল। খরিদ্দার না-থাকলে সে হয়ত বলত, বাবুর দেখছি খুব রাগ–কিংবা ওই ঢঙের কোনো কথা।

সুবিমল দাঁড়িয়ে আছে। খরিদ্দারকে ছেড়ে মণীষা বলল, 'এই লেখাটা পড়তো!'

পড়া শেষ হতেই মণীষা বলল, 'সুবিমলদা, জীবন কি সত্যি এরকম?'

সুবিমল কোনো উত্তর করল না।

--'বেঁচে থাকাটা আমার কাছে মাঝেমধ্যে খুবই অর্থহীন মনে হয়, – নমিতা বউ ছেড়ে যাওয়া সেই লোকটা – আমি কিংবা তুমি – কী বলব-- ' সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মণীষা। সুবিমল তবু নিরুত্তর।

--'কেন বেঁচে থাকি আমরা?'

--'তুমি কি বলতে চাইছ–কেবল ভোট দেবার জন্য?'

--'তুমি এখনও রেগে আছ? আমি কিছুই বলতে চাইনি। কেবল জানতে চেয়েছি।'

খুব অসহায়ভাবে সুবিমল বলল, 'জানি না।'

শক্ত-পোক্ত দেখ্নাই-এর আড়ালে পুরুষ এত দুর্বল! এত অসহায়! মণীষার বিস্ময় বদলে যাচ্ছে অদ্ভুৎ বিপন্নতায়।